ইতিহাস

দ্বিতীয় পত্র

আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস

[একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি]

স্টাডি গাইড

কোর্স কোড: HSC-2855

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম

(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

ইতিহাস

দ্বিতীয় পত্র

আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস

[একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি]

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম

(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

স্টাডি গাইড

রচনা ও সংকলন

ড. মো. আদনান আরিফ সালিম

সম্পাদনা

সানজিদা মুস্তাফিজ

সুমা কর্মকার

সমন্বয়কারী

ড. মো. আদনান আরিফ সালিম

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC-2855

এইচএসসি প্রোগ্রাম

প্রথম প্রকাশ
প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৯
পুন:মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০২০
অনলাইন সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২২
পুন:মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০২৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর-২০২৫
[বাউবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিষয়ক রিভিউ কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিমার্জিত]

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

কভার গ্রাফিকস
আবদুল মালেক

কম্পিউটার সাপোর্ট
মোঃ টিপু সুলতান
মোঃ শরিফুল ইসলাম

© **বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়**

ISBN 978-984-34-3147-9

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রণ
সৃষ্টি প্রিন্টার্স, ৪৮, হাসেম রোড
মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২।

সূচিপত্র

ইউনিট- ১: শিল্পবিপ্লব ১-৭
পাঠ-১: শিল্প বিপ্লবের পটভূমি ২
পাঠ-২: শিল্প বিপ্লবের কারণ ৫
পাঠ-৩: শিল্প বিপ্লবোত্তর ফলাফল.....৬

ইউনিট-২ ফরাসি বিপ্লব.....৮-২৮
পাঠ-১: ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি ৯
পাঠ-২: ফরাসি বিপ্লবের কারণ ১২
পাঠ-৩: ফ্রান্সে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কারণ ২২
পাঠ-৪: ফরাসি বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ ২৫

ইউনিট- ৩ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ভার্সাই সন্ধি ও লিগ অব নেশনস ২৯-৫৫
পাঠ-১: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্ব ৩০
পাঠ-২: অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সামরিক শক্তি ৩১
পাঠ-৩: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ৩৭
পাঠ-৪: বিভিন্ন রণক্ষেত্রের সংঘাত ৪১
পাঠ-৫: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ৫০
পাঠ-৬: ভার্সাই চুক্তি ৫২
পাঠ-৭: লিগ অব নেশনস ও তার ব্যর্থতা ৫৪

ইউনিট-৪: বলশেভিক বিপ্লব.....৫৬-৬৯
পাঠ-১: সাম্রাজ্যবাদের উত্থান, বিকাশ ও ফলাফল ৫৭
পাঠ-২: সাম্রাজ্যবাদের যুগে রাশিয়া.....৬২
পাঠ-৩: হবসন ও লেনিনের তত্ত্ব ৬৩
পাঠ-৪: বলশেভিক বিপ্লবের কারণ.....৬৪
পাঠ-৫: বলশেভিক বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ ও ফলাফল.....৬৭

ইউনিট-৫: হিটলার ও মুসোলিনির উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ.....৭০-৮৬
পাঠ-১: মহামন্দা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি ৭১
পাঠ-২: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ৭২
পাঠ-৩: হিটলার ও মুসোলিনির উত্থান ৭৮
পাঠ-৪: ঘটন-অঘটনের বিশ্বযুদ্ধ.....৮০
পাঠ-৫: জার্মানির পরাজয় ও হিটলারের শেষ জীবন ৮৫

ইউনিট-৬: জাতিসংঘ ও বিশ্বশান্তি ৮৭-৯৫
পাঠ-১: জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি.....৮৮
পাঠ-২: জাতিসংঘে বাংলাদেশ ৮৯
পাঠ-৩: বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা.....৯৪

ইউনিট-৭: স্নায়ুযুদ্ধ: পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দ্বন্দ্ব ৯৬-১০৩
পাঠ-১: স্নায়ুযুদ্ধের ধারণা ৯৭
পাঠ-২: স্নায়ুযুদ্ধের উৎস ৯৮
পাঠ-৩: স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব ৯৯
পাঠ-৪: স্নায়ুযুদ্ধকালিসন বিশ্ব পরিস্থিতি ১০০
পাঠ-৫: স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ১০৩

ইউনিট-৮: স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব ১০৪-১১২
পাঠ-১: সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পটভূমি ১০৫
পাঠ-২: সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ১০৬
পাঠ-৩: বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির প্রভাব ১০৮
পাঠ-৪: সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতনের প্রভাব ১১০
পাঠ-৫: বার্লিন প্রাচীরের অবসান ও একত্রিত জার্মানি ১১১

ইউনিট-৯: বর্ণবাদ ১১৩-১২১
পাঠ-১: বর্ণবাদের ধারণা ১১৪
পাঠ-২: বর্ণবাদের পটভূমি ১১৬
পাঠ-৩: বর্ণবাদের ঐতিহাসিক আবর্তন ১১৮
পাঠ-৪: বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব ১১৯

নমুনা প্রশ্ন ১২২-১২৮

কোর্সবই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র **কোর্স কোড : HSC-2855**

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এইচএসসি প্রোগ্রামের নতুন সিলেবাসের আলোকে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে 'ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র' বইটি রচিত হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি একইসাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। এ কারণেই বইটির বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বোঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। কোর্স বইটির ভাবগত ঐক্য রক্ষা করে পাঠের বিষয়বস্তুকে কতগুলো ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে।

আবার ইউনিটগুলোকে কতকগুলো পাঠে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা দেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র এ ইউনিটগুলো পড়লে বিশেষ কোন্ দিকগুলো জানা যাবে তা ইউনিটের উদ্দেশ্যে বলা আছে। ইউনিটটি কত সময়ে শেষ করতে হবে তা ইউনিটের শুরুতে উল্লেখ করা আছে এবং ইউনিটে কতগুলো পাঠ আছে তাও উল্লেখ করা আছে। আবার, প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের শিখনফল/উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী শিখনফল অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কী না তা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষার্থীকে প্রতিটি মূলপাঠ অবশ্যই বুঝে-বুঝে পড়তে হবে। প্রতিটি পাঠের শেষে ঐ পাঠের সারসংক্ষেপ দেয়া আছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নে এবং ইউনিটের শেষে চূড়ান্ত মূল্যায়নে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন দেয়া হয়েছে।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

শিক্ষার্থীরা যাতে এই বই পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারেন সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হলো:

- ইউনিটের শিরোনাম, ভূমিকা ও উদ্দেশ্য পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠের সবগুলো 'উদ্দেশ্য' পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হল কী না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন। কোথাও চিত্র থাকলে চিত্রের সাথে বিষয়বস্তু মিলিয়ে পড়ুন।
- কোন ইউনিটের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- প্রতিটি ইউনিটের বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে অনুশীলনের জন্য প্রতিটি ইউনিটের প্রতিটি পাঠে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থীর কাজ (অ্যাকটিভিটি) সংযোজন করা রয়েছে। ইউনিটের বিষয়বস্তু ভালোভাবে অধ্যয়ন করে অ্যাকটিভিটিগুলো সম্পন্ন করুন।
- অধ্যয়নের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের সমস্যাগুলো নিজে নিজে সমাধান করার চেষ্টা করুন। বই-এর শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভালো করে পড়ুন এবং সমস্যার সঠিক সমাধানের চেষ্টা করুন। চূড়ান্ত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করুন। প্রয়োজনে সহপাঠিদের সাথে সমস্যার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন, দেখবেন সমাধানের পথ সহজ হয়ে গেছে।
- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল ইউনিটকে কতটি অংশে ভাগ করে নিন। প্রত্যেক টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। কোনো ইউনিটের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনে টিউটরের (শিক্ষকের) সাহায্য নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মডিউল এর কোন্‌টি শিখনফল, কোন্‌টি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোন্‌টি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোন্‌টি চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে এই পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

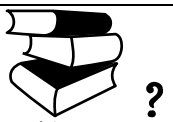 কোর্সবই অনুসরণের নির্দেশনা	কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	উদ্দেশ্য	বিষয়বস্তু/মূলপাঠ	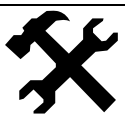 শিক্ষার্থীর কাজ	সারসংক্ষেপ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	উত্তরমালা	ভিডিও বা দেখা	অডিও বা শোনা	সাহায্য/প্রয়োজনে

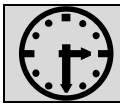 **কোর্স সমাপ্তির সময়**	**কোর্সটি সমাপ্তির সর্বোচ্চ ৯০ দিন সময় লাগবে**

ই-বুক	এ বিষয়ের ই-বুকের জন্য ব্রাউজ করুন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটের নিচের লিংকে www.bou.edu.bd

অডিও/ভিডিও	এ বিষয়ের অডিও ও ভিডিও প্রোগ্রাম যথাক্রমে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হবে। প্রোগ্রামের সিডিউল সংগ্রহ করে তা শুনতে পাবেন।

প্রয়োজনে	**সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন–**	ড. মো. আদনান আরিফ সালিম সহযোগী অধ্যাপক (ইতিহাস) ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সর্বশেষ সিলেবাস ও কারিকুলাম অনুযায়ী
পূর্ণাঙ্গ কারিকুলাম ও সিলেবাস

ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র

আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস

(কোর্স কোড : HSC-2855)

অধ্যায়	শিরোনাম
প্রথম	শিল্প বিপ্লব
দ্বিতীয়	ফরাসি বিপ্লব
তৃতীয়	প্র ম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভার্সাই সন্ধি ও লীগ অব নেশনস
চতুর্থ	বলশেভিক বিপ্লব
পঞ্চম	হিটলার ও মুসোলিনীর উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
ষষ্ঠ	জাতিসংঘ এবং বিশ্বশান্তি
সপ্তম	স্নায়ুযুদ্ধ : পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দ্বন্দ্ব
অষ্টম	স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব
নবম	বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত কারিকুলামের আলোকে, ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র, আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস

[একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি] কোর্স কোডঃ HSC-2855, স্টাডি গাইডের সিলেবাস

ইউনিট- ১: শিল্পবিপ্লব
পাঠ-১: শিল্প বিপ্লবের পটভূমি
পাঠ-২: শিল্প বিপ্লবের কারণ
পাঠ-৩: শিল্প বিপ্লবোত্তর ফলাফল

ইউনিট- ২ ফরাসি বিপ্লব
পাঠ-১: ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি
পাঠ-২: ফরাসি বিপ্লবের কারণ
পাঠ-৩: ফ্রান্সে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কারণ
পাঠ-৪: ফরাসি বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

ইউনিট- ৩ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ভার্সাই সন্ধি ও লিগ অব নেশনস
পাঠ-১: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্ব
পাঠ-২: অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সামরিক শক্তি
পাঠ-৩: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ
পাঠ-৪: বিভিন্ন রণক্ষেত্রের সংঘাত
পাঠ-৫: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল
পাঠ-৬: ভার্সাই চুক্তি
পাঠ-৭: লিগ অব নেশনস ও তার ব্যর্থতা

ইউনিট-৪: বলশেভিক বিপ্লব
পাঠ-১: সাম্রাজ্যবাদের উত্থান, বিকাশ ও ফলাফল
পাঠ-২: সাম্রাজ্যবাদের যুগে রাশিয়া
পাঠ-৩: হবসন ও লেনিনের তত্ত্ব
পাঠ-৪: বলশেভিক বিপ্লবের কারণ
পাঠ-৫: বলশেভিক বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ ও ফলাফল

ইউনিট-৫: হিটলার ও মুসোলিনির উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
পাঠ-১: মহামন্দা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি
পাঠ-২: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ
পাঠ-৩: হিটলার ও মুসোলিনির উত্থান
পাঠ-৪: ঘটন-অঘটনের বিশ্বযুদ্ধ
পাঠ-৫: জার্মানির পরাজয় ও হিটলারের শেষ জীবন

ইউনিট-৬: জাতিসংঘ ও বিশ্বশান্তি
পাঠ-১: জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি
পাঠ-২: জাতিসংঘে বাংলাদেশ
পাঠ-৩: বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা

ইউনিট-৭: স্নায়ুযুদ্ধ: পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দ্বন্দ্ব
পাঠ-১: স্নায়ুযুদ্ধের ধারণা
পাঠ-২: স্নায়ুযুদ্ধের উৎস
পাঠ-৩: স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব
পাঠ-৪: স্নায়ুযুদ্ধকালিসন বিশ্ব পরিস্থিতি
পাঠ-৫: স্নায়ুযুদ্ধের অবসান

ইউনিট-৮: স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব
পাঠ-১: সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পটভূমি
পাঠ-২: সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি
পাঠ-৩: বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির প্রভাব
পাঠ-৪: সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতনের প্রভাব
পাঠ-৫: বার্লিন প্রাচীরের অবসান ও একত্রিত জার্মানি

ইউনিট-৯: বর্ণবাদ
পাঠ-১: বর্ণবাদের ধারণা
পাঠ-২: বর্ণবাদের পটভূমি
পাঠ-৩: বর্ণবাদের ঐতিহাসিক আবর্তন
পাঠ-৪: বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব

শিল্প বিপ্লব

ইউনিট ১

ভূমিকা

আঠারো শতকের শেষদিকে এসে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয় সাধারণভাবে তা শিল্প বিপ্লব নামে পরিচিত। ১৮৩৭ সালে শিল্প বিপ্লব কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি সমাজতান্ত্রিক লেখক জেরোমি ব্লাংকি। তবে এটি বিশেষ পরিচিতি লাভ করে ১৮৮১ সালের দিকে। তখন ইংরেজ বিখ্যাত ইতিহাস গবেষক আর্নল্ড জে. টয়েনবি অক্সফোর্ডে দেয়া তাঁর বক্তৃতামালায় এই কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন। এ বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ড বিশ্বের প্রধান শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশটির সমৃদ্ধির ভিত্তি রচিত হয়। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও শিল্প বিপ্লব বিশ্বের নানা দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প বিপ্লবের বিষয়টি নানা দিক থেকেও আলোচিত হয়েছে। এ বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণীর ভাগ্যে কি ঘটেছিল, কেন ফ্রান্সের পরিবর্তে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের সূত্রপাত হয় প্রভৃতি প্রশ্নে ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শিল্পবিপ্লবের পটভূমি, কারণ, বিকাশ ও শিল্প বিপ্লবোত্তর বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে এ ইউনিটের তিনটি পাঠে আলোচিত হয়েছে।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

পাঠ-১.১ **শিল্প বিপ্লবের পটভূমি**

পাঠ-১.২ **শিল্প বিপ্লবের কারণ**

পাঠ-১.৩ **শিল্প বিপ্লবের ফলাফল**

পাঠ-১.১ শিল্প বিপ্লবের পটভূমি

আঠার শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। এ সময়ে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল তা আমাদের জানার প্রয়োজন রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় একটি স্থবির বা অনগ্রসর সমাজে শিল্প বিপ্লব হঠাৎ করে শুরু হয় নি, দীর্ঘকাল আগে থেকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রস্তুতি চলছিল। এক্ষেত্রে বিপ্লবের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে অধ্যয়ন করতে হবে। এর পাশাপাশি কি কি কারণে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল সেগুলোর আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করতে হবে।

রাজনৈতিক পটভূমি

১৪৮৫ সালে টিউডর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সপ্তম হেনরি ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন। এভাবে টিউডর রাজবংশের যে শাসন শুরু হয় তা স্থায়ী হয়েছিল ১৬০৩ সাল পর্যন্ত। টিউটর রাজবংশের শাসনকাল থেকে আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছে এ জন্যে যে এখান থেকে ইংল্যান্ডে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয় বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। টিউডর শাসনকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এ সময়ে দেশে শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। টিউডর রাজাগণ অত্যাচারী সামন্ত প্রভুদের দমন, নতুন নতুন কার্যকরী সংগঠন ও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় প্রতিষ্ঠা, শাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অনুগতএবং বিশ্বস্তলোক নিয়োগ, স্থানীয় শাসন ব্যাপারে অধিকতর কর্তৃত্ব আরোপ এবং সর্বোপরি পার্লামেন্টের সংগে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলে নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের শক্তিশালী শাসন প্রজাপীড়ন বা জনমতের বিরুদ্ধাচারণ করে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, শক্তিশালী শাসন গড়ে উঠেছিল সমগ্র জাতির সমর্থনের উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ টিউডরদের শক্তিশালী শাসনের পেছনে জনসমর্থন ছিল।

শক্তিশালী রাজতন্ত্র

টিউডর রাজত্বকালে শুধু অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি, ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে রোমের পোপের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়। অষ্টম হেনরির শাসনকাল থেকে পরবর্তী রাজাদেরকে ইংল্যান্ডের গির্জা ও রাষ্ট্র উভয়ের প্রধান হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। এভাবে ইংল্যান্ড বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তুএর ফলে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা দেয়; কেননা সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে যে এ্যাংলিকান চার্চ (Anglican Church) প্রতিষ্ঠিত হয় তা একদিকে চরমপন্থী প্রোটেস্টান্ট বা পিউরিটান ও অপরদিকে ক্যাথলিকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নি। অর্থাৎ এ্যাংলিকান চার্চের প্রধান রাজাকে ক্যাথলিক ও পিউরিটানদের বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হয়।

সার্বভৌম রাষ্ট্র

টিউডর যুগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের (Renaissance) সূত্রপাত।ফলে এ যুগে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ ঘটে। বিশেষত এলিজাবেথের রাজত্বকাল সাহিত্যের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষের যুগছিল। এ যুগেইংরেজি সাহিত্যের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শেক্সপিয়ের এ যুগেই তাঁর অমর লেখনী চালনা করেন। এ যুগে দর্শন চর্চারও প্রসার ঘটে। বেকন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ১৬০৩ সালে প্রথম জেমসের সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে স্টুয়ার্ট রাজবংশের শাসন শুরু হয়। রাজা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয় জীবনে পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এ যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্টুয়ার্ট শাসনকগণ বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা বিধিদত্ত ক্ষমতার (Divine Right) বলে রাজা। সুতরাং তাঁদের কার্যাবলির জন্যে তাঁরা জনগণের কাছে নয় একমাত্র সৃষ্টিকর্তারকাছে দায়ী। পার্লামেন্ট রাজার এরূপ সীমাহীন ক্ষমতার দাবি মানতে সম্মত ছিল না। পার্লামেন্ট মনে করতো যে রাজক্ষমতা ব্যক্তিগত বা দৈব অধিকার ক্ষমতার ভিত্তি বা মূল উৎস সম্পর্কে রাজা ও পার্লামেন্টের দৃষ্টিভংগীছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব স্টুয়ার্ট শাসন আমলের শুরু থেকেই রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয় ।

ঐশ্বরিক রাজাধিকারে বিশ্বাস

১৬২৯-৪০ সাল পর্যন্ত প্রথম চার্লসের ব্যক্তিগত শাসন, দীর্ঘ পার্লামেন্টের অধিবেশন, সাত বছর (১৬৪২-৪৯) স্থায়ী গৃহযুদ্ধ, প্রথম চার্লসের মৃত্যুদণ্ড, রাজতন্ত্র ও লর্ড সভার উচ্ছেদ এবং ওলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা এবং ১৬৬০ সালে দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসন আরোহণের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পুনপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের সঙ্গে আবার

বিরোধ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে এ বিরোধের অবসান হয়। পার্লামেন্ট শর্তাধীনে উইলিয়াম এবং মেরিকে সিংহাসন দান করে। ফলে স্টুয়ার্ট ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে রাজবংশের অবসান এবং জাতীয় জীবনে পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লব পরবর্তী বিল অব রাইটস, মিউটিনি এ্যাক্ট, ট্রিনিয়াল এ্যাক্ট প্রভৃতি আইন পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতাকে আইনগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ইংল্যান্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। অনুরূপভাবে টলারেশন এ্যাক্টের মাধ্যমে ধর্মীয় সহনশীলতা নীতি স্বীকৃতি পায়।

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের একত্রীকরণ

১৫৩৬ সালে ওয়েলস ইংল্যাণ্ডের সংগে যুক্ত হয়েছিল। অতপর এলিজাবেথের রাজত্বকালের শেষদিকে আয়ারল্যান্ডের বিজয় সমাপ্ত হয়। এবার ১৬০৩ সালে স্কটল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহন করার ফলে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড একই রাজার শাসনাধীনে আসে। শেষ পর্যন্ত ১৭০৭ সালে এ্যাক্ট অব ইউনিয়নের মাধ্যমে দুটো দেশকে একই পার্লামেন্টের শাসনাধীন বলে ঘোষণা করা হয়। এ আইনে আরও স্থির হয় যে এখন থেকে দেশ দুটো গ্রেট ব্রিটেন নামে পরিচিত হবে। স্টুয়ার্ট যুগে ইংল্যান্ডে রেনেসাঁসের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত হয়।

বৈজ্ঞানিক কারণ

শিল্প বিপ্লবপূর্ব ইংল্যান্ডে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার লক্ষ করা যায়। নিউটন, হার্ভি ও নেপিয়ারের পাশাপাশি আরও অনেক বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ করা যায় যাঁরা ইংল্যান্ডের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষে ভূমিকা রেখেছিলেন। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে বিখ্যাত রয়াল সোসাইটি নামক বিজ্ঞান সভা স্থাপিত হয় (১৬৬২)। স্টুয়ার্ট যুগের বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন জন লক। টিউডর যুগে সাহিত্যে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল স্টুয়ার্ট শাসন আমলে তা অব্যাহত থাকে। মিলটন, ড্রাইডেন, জন বানিয়ান এবং পোপ ছিলেন এ যুগের উল্লেখযোগ্য কবি। এ যুগে গদ্য সাহিত্যেরও প্রসার ঘটে। স্টুয়ার্ট শাসন আমলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাময়িকী সাহিত্যের উদ্ভব।

আর্থ-সামাজিক পটভূমি

শিল্প বিপ্লবের আর্থ-সামাজিক পটভূমি স্বভাবতই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসংগে যেসব বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে উপনিবেশ স্থাপন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, শিল্প-কৃষি-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি, বণিক পুঁজিরবিকাশ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি। স্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে উপনিবেশ স্থাপন এবং তৎসংগে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ শুরু হয়। প্রথম জেমসের শাসন আমলে ইংল্যান্ডের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেমস টাউনে বা ভার্জিনিয়ায়। পরবর্তীকালে উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং ১৭৩৩ সালের মধ্যে ১৩ টি উপনিবেশ গড়ে উঠে।

ইংল্যান্ড ত্যাগ করে যারা উত্তর আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে তাদের অধিকাংশই ছিল পিউরিটান। একই সংগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বার্বোডাস, বার্মুডা এবং জ্যামাইকা দ্বীপে ইংল্যান্ডের উপনিবেশ গড়ে উঠে। অপর দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং কোলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে কোম্পানির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উপনিবেশ ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজটি স্বভাবতই খুবসহজ ছিল না, কেননা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশও একই লক্ষ্য স্থির করেছিল।

ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফ্রান্স। কিন্তু সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে উত্তর আমেরিকায় ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটে। ইতোমধ্যে পলাশী যুদ্ধে বাংলার নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এভাবে পনেরো, ষোল ও সতেরো শতকে ইউরোপে যে বাণিজ্য-বিপ্লব সংঘটিত হয় তার ফলে সব চেয়ে বেশি লাভবান হয় ইংল্যান্ড। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য যে, ১৬০০ থেকে ১৭০০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের রপ্তানি দ্বিগুণের বেশি এবং ১৭০০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে তিনগুণের বেশি বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে আমদানির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়, কিন্ত আমদানির চেয়ে রপ্তানির পরিমাণ ছিল সব সময়ই বেশি।

ইংল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের এ ধরনের সম্প্রসারণের প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। কেননা এর ফলে কয়লা, ইস্পাত, বাসন-পত্র তৈরি, জাহাজ নির্মাণ এবং বিশেষভাবে বয়ন-শিল্পে অগ্রগতি সাধিত হয়, আবাদি জমি বৃদ্ধিপায়, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়, বণিক পুঁজি বিকাশ লাভ করে, সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থান শক্তিশালী হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিতহয়। একই সংগে আধুনিকব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠে এবং ১৬৯৪

সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়, বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, ১৬৯৮ সালে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম শুরু হয় এবং কয়েকটি বীমা কোম্পানি গঠিত হয়।

বয়ন শিল্পে তিনটি পরিবর্তনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, Putting-out প্রথার উদ্ভব হয়। মধ্যযুগে বস্ত্র উৎপাদিত হতো তাঁতীদের ঘরে। তাঁতী কাঁচামাল সংগ্রহ করে বস্ত্র উৎপাদন করতো এবং সরাসরি তা বাজারজাত করতো। কিন্তু আধুনিকযুগের শুরুতে ব্যবসায়ীগণ তাঁতীদের কাছে কাঁচামাল সরবরাহ করে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এভাবে তাঁতীতার স্বাধীনতা হারায় এবং বণিক পুঁজিশিল্প পুঁজিতেরূপান্তরিত হয়।

দ্বিতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে পুঁজিপতিগণ তাঁতীদেরকে নিজ বাড়িতে উৎপাদন করতে না দিয়ে তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে উৎপাদন কাজে নিয়োগ করে। তাঁতীদের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে উৎপাদন কাজ তদারকি করার ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা দেখা গিয়েছিল প্রধানত তা দূরকরার জন্যেই এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। এ ব্যবস্থা ছিল শিল্প বিপ্লবের সৃষ্ট কারখানা বা ফ্যাক্টরির পূর্বসূরী।

তৃতীয়ত, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল ফ্লাইয়িং শাটল (Flying Shuttle) নামক এক ধরনের বৈজ্ঞানিক মাকুর প্রবর্তন। এটি ১৭৩৩ সালে জন কে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। এটি যান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হতো। অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ১৬৬০ থেকে ১৭২৯ সালের মধ্যে মোট ২৭০ টি উৎপাদন কৌশল সরকারি অফিসে নিবন্ধিত হয়েছিল।

প্রসংগক্রমে অপর একটি বিষয়ও এখানে উল্লেখ করা যায়। ইংল্যান্ডের সরকার সে যুগে প্রচলিত বণিকবাদ নীতি অনুসরণকরে উপনিবেশ স্থাপন, বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, উপনিবেশগুলোর আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য অনেক উপায়ে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। এক্ষেত্রে নেভিগেশন এ্যাক্টের কথা বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন। প্রথম নেভিগেশন এ্যাক্ট প্রবর্তিত হয় ১৬৫১ সালে, ওলিভার ক্রমওয়েলের শাসনকালে। এ আইনে বলা হয় যে, উত্তর আমেরিকায় ও অন্যান্য এলাকার উপনিবেশ এবং ভারত থেকে যেসব পণ্য ইংল্যান্ডে আমদানি করা হবে তা শুধু ব্রিটিশ বাণিজ্য তরীতে বহন করতে হবে। দ্বিতীয় আইনটি প্রবর্তিত হয় ১৬৬০ সালে। এ আইনে বলা হয় যে উপনিবেশ সমূহ কত সংখ্যক পণ্য শুধুইংল্যান্ডে রপ্তানি করতে পারবে। একই সংগে উত্তর আমেরিকায় কতগুলো শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন এবং ভারত থেকে কয়েক প্রকার সুতী বস্ত্রের আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ইংল্যান্ডের শিল্পোৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই শেষোক্ত ব্যবস্থা দুটো গ্রহণ করা হয়েছিল। এভাবে ১৪৮৫ সালের পরে তিনশত বছরের কম সময়ে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক, চিন্তা-চেতনা এবং বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় যা শিল্পবিপ্লবকে প্রণোদিত করেছিল। ইংল্যাণ্ডকে সেই সময় বলা হত "পৃথিবীর কারখানা" ঐতিহাসিক প্লাম্ব বলেছেন, মানবজাতির অর্থনৈতিক জীবনের বিবর্তনে নব্যপ্রস্তর যুগের পর এতবড় পরিবর্তন আর ঘটেনি।

পাঠ-১.২ শিল্প বিপ্লবের কারণ

আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এ বিপ্লবের পেছনে বেশ কিছু সামাজিক,রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক কারণ ছিল। সামাজিক কারণগুলো মূলত এই বিপ্লবের পটভূমি রচনা করেছিল। অন্যদিকে অন্যকারণগুলো প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে। নিচে কারণগুলো আলোচনা করা হচ্ছে–

মূলধনের প্রসার

শিল্প স্থাপনের জন্যে মূলধনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে বণিক পুঁজির বিকাশ লাভ করে। এ ছাড়া উন্নত প্রথায় কৃষি খামার পরিচালিত হওয়ায় এক শ্রেণীর ভূ-স্বামী অর্থশালী হয়। একই সংগে উন্নতর অর্থনৈতিক সংগঠনের (যেমন ব্যাংক ও স্টক এক্সচেঞ্জ) উদ্ভব জনগণের সঞ্চয়কে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিনিয়োগে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি মুনাফার হার বৃদ্ধির ফলে উঠতি শিল্পপতিদের হাতে নতুন ভাবে বিনিয়োগ যোগ্য অর্থের সমাগম হয়।

ক্রমবর্ধমান পণ্য চাহিদা

আঠার শতকের শেষভাগে শিল্প পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এটি সম্ভব হয়েছিল প্রধানত তিনটি কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনগণের মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। ১৭৫০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল খুবই কম, কিন্তু অত:পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত বাড়তে থাকে। এটি সম্ভব হয়েছিল জন্মের হার বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর হার কমে যাওয়ার ফলে। ১৭৫১ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬.১ মিলিয়ন, ১৮৩১ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪.২ মিলিয়নে। বর্ধিত চাহিদা একই সময় জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিপাওয়ায় তাদের ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধিপায়। উপরোক্ত দুটি কারণে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদেশেও উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায়। বর্ধিত চাহিদা শিল্প বিপ্লবের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং কয়লা ইঞ্জিনের ব্যবহার

প্রযুক্তির উন্নয়ন শিল্প বিপ্লবের অপর একটি বড় কারণ। বাষ্প চালিত যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে বড় বড় ফ্যাক্টরি গড়ে উঠে এবং শিল্পোৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়। একথা বিশেষভাবে বয়নশিল্পের ক্ষেত্রে সত্য। গুডইয়ার, ফ্যারাডে ও এরিকসনের মত বিজ্ঞানীর আবিষ্কারে শিল্পে নতুন দিক উন্মোচিত হয়। কয়লা ও ইস্পাতের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। নতুন যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরিতে ইস্পাতের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। স্পিনিং জেনি ও যান্ত্রিক মাকু, ওয়াটার ফ্রেম, মিউল মেশিন, পাওয়ার লুম, স্টিম ইঞ্জিন প্রভৃতির কথা না বললেই নয়। অন্যদিকে যাতায়াত ও পরিবহন খাতের উন্নয়ন এই বিপ্লবকে প্রণোদিত করেছিল।

প্রাকৃতিক প্রভাব

ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিকও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি শিল্প বিপ্লবের সহায়ক হয়েছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন। দেশের স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া বয়ন শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য করেছিল, কেননা এর ফলে বয়নের ক্ষেত্রে সুতা ছিঁড়ে যেতো না। মাটির নীচে কয়লা ও লোহার অফুরন্ত সঞ্চয় এবং কয়লা ও লৌহ খনিগুলো পরস্পরের কাছাকাছি হওয়ায় এগুলোর আহরণ সহজ হয়েছিল। দেশের খালগুলি বিভিন্ন নদ-নদীকে যুক্ত করায় জলপথের উন্নয়ন সহজ হয়েছিল।

বিচ্ছিন্ন কারণ

অনেক ইতিহাস গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানীর ধারণা ইংল্যান্ডে বাক স্বাধীনতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, পিউরিটান বিপ্লব, যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের উদ্ভব, মুক্তপরিবেশে বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অগ্রগতি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক অবাধ নীতি অনুসরণ শিল্প বিপ্লবের জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকরেছিল।

কৃষি বিপ্লবের প্রভাব

অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন কৃষি বিপ্লব ছিল শিল্প বিপ্লবের পূর্বশর্ত। অর্থাৎ কৃষিবিপ্লব ছিল শিল্প বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ। কেননা এ বিপ্লবের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিপায় এবং শ্রমিক হিসেবে কারখানায় নিয়োগের জন্য জনশক্তির অভাব না থাকায় দুইটি খাতের উন্নয়ন সমান্তরালে চলতে থাকে।

পাঠ-১.৩ শিল্প বিপ্লবের ফলাফল

ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলাফল হয়েছিল ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। ব্যাপক হয়েছিল এই অর্থে যে, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈদেশিক সম্পর্কে, মানুষে জীবন এবং চিন্তা-চেতনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ বিপ্লবের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, শিল্প বিপ্লবের এ প্রভাব ইংল্যান্ড তথা পৃথিবীরঅন্যান্য দেশে এখনও ক্রিয়াশীল রয়েছে। সে অর্থে এ প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী। প্রভাবগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো–

অর্থনৈতিক প্রভাব

কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর ফলে আগের তুলনায় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিপায়। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের হাতে যে পরিসংখ্যান রয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে ১৮০১ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত শিল্পোৎপাদন বার্ষিক শতকরা চার ভাগেরও বেশি হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে উক্ত সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ডের মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান শতকরা ২৩.৪ ভাগ থেকে ৩৬.৫ ভাগে বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে কৃষিখাতের উৎপাদনের অবদান শতকরা ৩২.৫ ভাগ থেকে কমে শতকরা ২২ ভাগে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে শিল্পখাতে নিয়োজিত জনসংখ্যা উক্ত সময়ে যখন শতকরা ৩০ ভাগ থেকে ৪৩ ভাগে বৃদ্ধিপায় কৃষিকাজে নিয়োজিত জনসংখ্যা শতকরা ৩৬ ভাগ থেকে ২২ ভাগে নেমে আসে। এভাবে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ড কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্প প্রধান দেশে রূপান্তরিত হয়। সংগে সংগে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিপায়। ১৭৬০ ও ১৮৫০ সালের মধ্যে আমদানি বৃদ্ধিপায় ১২ গুণ, আর রপ্তানি বৃদ্ধিপায় ১৩ গুণ। আমদানী হতো কাঁচামাল এবং খাদ্যশস্য, আর রপ্তানি হতো শিল্পজাত পণ্য। ইংল্যান্ডের শিল্পপণ্য পৃথিবীর সব দেশে রপ্তানি হতো এবং এজন্য ইংরেজদের বলা হতো দোকানদার জাতি। একই সংগে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এভাবে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি, খনিজ সম্পদের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এর প্রধানতম প্রমাণ হলো মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি। এক কথা আয়ের বন্টনের ক্ষেত্রে দারুণ বৈষম্যের সৃষ্টিহয়; কিন্তু মাথাপিছু আয় যে বৃদ্ধিপেয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, তখনকার দিনে ইংল্যান্ডের কৃষিখাতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন চলছিল।

পুঁজিবাদের উদ্ভব

ব্যপক শিল্পায়ন পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে। এই ব্যবস্থায় যে মূলধনের প্রয়োজন হয় তা সংগৃহীত হয় পুঁজিপতি কর্তৃক। এভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার সবটায় পুঁজিপতিদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদিত পণ্য দেশে-বিদেশে বিক্রি করে তারা লাভবান হয় এবং এভাবে সঞ্চিত মূলধনদ্বারা আরও নতুন শিল্প গড়ে তোলে। একই সংগে নতুন পুঁজিপতিরা কারখানা স্থাপনে এগিয়ে আসে। এভাবে শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার পূর্ণ মালিকানা পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় কারখানা গড়ে উঠে এবং এসব কারখানায় গ্রাম থেকে আগত বিপুলসংখ্যক মানুষ শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত হয়। ফলে দেশে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরাতন শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এসব শহরের মধ্যে ম্যানচেস্টারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ শহরটি ছিল বয়নশিল্পের প্রাণকেন্দ্র। এভাবে দেশের মোট জনসংখ্যায় শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা আনুপাতিকভাবে বেড়ে যায়। এক হিসেব মতে আঠার শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ শহরে বসবাস করত। জনসংখ্যা বৃদ্ধিপেয়ে ১৮০১ এবং ১৮৪১ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫ ও ৬০ ভাগে। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যা দ্রুত কমে যায়, কোনো কোনো এলাকা প্রায় জনশূন্যহয়ে পড়ে।

সামাজিক প্রভাব

আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইতোপূর্বে সমাজে বুর্জোয়াবা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এবার শিল্প বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়াশ্রেণী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। কেননা ধনী ব্যবসায়ী এবং উঠতি শিল্পপতিদের প্রায় সবাই ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীভূক্ত। অভিজাত শ্রেণী এতদিন যে ক্ষমতা ভোগ করে আসছিল তা লোপ পায় নি সত্য, কিন্তু আগের তুলনায়তাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে যায়। একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্রান্সে বুর্জোয়াশ্রেণী প্রাধান্য বিস্তার করে। ইংল্যান্ডে অনুরূপঘটনা ঘটেছিল শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে।

শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব

শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব শিল্প বিপ্লবের অন্যতম একটি দিক। নতুন নতুন কারখানা গড়ে উঠলে গ্রাম ছেড়ে অনেকে শহরে এসে শ্রমিক হিসেবে জীবনযাত্রা শুরু করে। এভাবে ভূমিহীন, চাকুরি-সম্বল শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এরা কারখানায় কঠোর পরিশ্রম করে কম মজুরিতে জীবিকা নির্বাহ করতো। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারে একার উপার্জনে সংসার চলতো না বলে নারী ও শিশুদেরকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হতো। কারখানাগুলো নোংরা, অস্বাস্থ্যকর এবং যন্ত্রপাতিগুলো এমনভাবে রাখা হতো যে শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতো। এ অবস্থায় শিশু ও নারী শ্রমিকদের ১৬-১৭ ঘন্টা পরিশ্রম করতে হতো। শ্রমিকদের বাসস্থানও ছিল একইভাবে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। বলা যেতে পারে তারা বস্তিতে বসবাস করতো। শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক যুগে শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশারকথা সমকালীন অনেক লেখায়, এমনকি সরকারি প্রতিবেদনেও পাওয়া যায়। এভাবে শিল্প বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন ধনী পুঁজিপতিও ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হয় অপর দিকে দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিক শ্রেণী ও গড়ে উঠে।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা সমাজে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে এরূপ বৈষম্য এবং শ্রমিকদের দারিদ্র্যের কথা ভেবে এর প্রতিকারের চিন্তা করেন। তাঁরা এ মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, শ্রমই হলো সম্পদের উৎস, আর কাঁচামাল প্রাকৃতিক সম্পদ। এতে সকলের সমান অধিকার রয়েছে। শ্রমিক কাঁচামালকে ভিত্তি করে তার শ্রমের দ্বারা যা উৎপাদন করে তার মুনাফা শ্রমিকেরই প্রাপ্য। কারখানার মালিক প্রকৃতপক্ষে মুনাফার দাবিদার হতে পারে না। রাষ্ট্রের উচিত শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণের মাধ্যমে শ্রমিকের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এভাবে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বিকাশ ঘটে, আর এ মতবাদের প্রধান তাত্ত্বিক প্রবক্তা হলেন কার্ল মার্কস।

রাজনৈতিক প্রভাব

শিল্প বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। এক্ষেত্রে অনেকগুলো দিক শনাক্ত করা যায় যার দ্বারা বিশেষে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হওয়ার দাবি রাখে। **প্রথমত**, রাজনৈতিক অঙ্গনেও শিল্প বিপ্লবের গুরুত্ব ও প্রভাব অনুভূতহয়। শিল্পপতি ও বণিকদের যে শ্রেণী শক্তিশালী হয় তার ফলে ভূস্বামীও হুইগ রাজনীতিকদের একচেটিয়া অধিকার লোপ পায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমে পুঁজিপতিদের হাতে চলে যায়। **দ্বিতীয়ত**, নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্যে শ্রমিক শ্রেণী সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করে এবং ফলে ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন শুরু হয়। একই লক্ষ্যে শ্রমিক দল গঠিত হয়। শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘট প্রভৃতির মাধ্যমে মালিকের নিকট তাদের দাবি পেশ করে। ফলে নিম্নতম মজুরী, কর্মক্ষেত্রে শ্রম ঘন্টা, বাসস্থান, বীমা প্রভৃতি আইন পাশ হয়। এক পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণী ভোটাধিকার লাভ করে। **তৃতীয়ত**, শিল্প বিপ্লবের ফলে পার্লামেন্টের সংস্কারের আশু প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ এর ফলে অনেক নতুন শহর গড়ে উঠে এবং অনেক পুরাতন শহর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এতে জনসংখ্যার ঘনত্বে ব্যাপক রদবদল হয় এবং এজন্যে পার্লামেন্টের সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। **চতুর্থত**, বেশি মুনাফারলোভে শিল্পপতিরা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় বাড়তি পণ্য উৎপাদন করে। এ বাড়তি পণ্য বিক্রির জন্যে বিদেশে বাজার দখলের প্রয়োজন দেখা দেয়। শিল্প বিপ্লবের আগেই ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে উপনিবেশ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। এবার সে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। প্রসংগক্রমে উল্লেখ্য যে, ইরোপের অন্যান্য দেশেও শীঘ্রই শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়েছিল।

সারাংশ

অনেক বিশ্লেষক শিল্পবিপ্লবের কারণগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক কারণসমূহকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের মতে অর্থনৈতিক কারণগুলো অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অনেকে চাহিদা বৃদ্ধিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন। পাশাপাশি সঞ্চয় বৃদ্ধির কারণে মূলধনের প্রাচুর্য এবং প্রযুক্তির অগ্রগতি শিল্প বিপ্লবের পথ করে দেয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সবগুলো কারণ ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে মিলে যাওয়ায় সেখানেই ঘটেছিল শিল্প বিপ্লব।

ফরাসি বিপ্লব

ইউনিট ২

ভূমিকা

ফরাসি বিপ্লব আধুনিক ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও চিন্তার জগতে নতুন দিগন্তের সূচনা করে। চতুর্দশ লুইয়ের শাসনামলে (১৬৫১-১৭১৫ খ্রি.) ফ্রান্স একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তবে তার সাম্রাজ্যবাদী নীতি দেশকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়। তার পুত্র পঞ্চদশ লুই (১৭১৫-১৭৭৪ খি.) এর অমিতব্যায়িতা জন্য এই দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি পায়। ষোড়শ লুই ১৭৭৪ সালে সিংহাসনে বসে ক্রমশ এক অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন। আর্থ সামাজিক বৈষম্য রাজনৈতিক দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৭৮৯ সলে এক বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক আলফ্রেড কোবান (Alfred Cobban) এই অবস্থাবে অনেক ছোট বড় খরস্রোতা নদীর সংমিশ্রণে হঠাৎ ফুলে ফেঁপে ওঠা বিধ্বংসী বন্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল কারাদুর্গ আক্রমণ ও এর পতনের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় যা বিখ্যাত হয়েছে ফরাসি বিপ্লব নামে।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

পাঠ-২.১ **ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি**

পাঠ-২.২ **ফরাসি বিপ্লবের কারণ**

পাঠ-২.৩ **ফ্রান্সে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কারণ**

পাঠ-২.৪ **ফরাসি বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ**

পাঠ-২.১ ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি

জ্ঞানতাত্ত্বিক বিপ্লব বা আলোকময়তার যুগে মানুষের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ মূলত স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিলো। অন্যদিকে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে বিশ্বের নানা দেশের সাথে যোগাযোগ, নৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগসূত্র মানুষকে অনেক বেশি স্বাধীনচেতা করে তোলে। ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই পরবর্তীযুগের দুর্বল কিন্তু অত্যাচারী শাসকদের দাম্ভিক আচরণ তাদের ক্ষমতার কেন্দ্র বাস্তিল দুর্গের পতনে যথেষ্ঠ হয়েছিলো। ধর্ম সংস্কার ও প্রতিসংস্কার আন্দোলন ক্রমাগত পরিবর্তনের হাতছানি দিয়ে ফলাফল হিসেবে পোপের শক্তিনাশ করেছিলো। এর মাধ্যমে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য কিংবা ঐ জাতীয় কোনো আধ্যাত্মিকতার বাণী শুনিয়ে মানুষকে আর ঘরে বেঁধে রাখা সম্ভব হচ্ছিলো না। ফ্রান্সের পাশাপাশি ইউরোপের অন্য দেশগুলোতেও চলছিলো চরম রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতি ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট। এগুলো একত্রিত হয়ে একটি বিপ্লবের পটভূমি তৈরি করে। নিচে বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো–

রাজনৈতিক অবস্থা

কাগজে কলমে ইউরোপের নানা স্থানে জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান হলেও বাস্তবতায় সেখানে শক্তিশালী রাজতন্ত্র বিরাজ করছিলো। দুর্নিবার একনায়কতান্ত্রিক শাসনে ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছিলো মানবাধিকার। এখানে ব্যক্তি কিংবা রাজ্যের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে মনে করা হতো রাজতন্ত্রের সম্পত্তি। এখানে ব্যক্তির সাথে রাজ্যের আচরণ ছিলো যাচ্ছেতাই। মানুষের কল্যাণের জন্য সরকার ও রাষ্ট্র এই ধারণার কোনো অস্তিত্ব সেখানে ছিলো না। বলতে গেলে ক্যালেন্ডারের পাতায় আধুনিক যুগে পদার্পনের চিহ্ন দেয়া থাকলেও তখনকার ইউরোপের মধ্যযুগীয় বর্বর রাজতন্ত্রই নতুন করে জেঁকে বসে। প্রুশিয়া, ব্রান্ডেনবার্গ, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, রাশিয়া, স্পেন প্রভৃতি অঞ্চলে এই ধরণের শাসনকাঠামোর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হলেও ফ্রান্সের অবস্থা ছিলো সবথেকে ভয়াবহ। তাই বিপ্লবীদের প্রতিরোধে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ফরাসি ভূখণ্ড।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা

ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে পুরো ইউরোপজুড়ে যে রাজনৈতিক সংকট জন্ম নিয়েছিলো তার মূলে ছিলো ভয়াবহ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের ক্ষমতার বুনিয়াদ মজবুত করে তোলার গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছিলো শক্তিশালী সব আমলা। রাষ্ট্রযন্ত্রের নামান্তরে তখন গড়ে উঠতে দেখা যায় এক প্রভাবশালী নিপীড়ক যন্ত্রাতন্ত্র যার মূল কাজ জনদলন আর মানুষের উপর নারকীয় অত্যাচার। এই জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে প্রাণান্ত হয়েছিলো পুরো ইউরোপ। নানা স্থানে অসন্তোষের বীজ দানা বাঁধছিলো অনেক আগে থেকেই যা সময় ও সুযোগ বুঝে অঙ্কুরিত হয় ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

প্রশাসনিক অবস্থা

পোপের ক্ষমতার রাজনৈতিকীকরণ আর রাজক্ষমতার উপর চার্চ তথা ধর্মের হস্তক্ষেপ পরিস্থিতি পাল্টে যায়। পুরো বিশ্ব যখন আধুনিকতার ছোঁয়ায় উদ্বেল হয়েছে ঠিক তখনি ইউরোপের বইতে থাকে উল্টো হাওয়া। স্বার্থান্বেষী পোপরা ক্ষমতাধর রাজা ও প্রশাসকদের অবস্থার আরো পরিপক্ক করে তুলতে চেষ্টা করে। উপযুক্ত স্বার্থের বিনিময়ে তারা সম্রাটকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়। ফলে আবার সেই মান্ধ্যত্মার আমলের দৈব রাজতন্ত্রের ধারণ ফিরে আসে ইউরোপে। মানুষ নানা দিক থেকে নিষ্পেষিত হয়েও পুরোপুরিভাবে ক্ষমতাসীনদের সমালোচনা করার অধিকার হারিয়ে ফেলে। তবে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট ইতিহাস বিখ্যাত ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধ ইউরোপের রাজনীতির এই ধারণা পাল্টে দেয়ার পথ করে দেয়।

ধর্মীয় অবস্থা

আধুনিক যুগের শুরুতে ইউরোপের রাজনৈতিক আবর্তনের সাথে ধর্মের ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিলো। বিশেষ করে ক্ষমতার উপর পোপের সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ এই অবস্থাকে আরো অসহনীয় করে তোলে। ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হলে ইউরোপের ইতিহাসের পট পরিবর্তন হয়। এই সময় থেকে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক সংঘাত। বিশেষ করে মার্টিন লুথারের প্রতিবাদী ধর্মমত প্রতিষ্ঠার পর থেকে মৌলবাদী ক্যাথলিকদের সাথে অন্যদের যে পরিমাণ সংঘাত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আধুনিক যুগের প্রারম্ভের ইউরোপের ইতিহাসকে প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যাথলিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস বলাটা ভুল হবে না। অনেকে রাজক্ষমতা ধরে রাখার জন্য নিজের ধর্মমত পাল্টে ফেলেন। অনেক রাজা ভিন্নধর্মী তথা প্রতিবাদী ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষকে নানা ভাবে অত্যাচার, নিপীড়ন এমনকি নির্মমভাবে হত্যা পর্যন্ত করে।

সময়ের আবর্তে ক্যাথলিক প্রটেস্ট্যান্ট দ্বন্দ্ব হয়ে যায় ইউরোপের জন্য একটি নিত্য নৈমিত্যিক ব্যাপার। এই ধরণের একটি ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের উপরেই ফরাসি বিপ্লব কার্যকর হয়েছিলো যেখানে মানুষের মূল লক্ষ্য ছিলো গির্জার দাসত্ব থেকে মুক্তি। ক্যাথলিক ধর্মীয় পোপের মৌলবাদী আচরণের বিরুদ্ধে একটি উপযুক্ত জবাব দেয়ার সুযোগ খুঁজছিলো মানুষ যার সুযোগ সহজে মেলেনি। অন্যদিকে পরিবর্তনের বারতা নিয়ে এসেছে ফরাসি বিপ্লব। এর ফলে খ্রিস্টধর্মকে কিছু আচারসর্বস্ব প্রাতিষ্ঠানিকতায় রবিবারের নির্বাসনে পাঠিয়ে বাণিজ্যের পসরা খোলা পোপ এবার নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হন।

অর্থনৈতিক অবস্থা

দাসশ্রম ভিত্তিক ইউরোপের অর্থনীতি এই সময় টিকে ছিলো মূলত নানা স্থানে বিস্তৃত উপনিবেশ থেকে সীমাহীন লুটতরাজ ও সম্পদ আহরণের মধ্য দিয়ে। রাজনেতিক বিশৃঙ্খলা আর ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান হয়েছিলো নিম্নমুখী। অর্থসম্পদ একটি বিশেষ শ্রেণির হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। মানুষের জীবনের নেই নিরাপত্তা, রাষ্টযন্ত্রের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে অনেকে দেশান্তরী পর্যন্ত হয়েছিলো। অর্থনৈতিক সংকটে জীবন বাঁচানোর দায় যেখানে বড় সেখানে নানা উৎসব আয়োজনের ছুঁতো করে পোপ গণমানুষের কাছ থেকে লুঠ করে নিজের ভাণ্ডার শক্তিশালী করছে। এভাবে একটি দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিষ্পেষিত ছিলো সাধারণ মানুষ। ক্ষমতার দিক থেকে অনেকটাই ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র বলা যায় ফ্রান্সকে।

তাই অর্থনৈতিক দুরাবস্থার চিত্রটি সেখানেই সবার আগে অনেক পরিষ্কার হয়ে সবার চোখে ধরা দেয়। বিশেষ করে সমাজের সবথেকে নিচের স্তরে বসবাস করতো শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণি। তারাই ছিলো ইউরোপের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। উচ্চহারে কর প্রদানের পাশাপাশি নানামুখী শোষণ-নির্যাতনে তাদের জীবন হয়ে উঠেছিলো দুর্বিসহ। রাজা ও রাজকর্মচারীরা অপেক্ষাকৃত কম কর প্রদানের পাশাপাশি নানাবিধ রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধাও লাভ করতো। তারা একদিকে বিলাস ব্যসনে জীবনের সবটুকু উপভোগ করার সুযোগ পেতো অন্যদিকে সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকাটাকেই আজন্ম পাপ বলে মনে করতে শুরু করে। একটি সময় দেখা যায় রাজা ও রাজকর্মচারীদের সীমাহীন দুর্নীতি আর বিলাসিতায় রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় অনেক রাজ পরিবার বিভিন্ন ধণিক শ্রেণি থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে। উদাহরণ হিসেবে রথচাইল্ড পরিবার কিংবা ফ্রিম্যাসনারি গ্রুপ থেকে সাহায্য গ্রহণের কথা বলা যেতেই পারে। এক কথায় বলতে গেলে একটি অর্থনৈতিক দৈন্যচক্রে আটকে পড়ে ইউরোপের রাজশক্তি।

সামাজিক অবস্থা

ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে প্রায় প্রতিটি দেশের সামাজিক অবস্থা ছিলো দুর্বিসহ। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের পাশাপাশি তাদের দোসর শোষক শ্রেণি মানুষের উপর নানাভাবে চড়াও হয়। সাধারণ মানুষ যারা সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি তাদের জীবন ধারণই অনেক কঠিন হয়ে গেছিলো। ফ্রান্স থেকে শুরু করে অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, ব্রান্ডেনবার্গ, স্পেন, ইংল্যান্ড কিংবা তথাকথিত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য সবখানেই মানুষের কোনো অবস্থানগত মর্যাদা ছিলোনা বললেই চলে। স্বৈরশাসক ও তাদের দোসদের ছোবলে মানুষ পরিণত হয়েছিলো রাষ্ট্রযন্ত্রের একান্ত বাধ্যগত ভৃত্যে। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ সামাজিক সাম্যবস্থা নষ্ট করে বিশেষ শ্রেণির প্রাধান্য ও নিপীড়ন স্পষ্ট হয়েছিলো। তবে ফ্রান্সে সামাজিক অবস্থা সবচেয়ে সংকটময় ছিল।

সংস্কৃতি

জাতি রাষ্ট্রের ধারণা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইউরোপে একটি ভিন্ন ধরণের সংস্কৃতির অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। তবে সময়ের আবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলো আধিপত্য বিস্তারের লড়াইকে সবথেকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা শুরু করলে বাধে মূল বিপত্তি। বিশেষ করে ১৮ শতকের স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগণ রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য প্রায়ই অন্য রাষ্ট্রের উপর চড়াও হতেন। এভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর অন্যদেশ দখল করার মাধ্যমে ইউরোপের সংস্কৃতিতেও একটি পরিবর্তন ও অবস্থানিক মিথষ্ক্রিয়া লক্ষ করা যায়। যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা জাতিগত দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে দেশ ভ্রমণের মতো ঘটনাও এই সময় ইউরোপের সংস্কৃতি বদলে দিতে সাহায্য করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষ আকুল হয়েছিলো স্বাধীনতার স্বাদ নিতে।

উপনিবেশ

ফরাসি বিপ্লবের অনেক আগেই বিশ্বের নানা দেশে ইউরোপের উপনিবেশগুলো ছড়িয়ে পড়েছিলো। বিশ্বের নানা দেশ থেকে সম্পদ আহরণ ও লুটপাট করে তখন সমৃদ্ধ হচ্ছিলো ইউরোপের উপনিবেশিক দেশগুলোর কোষাগার। অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও নানা সংকটে উপনিবেশ থেকে আহরিত সম্পদই অনেক দেশের ভরসা হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় বাইরে থেকে আগত সম্পদে পরিপূর্ণ জাহাজ আক্রমণও নিত্যনৈমিত্যিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ইউরোপের রাজনৈতিক দুর্বলতা সম্পর্কে জেনে যায় উপনিবেশিত দেশগুলোও। সেখানেও ক্রমাগত বিদ্রোহ চলতে থাকে। কিছুক্ষেত্রে উপনিবেশের যুদ্ধে ইংল্যান্ড ফ্রান্সের কাছে গেরে গিয়ে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন, ভারতে ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্স পরাজিত হয়।

সামন্তপ্রথা

মধ্যযুগ থেকে শুরু হওয়া ন্যাক্কারজনক সামন্তপ্রথা ফরাসি বিপ্লব পূর্ব ইউরোপের রক্তে-রন্ধে স্থান করে নেয়। এর প্রভাবে অবস্থানগত সংকটে পড়ে স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগণ। তারা নামমাত্র বিশাল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সিংহাসন দখল করেছিলো। তবে পুরো শাসন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত হয়ে চলে যায় অত্যাচারী সব সামন্তপ্রভুদের হাতে। এরা অত্যাচার নিপীড়ন করে ইচ্ছাখুশি কর আদায় করে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণির জীবন অসহ্য করে তোলে। নানা স্থানে অঙ্কুরিত বিদ্রোহের বীজ পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে টালমাটাল করে দেয়। অনেক সামন্ত প্রভু নিজস্ব সেনাবাহিনী গড়ে তুলে সুযোগ বুঝে আশেপাশের এস্টেটের সামন্তপ্রভুর সম্পত্তি দখল করতে শুরু করে। তবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রবল ক্ষমতাধর এই ভূ-স্বামী সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার সুযোগ ছিলো না সাধারণ মানুষের। তারা কারণে-অকারণে জীবন দিতে বাধ্য থাকতো তবুও তাদের কোনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ছিলো না বললেই চলে।

দাস প্রথা

ফ্রান্সসহ ইউরোপীয় সমাজে প্রচলিত মানবতার জন্য মূর্তিমান অভিশাপ হচ্ছে দাসপ্রথা। ভূমিদাসদের মতো নির্যাতিত ও নিপীড়িত অন্য কেউ তখনকার সমাজে ছিলো না। সামন্তবাদী ইউরোপের ভূ-স্বামীদের মূল শক্তি হিসেবে ভূমিদাস প্রথা মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। নিপীড়ক ভূস্বামীরা এদের উপর কারণে অকারণে নানাবিধ অত্যাচার চালাতে থাকে। সারাদিন শস্যক্ষেতে শ্রম দিয়েও ভূমির উপর তাদের কোনো অধিকার ছিলো না। আমানুষিক অত্যাচার সহ্য করার পরেও তাদের কোনো বেতন ভাতা ছিলো না উপরন্তু ধর্ম প্রতিষ্ঠানসহ নানা ক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালনের দায়িত্ব তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হতো। কর্ভি নামক বিশেষ আইন প্রণয়ন করে তাদের দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে সড়ক নির্মাণ, গৃহনির্মাণ, গির্জার জমিতে বেগার শ্রম, মনিবের পশুর দেখাশোনার পাশাপাশি সড়ক ও সেতুর সংস্কারকাজে বাধ্য করা হতো। তাদের কাছ থেকে ভিংটিনি নামক আয়কর, ক্যাপিটেশন নামক বিশেষ কর, আবাস ভাড়া বাবদ টেইথ, তাইলি নামক রাজস্বের পাশাপাশি কারখানা, পানির কুয়া প্রভৃতির ব্যবহারে ব্যানালিটস নামক কর দিতে হতো। অন্যদিকে অত্যাচারী ভূ-স্বামীদের উপহার-আপ্যায়ন তথা প্রেজেন্টেশন ছিলো তাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

মনস্তাত্ত্বিক সংকট

আলোকময়তার দর্শন ইউরোপের গুটিকতক মানুষকে জ্ঞানচর্চার সুযোগ করে দিলেও সাধারণ মানুষ এর থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছিলো। তারা নানাদিক থেকে অত্যাচারিত হয়ে নিজের জীবনের প্রতি মায়া হারিয়ে ফেলে। অনেকটা দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়ে তাদের কাছে বেঁচে থাকাটাই অনেক কষ্টসাধ্য কাজ হয়ে যায়। তারা জীবন বাঁচাতে বিদ্রোহকে একমাত্র অবলম্বন মনে করে। ভূস্বামীদের প্রশিক্ষিত বাহিনীর কাছে বার বার মার খেতে থাকে তারা। তবুও নানা স্থানে বিদ্রোহের যে আগুন জ্বলে উঠেছিলো তা নেভাতে একটি বড়সড় সফল বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। পরবর্তী পাঠে এই বিষয়গুলো ইউরোপের নানা দেশের পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করলে আরো স্পষ্ট হবে।

পাঠ-২.২ ফরাসি বিপ্লবের কারণ

একটি বা কিছু বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কারণে ফরাসি বিপ্লবের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়নি। এর পেছনে যুগপৎ অনেকগুলো কারণ কাজ করেছে। আলোকময়তা পরবর্তীকালের আধুনিক ইউরোপের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি প্রায় প্রতিটি দেশেই উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দুটি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিলো। মুক্তবুদ্ধি চর্চার পীঠস্থানখ্যাত ফ্রান্সে এই দুটি শ্রেণির অস্তিত্ব আরো স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এখানে সংস্কারপন্থীগোষ্ঠী বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে প্রাচীন রীতিনীতিকে ঝেড়ে ফেলতে আগ্রহী হয়। অন্যদিকে প্রাচীন রক্ষণশীল মৌলবাদী গোষ্ঠী তাদের ক্ষমতা, কুসংস্কার ও গোঁড়া বিশ্বাসকে আগলে রেখে মানুষের উপর চড়াও হয়। পাশাপাশি অর্থনৈতিক দৈন্যের শিকার নিম্নশ্রেণি এই সময় তাদের অধিকার নিয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে সর্বত্র একটি যুদ্ধংদেহি মনোভাব স্পষ্টত দৃশ্যমান হয়েছিলো। এই অবস্থার মধ্যে অনেকগুলো কারণে ফরাসি বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। নিচে ফরাসি বিপ্লবের মূল কারণগুলো তুলে ধরা হলো–

রাজনৈতিক কারণ

ফরাসি বিপ্লবের পেছনে ফ্রান্সের রাজনৈতিক অনিয়ম ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন অনেকাংশে দায়ী ছিলো। বিশেষ করে বুরবোঁ রাজবংশের কুকীর্তি, শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা, রাজতন্ত্রের সীমাহীন ক্ষমতা, সামন্তবাদী শাসন, রাণীদের জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ড, আইনগত অসমতা, নাগরিক অধিকার না থাকা, ধর্মীয় মুক্তচিন্তার সুযোগ না থাকার পাশাপাশি চিন্তাজাগতিক ক্ষেত্রে রাজ্যের হস্তক্ষেপ ফরাসি বিপ্লবের পথ করে দিয়েছিলো। এসব রাজনৈতিক কারণে এখানে বিশ্লেষণ করা হলো–

১. **বুরবোঁ রাজবংশের দুঃশাসন:** ক্ষমতা দেশ শাসনে বুরবোঁ রাজাদের নানা কুকীর্তি ফরাসিদের বিক্ষোভে ফেটে পড়তে বাধ্য করেছিলো। ১৮ শতকের ইউরোপে অন্য দেশের রাজতন্ত্র যেখানে আস্তে আস্তে মানুষের জন্য কল্যাণকামী হয়ে উঠছে তখন বুরবোঁদের স্বেচ্ছাচারীতা মাত্রা ছাড়িয়েছিলো। চতুর্দশ লুই যেভাবে 'আমিই রাষ্ট্র' এই ধরনের ধারণা প্রচলন করেছিলেন এই যুগের রাজাদের মধ্যেও তার রেশ ছিলো। রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতার অনর্থক প্রয়োগ ঘটাতে গিয়ে শাসনক্ষেত্রের অবস্থা ছিলো শোচনীয়। রাজ্যের প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে আইন, বিচার ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজা ছিলেন সর্বেসর্বা। এই সময় রাজার ক্ষমতাকে চূড়ান্ত প্রমাণ করতে সবগুলো প্রতিনিধিত্বমুলক প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেয়া হয়। ষোড়শ লুই বেশ দম্ভের সাথে ঘোষণা করেন 'ফরাসিদের সার্বভৌম ক্ষমতা কেবলমাত্র তার উপর ন্যস্ত তাই আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতাও তাঁর'। আর তাঁর ইচ্ছার উপর ভিত্তি করেই স্ট্রেটস-জেনারেল নামক আইনসভা পর্যন্ত ভেঙে দেয়া হয়েছিলো। লুইয়ের স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলে তাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেপ্তার করে নির্যতন চালানো এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হতো। লেটা দ্য ক্যাস্তে (Lettre de Cachet) নামে পরিচিত নিকৃষ্টতম এক আইনে প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সে অনেক মানুষকে গ্রেপ্তার-নির্যাতন এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছিলো।

২. **শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা:** রাজার সর্বময় ক্ষমতার প্রদীপের নিচের অন্ধকার হিসেবে ফ্রান্সে বিদ্যমান ৪০ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের কথা বলা যেতে পারে। রাজা কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকার হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দিয়ে নানামুখী প্রভাব খাটালেও মূল ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়েছিলো স্থানীয় সরকারের প্রশাসকদের হাতে। এই সমস্ত স্থানীয় সরকারের প্রধান ইনটেনডেন্ট ও তার কর্মচারীরা জনগণের উপর নানামুখী অত্যাচার চালাতো। রাজার নির্যাতনের সাথে তাদের নির্যাতন একীভূত হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয় সাধারণ মানুষের জীবনে। এইক্ষেত্রে বেশিরভাগ রাজকর্মচারী ছিলেন বুর্জোয়াশ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী, যারা জনগণের কল্যাণের থেকে নিজেদের অবস্থা উন্নয়নে অধিক সচেষ্ট ছিলেন। ফলে প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দীর্ঘসূত্রিতা, অনিয়ম ও বেআইনি কার্যকলাপের আধিক্য থেকে শুরু করে নানা অনাচার দেখা দেয়।

৩. **রাজতন্ত্রের সীমাহীন ক্ষমতা:** ফরাসি রাজতন্ত্রের ক্ষমতাকে সর্বময় করতে অন্যসব ক্যাথলিক প্রধান দেশগুলোর মতো ফ্রান্সেও দৈব রাজতন্ত্রের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত করানোর একটি ধারণা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো। উপযুক্ত দক্ষিণার বিনিময়ে রাজার অপকর্মে বৈধতা দিয়ে সহায়তা করেন পোপ। দৈব রাজতন্ত্রে সর্বময় ক্ষমতা রাজার হাতে ন্যস্ত হওয়ার ফলে প্রশাসক হিসেবে যতটা ব্যর্থই হন রাজা হয়ে ওঠেন অত্যাচারের প্রতীক। পোপ সমর্থিত দৈব ক্ষমতার বলে রাজ্যশাসনের নামে স্বেচ্ছাচারিতামূলক একনায়কতন্ত্রকে আরো বেশি শক্তিশালী করে তোলা হয় যা ছিলো মানবতা পরিপন্থি। পোপের মাধ্যমে ক্ষমতার সর্বজনীন অবস্থান

লাভ করে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠেন রাজা যেখানে কৃতকর্মের জন্য তিনি পার্লামেন্ট বা জনগণ কারো কাছে দায়ী ছিলেন না। আইন প্রণয়ন, কর প্রবর্তন, কোনো রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, চুক্তি সম্পাদন থেকে শুরু করে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ছিলো একমাত্র রাজার।

৪. **সামন্তবাদী শাসন:** নামেমাত্র আধুনিক যুগের প্রত্যাবর্তন করলেও মধ্যযুগীয় বর্বর সামন্তপ্রথা ফ্রান্সের মাটি থেকে তখনো চিরতরে বিলুপ্ত হয়নি। সামন্তপ্রভুদের নারকীয় অত্যাচার নির্যাতন আর অনৈতিক কর্মকাণ্ড মানুষকে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এক মানবেতর অবস্থানে এনে দাঁড় করায়। শক্তিশালী স্বৈরতন্ত্রের প্রভাবে রাজার সকল নির্দেশ মানতে জনগণের গলদঘর্ম হতে হতো। সেই সাথে সামন্ত প্রভুর শোষণ আর নারকীয় নির্যাতন অনেকটাই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘাঁ হিসেবে দেখা দেয়। সামন্তবাদী অর্থনীতিতে কৃষক তার ভূমির মালিকানা লাভ করেনি। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রম দেয়া থেকে শুরু করে সবকিছু তাকেই করতে হতো। পাশাপাশি সামন্ত প্রভুরা নিজেদের অবস্থান সমুন্নত করতে পোপদের সাথে সম্পর্ক সবসময় ভালো রাখতে চাইতো। তাই তাদের খুশি করতে মানুষ সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে গির্জার জমিতে বেগার শ্রম দিতো যার বিনিময়ে খাদ্য বা পারিশ্রমিক কিছুই মিলতো না। রাজা ও পোপের প্রিয়পাত্র ভূ-স্বামী তথা সামন্তপ্রভুরা কৃষকদের অর্জিত সম্পদে বিলাসব্যসনে দিনাতিপাত করতেন অন্যদিকে কৃষকদের অবস্থা ক্রমশ নিম্নগামী হতে থাকে। সময়ের দাবি মেটাতে তাদের সামনে বিপ্লবী হয়ে ওঠা বাদে দাবি আদায়ের আর কোনো বিকল্প পথ ছিলো না।

৫. **রাণীদের জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ড:** ফরাসি রাজতন্ত্রের দুর্বলতম দিক হচ্ছে ফরাসি রাজ দরবার থেকে শুরু করে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাণীদের অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ। অনেক যোগ্য প্রজাহিতৈষি মন্ত্রী রাণীদের প্রিয়পাত্র না হওয়াতে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। পশ্চদশ ও ষোড়শ লুইয়ের দরবারে তাদের রাণীর প্রভাব ছিলো চোখে পড়ার মতো। এক কথায় বললে ষোড়শ লুইয়ের রাণী অ্যান্টয়নেট হয়ে ওঠেন তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যমণি। তাইতো তুর্গোর মতো একজন বিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও অর্থনীতিবিদকে মন্ত্রী পদ থেকে অপসারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন ষোড়শ লুই। দুর্বলচিত্ত ষোড়শ লুই রাণী ও দরবারের স্বার্থন্বেষী চক্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এভাবে রাণীদের অযৌক্তিক শক্তি প্রয়োগ আর অনাকাঙ্খিত ভূমিকা ফরাসি রাজতন্ত্রের ভিত্তিমূলকে আঘাত করে আস্তে আস্তে দুর্বল করতে থাকে ক্ষমতা কাঠামো।

৬. **আইনগত অসমতা:** ফরাসি সামন্ততন্ত্রে একই আইন প্রায়োগিক দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক লাভ করেছিলো। বলতে গেলে আইন প্রয়োগের এই অসম অবস্থানই প্রশাসনযন্ত্রকে নামান্তরে একটি নিয়মতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রে রূপ দিয়েছিলো। যেখানে মানুষের অধিকারের কথা বলাটা ছিলো উপহাসের সমতূল্য। বিপ্লব-পূর্ব ফ্রান্সের সর্বত্র একটি নির্দিষ্ট আইনের বদলে রাজ্যভিত্তিক আইন প্রচলিত ছিলো। এক্ষেত্রে রোমান আইনে পরিচালিত দক্ষিণ ফ্রান্সের সাথে উত্তর ও মধ্য ফ্রান্সের আইনের পার্থক্য থাকায় অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীরা স্থান বদল করতো। এভাবে দোষী ব্যক্তিরা খুব সহজেই উপযুক্ত শাস্তি থেকে বেঁচে যেতো। জানা যায় পুরো ফ্রান্স জুড়ে প্রায় ৪০০ টির মতো ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রচলিত হয়েছিলো যেগুলোর অধিকাংশ ল্যাটিন ভাষায় হওয়াতে সর্বসাধারণের বোধগম্য হতো না। তখনো হেবিয়াস-কর্পাস প্রবর্তন হয়নি। এর বদলে প্রচলিত কঠোর আইনে মামুলি অপরাধেও মানুষের অঙ্গচ্ছেদ করার পর্যন্ত বিধান রাখা হয়েছিলো।

৭. **নাগরিক অধিকার না থাকা:** নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে সবার আগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের কথাটি বলতে হয় যা তখনকার ফ্রান্সে এক অসম্ভব বলে বিবেচিত হতো। মানুষ জন্মগতভাবে রাষ্ট্র ও রাজার অধীন এখানে তার স্বাধীন সত্তা বলতে কিছু রাখা হয়নি। মানুষ তার প্রতিটা কর্মকাণ্ড তা ভালো কিংবা খারাপ যাই হোক এটা নিয়ে রাজার কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য ছিলো। বিশেষ করে তখনকার রাষ্ট্র চাইলে বিনা বিচারে যে কোনো মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েদখানায় আটকে রাখতে পারতো। তখনকার দিনের ফ্রান্সে গুপ্ত আটক নামে একটি বিশেষ প্রথা চালু হয়েছিলো। এভাবে আটক করে অনেক মানুষকে বিরোধিতা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। অনেককে ছেড়ে দিলেও বেশিরভাগ মানুষকে হত্যা ও গুম করা হয়েছে। অপরাধী তথা বিদ্রোহীদের আটক করে রাখার মতো এমন অনেক জেলখানা তখন গড়ে উঠেছিলো যার মধ্যে ইতিহাসবিখ্যাত বাস্তিল কারাদুর্গ অন্যতম।

৮. **ধর্মীয় ও চিন্তাজাগতিক ক্ষেত্র:** অগসবার্গের সন্ধির পর রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম এমন নীতি প্রতিষ্ঠা পায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রজাদের বাধ্যতামূলক ক্যাথলিক কিংবা প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতে দীক্ষিত করা হয়। ধর্ম বিশ্বাস যার যার আর

দেশটা সবার এমন ধারণা তখনো প্রতিষ্ঠা পায়নি। মানুষ তার চিন্তাজাগতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলো। অন্যদিকে গ্রন্থ প্রকাশ ও সংবাদপত্র ছাপানোর ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের অনুমতি নিতে হতো। এক্ষেত্রেও রাজার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলাটা প্রায় অসম্ভব ছিলো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রতিবাদী লেখনীর কারণে ভলতেয়ারের কারাবরণের কথা। অন্যদিকে বার সংস্কার, পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টধর্ম ততোদিনে একটি নতুন রূপ লাভ করেছে। কিংবা ক্যাথলিকদের অত্যাচারের অতিষ্ট অনেক প্রজা চাইছে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদে দীক্ষিত হবে। এক্ষেত্রে উভয় চিন্তার মানুষের উপরেই নেমে আসে বিভীষিকাময় নির্যাতনের ঘটনাগুলো।

অর্থনৈতিক কারণ

মুদ্রাস্ফীতি, তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ফ্রান্সের মানুষের জীবনযাত্রাকে অসহ্য করে তুলেছিলো। অর্থনীতি সমাজের কতিপয় মানুষের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ায় বাকিরা প্রান্তিক হয়ে পড়ে। কিছু ক্ষমতাবান মানুষের জীবন যেখানে আনন্দ উপভোগের এক অনন্য মাধ্যম বাকিদের কাছে সেই জীবন এক মূর্তিমান অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। এই ধরনের একটি পরিস্থিতি ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষাপট রচনা করে। বিভিন্ন শ্রেণির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এক ধরনের উল্লেখযোগ্য বৈষম্য সুস্পষ্ট হয়েছিলো।

১. **অর্থনৈতিক দায়িত্বঃ** রাষ্ট্রকে কর প্রদান থেকে শুরু করে একজন নাগরিকের আরো কিছু অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু ফরাসি-বিপ্লব পূর্ব ফ্রান্সের দিকে দৃষ্টি দিলে এক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত ধরনের অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে তখনকার ফ্রান্সের দিকে দৃষ্টি দিলে আমাদের দুই ধরনের জনগোষ্ঠীর ধারণা মেলে। প্রথমত অধিকারভোগী এবং দ্বিতীয় অধিকারবিহীন এই দুটি শ্রেণি তখনকার ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করে। এদের প্রথমোক্তটি কোনো ধরনের কর প্রদান না করে রাষ্ট্রের প্রায় সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। অন্যদিকে দ্বিতীয় শ্রেণি কর প্রদান করেও রাষ্ট্রের সকল সুযোগ, সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলো। দার্শনিক কিংবা সাহিত্যিক তাদের লেখনী বা বর্ণনায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন ঠিকই কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটই যে কোনো বিপ্লবকে উস্কে দিতে যথেষ্ঠ তা ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে আরেকবার প্রমাণিত হয়। তাই ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের সময় থেকে থেকে অর্থনৈতিক সংকটের সূচনা হয়েছিলো তা ফরাসি বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে।

২. **ত্রুটিপূর্ণ কর ব্যবস্থাঃ** ফ্রান্সের কর সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা ও ছিলো অযৌক্তিক, বিভ্রান্তিকর ও ত্রুটিপূর্ণ। অভিজাত শ্রেণিই বলতে গেলে ফ্রান্সের বেশিরভাগ ভূমি তাদের দখলে রেখেছিলো কিন্তু তারা ছিলো করের আওতার বাইরে। তারা করের বাইরে থাকায় রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত অর্থের যোগান নিশ্চিত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। প্রতি বছরের অর্থনৈতিক ঘাটতি ক্রমশ বেড়ে গেলে তার অতিরিক্ত চাপ প্রদান করা হতো নিম্নশ্রেণির উপর। কৃষকরা অভিজাতদের নির্মম নির্যাতনের শিকার হওয়ার পাশাপাশি তাদের অতিরিক্ত করের ভার বহন করতে গিয়ে নুইয়ে পড়ে। টেইল, ক্যাপিটেশন কিংবা ভ্যাঁতিয়াম এই তিন ধরনের করের ক্ষেত্রেই একটি চূড়ান্ত ধরনের অনিয়ম চোখে পড়ে। বিশেষ করে টেইল ছিলো ভূমিকর যা থেকে মুক্তছিলো যাজক (1^{st} Estate) ও অভিজাত সম্প্রদায় (2^{nd} Estate)। তবে তৃতীয় শ্রেণি এই কর দিতে বাধ্য ছিলো। উৎপাদন ভিত্তিক আয়কর ক্যাপিটেশন সমাজের সকল স্তরের মানুষের উপর জারি হওয়ার বিধান থাকলেও যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় অনেক ছল-ছুঁতোয় এর থেকে অব্যাহতি পেতো। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর জারিকৃত কর বা ভ্যাঁতিয়াম থেকেই নানাভাবে মুক্তি পেয়ে যেতো অভিজাত সম্প্রদায় কিংবা যাজকগণ। ফলে প্রত্যক্ষ করের প্রত্যেকটির ভারই এসে পড়তো তৃতীয় শ্রেণির(3^{rd} Estate) উপর। মন্ত্রী তুর্গো হিসেব করে বের করেন ফরাসি কৃষকগণ তাদের মোট আয়ের পাঁচভাগের চারভাগই কর হিসেবে দিয়ে দিতো। চার্চ তাদের থেকে টাইদ (Tithe) বা ধর্মকর আদায় করতো, জমিদার আদায় করতো টেইল। করভারে জর্জরিত ফ্রান্সের কৃষকরা বছরের বেশিরভাগ সময় কেবলমাত্র আলু খেয়ে জীবন ধারণ করতো। ত্রুটিপূর্ণ কর পদ্ধতির কারণে রাজকর্মচারী ও জমিদার এমনকি চার্চের রক্ষীদের হাতে পর্যন্ত নির্যাতিত হতো অসহায় কৃষক। আর এই নির্যাতিত জনগোষ্ঠীই পরবর্তীকালে ফরাসি বিপ্লবের মূল হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিলো।

৩. **অর্থনৈতিক ভ্রান্তির জাদুঘরঃ** অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে কর আদায়ে নানাবিধ অনিয়ম ও জটিলতা বিশ্লেষণ করে অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ ফ্রান্সকে 'অর্থনৈতিক ভ্রান্তির জাদুঘর' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনেক সময় এককালীন কর সংগ্রহ করতে গিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা অভিজাতদের ইজারা দেয়া হতো। নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকায় পুরো

জমির ইজারা লাভ করেও তাদের সন্তুষ্টি মেলেনি। অনিয়মতান্ত্রিক ও অনির্ধারিতভাবে ইচ্ছেখুশি কর আদায় করে কৃষকদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিলো তারা। একদিকে করের নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্য অন্যদিকে আদায়ের অযৌক্তিক কঠোরতা কৃষকদের জীবনকে মূর্তিমান অভিশাপে পরিণত করে। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ শুল্কপ্রথা এক স্থান হতে অন্যস্থানে পণ্য বিনিময়ে বিশেষ জটিলতার জন্ম দেয়। এটাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে রাষ্ট্রের শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নানা উপায়ে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা শুরু করে। বণিকদের উপর তাদের অকথ্য অত্যাচারে ব্যবসা বাণিজ্যে পর্যন্ত ধ্বস নামে। এভাবেই ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিলো।

৪. **শূন্য রাজকোষঃ**চতুর্দশ লুই ক্ষমতার দাপট দেখাতে গিয়ে অযৌক্তিকভাবে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এই যুদ্ধগুলোর ফলে ফরাসি রাজকোষ চাপের মুখে পড়ে। তিনি তাঁর পরবর্তী রাজা পঞ্চদশ লুইকে অর্থনৈতিক সংস্কারে মনোযোগী হতে নির্দেশ দিলেও তিনি তার কথার পরোয়া করেননি। পঞ্চদশ লুই অনিয়ন্ত্রিত বিলাস-ব্যাসনের পাশাপাশি আরো কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ফরাসি রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। পোল্যান্ডের বিভাজন সম্পর্কিত যুদ্ধ, অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা আরো পরিষ্কার হয়েছিলো। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে ষোড়শ লুই যখন সিংহাসনে বসেন তখন প্রায় ভেঙে পড়েছিলো ফরাসি অর্থনীতি। অহেতুক কর্মচারী ও কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি, রাজপ্রাসাদের অতিরিক্ত ব্যয় ও রাণীদের বিলাস-ব্যসন ফ্রান্সকে ঋণের ভারে জর্জরিত করে। ১৭৮৮ সালের দিকে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যেখানে রাষ্ট্রে মোট আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ ঋণশোধ ও প্রতিরক্ষা খাতেই ব্যয় হতো।

৫. **নেকারের অপসারণঃ**ফরাসি অর্থনীতির দুর্দিনে ত্রানকর্তার ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন অর্থনীতিবিদ নেকার। অ্যাডাম স্মিথের পর তাঁকে অনেক যোগ্য অর্থনীতিবিদ হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান দেয়া হয়। তিনি ক্ষমতা লাভ করে সবার আগে করনীতির পুনর্বিন্যাসে মনযোগী হন। তিনি লক্ষ করেন ফ্রান্সের অধিকারভোগী শ্রেণি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোনো কর প্রদাণ করেনা অন্যদিকে অধিকারবিহীন শ্রেণির উপর নানাবিধ কর চাপানো থাকলেও তাদের সে কর প্রদাণের সক্ষমতা নেই। তাই ক্ষমতা পেয়েই তিনি বিভিন্ন দমনমূলক কর বাতিল করে প্রতিটি শ্রেণির উপর করের সমবন্টন করেন। তিনি বিশেষ শ্রেণির আর্থিক সুবিধা বন্ধ করা, কঠোর হাতে শুল্ক খাতের দুর্নীতি দমন ও প্রশাসনিক অমিতব্যয়িতাকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেন। কিন্তু রাণীর প্ররোচনায় তাকে অপসারণ করে ষোড়শ লুই নিজে হাতে ফ্রান্সের দুর্দিন আরো ঘনীভূত করেন। বলতে গেলে নেকারের অপসারণের মাধ্যমে ফরাসি অর্থনীতিতে নতুন করে যে সংকট তৈরি হয় তা বিপ্লবকে আরো অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

৬. **মুদ্রাস্ফীতিঃ** মন্ত্রী নেকারের অপসারণ উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। রাণী ও অভিজাতদের ভূমিকার সামনে রাজার অসহায় অবস্থান জনগণের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা যায় যা রাষ্ট্রকে চরম দেউলিয়াত্বের সম্মুখীন করে। অনিয়ন্ত্রিত ও অযৌক্তিক করপ্রথা মুদ্রাস্ফীতিকেও প্রবল করে তোলে। ডেভিড থমসন দেখিয়েছেন প্রায় ৬৫ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি ঘটলেও সেই অনুপাতে মানুষের আয় একদম বাড়েনি যা ফরাসি বিপ্লবের আগমণ ত্বরান্বিত করে। ফ্রান্সের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য রুটির মূল্য শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়াতে সাধারণ শ্রমিক ও চাকুরীজীবীদের পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্ধাহার, অনাহার ও আর রুটিদাঙ্গা হয়ে ওঠে তখনকার ফ্রান্সের নিত্য নৈমিত্যিক ব্যাপার।

৭. **মঙ্গা ও খাদ্য সংকটঃ** অনিয়মতান্ত্রিক কর আদায় ও নির্যাতনে কৃষকদের অবস্থা যখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তখন ফ্রান্সে ভয়াবহ মঙ্গা দেখা দেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি ১৭৮৮ সালের ফ্রান্সে ভয়াবহ খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে। জীবন বাঁচানোর তাগিয়ে হাজার-হাজার বুভুক্ষু মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে পাড়ি দেয় এবং প্যারিসে এসে সমবেত হতে থাকে। ক্ষুধার্ত মানুষ শহরে এসে বাকিদের বিলাস ব্যসনের জীবন দেখে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তারা এখানে এসে একইসাথে দেখতে পায় নিজেদের দৈন্য আর তাদেরই হাতে উৎপাদিত ফসলে শহুরেদের অযৌক্তিক বিলাসিতা। এক টুকরো রুটির সন্ধানে তারা প্যারিসের নানা স্থানে চোরাগোপ্তা আক্রমণ ও লুটপাট করতে থাকে। এমনি প্রেক্ষাপটের উপর ১৭৮৯ সালে দিকে ফ্রান্সের অনেকগুলো গ্রামে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় যা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে দেশ জুড়ে।

সামাজিক কারণ

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা আর অর্থনৈতিক অব্যবস্থার মতো সামাজিক অসমতা ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের শাসনতান্ত্রিক বৈষম্য মানুষকে হতাশ করে তোলে। বিশেষ করে কর না দিয়েও রাজ্যের সকল সুবিধালাভকারী যাজক ও অভিজাতদের কর্মভূমিকা সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ট করে তোলে। পক্ষান্তরে কর দিয়েও রাজ্যের সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত এই শ্রেণি তাদের সামাজিক জীবনের দুর্বলতা বেশ ভালোভাবে অনুভব করে। পাশাপাশি অভিজাত শ্রেণির অনেক দুর্বৃত্তের হাতে অনেক নিম্নশ্রেণির নারী ক্রমাগত লাঞ্ছিত হয়। অনেক কৃষকের সামনে থেকে তার স্ত্রী কিংবা মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে ঘৃণ্য লালসা চরিতার্থ করেও পার পেয়ে যায় অনেক অভিজাত। এই ধরনের বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে সংখ্যায় মাত্র তিন লক্ষ হয়েও উপরের দুইটি শ্রেণি পুরো ফরাসি জাতির উপর স্কন্ধের মতো চেপে বসেছিলো। তখনকার সমাজের ফার্স্ট-এস্টেট বা যাজক শ্রেণি, সেকেন্ড-এস্টেট বা অভিজাত শ্রেণি আর থার্ড-এস্টেট তথা মধ্যবিত্ত ও উৎপাদনকারী শ্রেণির জীবন-যাপন প্রণালিতেও ছিলো ঘোর পার্থক্য। তাই ১৭৮৯ সালে এসে এই সামাজিক অসমতাই হয়ে যায় বিপ্লবের মূলকথা।

১. **যাজক শ্রেণির দৌরাত্বঃ** ফরাসি সমাজের প্রথম শ্রেণিভুক্ত যাজকরা সব মিলিয়ে সংখ্যায় ততটা বেশি ছিলো না। তবুও অবস্থানগত কারণে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা লাভ করে আসছিলো তারা। বিশেষ করে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার যাজকের দ্বারা পুরো ফ্রান্সের ধর্মকর্ম নিয়ন্ত্রিত হতো। অনেকগুলো রাজনৈতিক, বিচার প্রক্রিয়াগত ও সামাজিক সুবিধা লাভ করে দিনের পর দিন যাজকদের স্বেচ্ছাচারী আচরণ স্পষ্ট হতে থাকে। এরা স্থাবর সম্পত্তি ও টাইদ (Tithe) নামে পরিচিত বিশেষ করের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হয়ে উঠেছিলো। গির্জার নামে অর্থ উপার্জিত হলেও বিলাস-ব্যসনে তারা অভিজাতদের থেকে কম যেতো না। ভলতেয়ারের হিসেব অনুযায়ী একাধারে শহর ও গ্রামে বিস্তৃত চার্চের স্থাবর সম্পত্তি থেকে আয়ের পরিমাণ ছিলো প্রায় ৯ কোটি লিভার। নেকার যে সংশোধিত হিসেব পেশ করেন সেখানে চার্চের আয় দেখা যায় প্রায় ১৩ কোটি লিভারের মতো। স্বেচ্ছাদান ও দেমিস এর মতো নামমাত্র কর তাদের আয়ের হিসেবে নিতান্তই তুচ্ছ ছিলো। নিজস্ব প্রাসাদ, দুর্গ ও গির্জা নিয়ে আভিজাত্যের প্রশ্নে অন্যদের থেকে কোনো অংশেই পিছিয়ে ছিলো না যাজকবর্গ। অনেকটা রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠেছিলো ফ্রান্সের রোমান ক্যাথলিক গির্জাগুলো যাদের স্বেচ্ছাচারী আচরণে যার পর নাই বিরক্ত হয়েও মুখ খুলতে পারেনি সাধারণ মানুষ। তবে উর্ধ্বতন যাজক আর অধস্তন যাজক সে যেই হোক তাদের বেশিরভাগই অভিজাতশ্রেণি থেকে উদ্ভুত। তাই বিশপ, ক্যানন কিংবা মঠাধ্যক্ষ এদের কারো চিন্তা চেতনাতে সাধারণ মানুষের অধিকারের ছিঁটেফোঁটা পর্যন্ত স্থান পেতো না। গবেষণায় জানা যায় ফরাসি-বিপ্লবের পটভূমিতে ফ্রান্সের নানা স্থানের প্রায় ১৪০ জন বিশপের সবাই ছিলেন অভিজাত। তাদের হাতে থাকা গির্জার প্রায় সকল সম্পত্তি আস্তে আস্তে তাদের বিলাস ব্যসনের হাতিয়ারে পরিণত হয়। রাজপ্রাসাদের দরবারি অভিজাতদের মতো উর্ধতন যাজকগণও মদ্যমান, নারীসঙ্গ, জুয়া খেলা থেকে শুরু করে বিবিধ অপকর্ম করে ভার্সাই নগরীতে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করতেন। অধস্তন যাজকদের অবস্থা তেমন ভালো ছিলো না। তাদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নানারকম কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রাখা হতো। তবে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত এই অধস্তন যাজকরা আস্তে আস্তে উর্ধ্বতন যাজকদের অপকর্ম সম্পর্কে জেনে গিয়ে তাদের বিরুদ্দে সোচ্চার হয়েছিলেন। এদের কাউকে নাস্তিক কিংবা ধর্মদ্রোহী বলে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা চললেও মূল সত্য শেষ পর্যন্ত অজানা থাকেনি। ধীরে ধীরে ফ্রান্সের মানুষ গির্জা ও বিশপদের এই ধর্মভিত্তিক ষড়যন্ত্রকে রুখে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলো। তবে বেশিরভাগ বিশ্লেষক মনে করেন অধস্তন ও উর্ধ্বতন যাজকদের এই বিবাদ ফরাসি বিপ্লবকে প্ররোচিত করেছিলো।

২. **অভিজাত শ্রেণি:** ফরাসি সমাজের স্তর বিন্যাসে যাজক শ্রেণির পরেই অবস্থান ছিলো অভিজাতদের। তারা কর না দিয়েও বেশিরভাগ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করতো। চার্চ ও যাজকদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখায় ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তারা অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলো। ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে তাদের সংখ্যা মাত্র তিন লক্ষাধিক হলেও এই নগন্য সংখ্যা নিয়ে তারা পুরো সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলো। রাষ্ট্রের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করলেও তারা ছিলো প্রতিটি নাগরিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত। পাশাপাশি রাজ দরবারের অভিজাতগণ নানা ধরনের বৃত্তি, ভাতা ও অনুদান লাভ করতো যা ছিলো অবাস্তব ও অনৈতিক। এই সময় ফ্রান্সের প্রশাসন ও বিচার বিভাগের সম্প্রসারণে আরেক শ্রেণির পোশাকী অভিজাত শ্রেণি উৎপত্তি লাভ করে। এদের

বেশিরভাগের শিকড়ই উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে প্রোথিত ছিলো। ফ্রান্সের নানা স্থানে অনুৎপাদনমুখী অবস্থা আর মন্দার প্রভাবে আর্থিক সংকটে পড়েন অভিজাতরাও। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ শোষণ করেই তারা দিনাতিপাত করতেন। তবে সেই নিম্নশ্রেণিই যেখানে খাদ্যাভাবে ধুঁকছে তাদের অবস্থা খারাপ হওয়াটাই ছিলো স্বাভাবিক। এর পরেও অনেক অভিজাত গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালাতে থাকে। সময়ের আবর্তে তারা সামাজিক মানুষের শত্রু এক প্রতিক্রিয়াশীল জাতিতে পরিণত হয়। তাদের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তশ্রেণি ধীরে ধীরে সংঘটিত হতে থাকে। অভিজাতদের অযৌক্তিক সুবিধালাভ, অনর্থক অত্যাচার নিপীড়ন আর ভোগ-বিলাস দেখে সাধারণ মানুষ তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে শ্রেণি সংঘাত স্পষ্ট করে। এই সংঘাত শেষ পর্যন্ত ফরাসি বিপ্লবের বিস্ফোরণে রূপ নেয়।

৩. **মধ্যবিত্ত শ্রেণি:** যাজক সম্প্রদায় আর অভিজাতদের পরে সমাজে অবস্থান ছিলো মধ্যবিত্তদের। তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আংশিক সুযোগ সুবিধা লাভ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রের অনেক দায়িত্বও পালন করতো। বিশেষ করে অনেক সরকারী চাকুরে, গ্রামীণ কৃষক, বণিক,পুঁজিপতি, শিল্পপতি, আইনজীবি, চিকিৎসক ও শিক্ষক শ্রেণির মানুষ এর আওতায় পড়তেন। এদের বেশিরভাগ শহরবাসী হলেও গ্রামের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো। বিশেষ করে মধ্যবিত্তশ্রেণির মানুষ যারা শহরে বাস করতেন তাদের বেশিরভাগ আত্মীয় স্বজন বাস করতেন গ্রামে। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পর বুর্জোয়া শ্রেণি যে ধরনের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিলো ফ্রান্সের অবস্থা তেমনটি ছিলো না। তবুও গ্রামবাসীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে তারা ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে মূল কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ফ্রান্সে সামন্ত প্রথার সুবাদে মধ্যবিত্তশ্রেণি সেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। তবে সংখ্যায় কম হলেও শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে এই শ্রেণি সব সময় অভিজাতদের থেকে একধাপ এগিয়ে ছিলো। বিশেষ করে বিদ্যা-বুদ্ধি ও জাতীয়তাবাদী চেতনা এদের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিলো যা তাদের অভিজাতদের থেকে পৃথক করেছিলো। নিম্নশ্রেণির মতো রাষ্ট্রের রাজস্ব ও ব্যয়ভার বহন করেও তারা অনেক ক্ষেত্রে বিশেষত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অবহেলিত ছিলো। এই ধরণের বৈষম্যের নীতি মধ্যবিত্তশ্রেণিকে প্রথম দুইটি শ্রেণির ঘোর বিরোধী ও প্রতিবাদী করে তোলে। পাশাপাশি শিক্ষিত হওয়ায় অনেক দার্শনিকের নীতিগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভের সুযোগ হয়েছিলো তাদের। তারা জ্ঞান বিজ্ঞানে এগিয়ে গিয়ে কখনোই পূর্বতন কুসংস্কারে পাশাপাশি ধর্মের দোহাই দিয়ে চার্চের অপকর্মগুলো মেনে নিতে নারাজ ছিলো। তাই সমাজ ব্যবস্থা সংস্কারে উদ্যোগী হয়ে তারাই ফরাসি বিপ্লবের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলো।

৪. **কৃষক ও শ্রমিক:** অভিজাত ও যাজকদের অত্যাচার ও নানামুখী শর্তের মধ্যে বাস করতে গিয়ে যেমন মধ্যবিত্ত শ্রেণি অনেক যন্ত্রণার শিকার হয়েছে সেই তুলনায় কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা ছিলো শোচনীয়। অভিজাতদের শোষণ আর চার্চের নানামুখী বিধিনিষেধের মধ্যে বাস করা এই কৃষক-শ্রমিক অনেকটা ছিল জীবন্মৃত। রাষ্ট্রের সকল ব্যয়ভার নানামুখী করের মাধ্যমে তারা বহন করলেও এর বিনিময়ে তাদের মিলতো নানামুখী অবহেলা, অত্যাচার ও নির্যাতন। অত্যাচারী সামন্ত প্রভুর শোষন আর আর চার্চের বিশপের আজগুবি নানা নিয়মের জালে নিষ্পেষিত ছিলো তাদের প্রতিটি দিন। অভুক্ত অবস্থায় বেশিরভাগ সময় খুব ভোরে ক্ষেত-খামার কিংবা কারখানায় কাজ শুরু করে যারা প্রতিদিনের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সচল করতো সন্ধার পর তারা হারিয়ে যেতো ফ্রান্সের হিসেবের খাতা থেকে। নৈশ ক্লাবের হৈ-হুল্লোড় কিংবা ফরাসি অভিজাতদের আলোচনার টেবিল কোথাও স্থান হতোনা এই হতভাগ্যদের। তাদের জন্মই ছিলো একটি মূর্তিমান অভিশাপ যা খণ্ডাতে আজীবন নিঃস্বার্থ শ্রম দিয়ে যেতে হতো। এই দুঃখ দুর্দশা ও অত্যাচারের মুখেও ধীরে ধীরে কৃষক-শ্রমিকের জনসংখ্যা ধীরে ধীরে আরো বেড়ে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল উৎপাদিত না হলেও কৃষকদের উপর থেকে করের ভার হালকা করা হয়নি বরং চলেছে নানামুখী নিপীড়ন-নির্যাতন। ধীরে ধীরে সংখ্যায় বেড়ে যাওয়া কৃষকশ্রেণি তাদের আহারের সংস্থান করতে না পেরে বিদ্রোহের পথ খুঁজে নিয়েছে। তারা দেখিয়ে দেয় অসহায় নিরীহ এই মানুষগুলো কোদাল-লাঙল দিয়ে মাঠে ঘাম ঝরিয়ে কাজ করতেই শুধু জানে না, প্রয়োজনে অত্যাচারী শোষকদের রক্তও ঝরাতে পারে। তাদের প্রতিবাদে ধ্বনিত হয় অনর্থক কর প্রদানের দিন শেষ, ধর্মের নামে গির্জার জমিতে বেগার শ্রম দেয়ার দিন শেষ। পুরো ফ্রান্স জেগেছে অভিজাততান্ত্রিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, সময় হয়েছে বিপ্লবের।

জ্ঞানতাত্ত্বিক কারণ

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বৈষম্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক অধিকার হরণ মানুষকে নানাদিক থেকে হতাশ ও বিদ্রোহী করে তোলে। মানুষের মাঝে বিদ্যমান চাপা ক্ষোভ আর এই বিদ্রোহকে বৃহৎ ও কার্যকর বিপ্লবে রূপ দিতে সহায়তা করে জ্ঞানতাত্ত্বিক জাগরণ। বলতে গেলে ফরাসি বিপ্লব শুরুর অনেক আগে থেকেই ভাবজাগতিক বিপ্লব শুরু হয়েছিলো। ১৮ শতকে ফরাসি সাহিত্য ও দর্শনে যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিলো তা ফরাসি বিপ্লবকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলো মধ্যবিত্ত শ্রেণি তারা ছিলো শিক্ষিত ও জ্ঞান অনুরাগী ফলে নানা দার্শনিকের অভিমত খুব সহজেই ফরাসি বিপ্লবে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলো। এক্ষেত্রে ফ্রান্সের সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রজীবনের থাকা নানা অন্যায়, অসমতা ও দুর্গতি নিয়ে রচিত এই লেখাগুলো মানুষের মনে বিপ্লবী ভাবতরঙ্গের সঞ্চার ঘটায়। এর থেকে মানুষ খুঁজে নেয় তাদের প্রতিবাদের ভাষা, ধীরে ধীরে একত্রিত হতে থাকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডে ১৬৮৮ সালে সংঘটিত গৌরবময় বিপ্লব ও জন লকের (John Locke) রাজনৈতিক দর্শন ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষাপট তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলো বলে ধারণা করা হয়। এই বিষয়টি নিচে অলোচনা করা হলো–

১. **মন্টেস্কু:** ফরাসি বিপ্লবকে যাঁরা সরাসরি প্রভাবিত করেছিলেন তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একজন তাত্ত্বিক মন্টেস্কু কিছুদিন ইংল্যান্ডে বাস করে সেখানকার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। তিনি ফ্রান্সের অনিয়ম, দুর্নীতি ও জনদুর্ভোগ দেখে অনেক হতাশ হয়েছিলেন। তবে ইংল্যান্ড থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে বিপ্লব বিমুখ ও রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এই ফরাসি তাত্ত্বিক অনেক সরকার বিরোধী কথা বলে ফেলেন যা ফরাসি বিপ্লবকে আরো তুঙ্গে নিয়ে যায়। বিশেষ করে ধর্মের নামে মঠ কেন্দ্রিক ব্যবসার পাশাপাশি শাসনতান্ত্রিক নানা অনিয়ম ও লাগামহীন স্বৈরতন্ত্রের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। 'দি পার্সিয়ান লেটার্স (The Persian Leters)' গ্রন্থে তিনি ঐ সময়ের সামাজিক অবস্থার বিবরণ দিয়ে জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা করে গেছেন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের দাবি নিয়ে তিনি রচনা করেন দি স্পিরিট অব ল'জ (The Sprit of Laws) আরেকটি বিখ্যাত বই। পরবর্তীকালে বিপ্লবীরা যে বিধান জারি করেছিলো সেখানেও যথেষ্ঠ প্রভাব রেখেছিলেন মন্টেস্কু।

২. **ভলতেয়ার:** ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে প্রতিবাদী সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন ভলতেয়ার। তিনি ১৮ শতকের সংস্কারবাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ভলতেয়ার মহান ফ্রেডারিখের দরবারের একজন আমন্ত্রিত অতিথি হওয়ার পাশাপাশি রুশ রাণী দ্বিতীয় ক্যাথরিনের সাথেও পত্র যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। তিনি একাধারে দার্শনিক, কবি, ইতিহাসবিদ, নাট্যকার, রম্যলেখক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি চার্চের বিভিন্ন দুর্নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি মুক্তমত প্রকাশ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। রাজতন্ত্রের ঘোর সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রচলিত শাসন কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য সংস্কারের পক্ষে তীব্র সমর্থন জ্ঞাপন করেন। যুক্তিবাদী এই লেখক ফ্রান্সের স্বৈরচারী শাসনকে নানাদিক থেকে সমালোচনা করে তুলোধুনো করেন। বিশেষত বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের জনগণকে কেবলমাত্র লেখনী শক্তির মাধ্যমে বিদ্রোহী করে তুলতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিলো।

৩. **রুশো:** ফরাসি বিপ্লব নিয়ে যে সকল লেখক ও তাত্ত্বিক উদ্দীপনামূলক রচনাগুলো তৈরি করেছেন তাদের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বের সাথে রুশোর অবদানকে স্মরণ করতে হয়। তিনি বিপ্লবপূর্ণ ফ্রান্সে এক অভূতপূর্ব চেতনা ও প্রতিরোধের বাণীর সঞ্চারণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। যুদ্ধের মন্ত্রণা দিয়ে তিনি ইউরোপীয়দের মাঝে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিবাদই ছিলো প্রথম প্রতিরোধ যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে। রুশোর লেখালেখি ফরাসি বিপ্লব-পূর্ব সময়ে মানুষকে প্রতিবাদের চেতনায় উদ্দীপ্ত করে। একজন লেখক কিংবা দার্শনিক হিসেবে ভলতেয়ার যেমন বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন রুশো চাইতেন সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে দেশের শাসনতন্ত্র পুনর্গঠিত হোক। রুশো মনে করতেন মানুষ স্বাধীন সত্তা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেও চারপাশের নানা দায়িত্বও নিয়মের মধ্যে পড়ে পরাধীন হয়ে পড়ে। তাই মানুষের জন্মগত দায়িত্ব সকল পরাধীনতার জিঞ্জির ছিড়ে মুক্ত স্বাধীন জন্মগত সত্তাকে সমুন্নত করা। প্রচলিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি পুরোপুরি আস্থাহীন রুশো ছিলেন গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক। তিনি সব জনগণের একনিষ্ঠ সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিই প্রথম মতামত প্রদান করেন রাষ্ট্র যদি জনগণের কথা মতো পরিচালিত না হয় তবে সেই রাষ্ট্রের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জনগণের অধিকার এমনকি নৈতিক দায়িত্বও বটে। তিনি বিখ্যাত *সোসিয়েল কন্টাক্ট* (Sociale Contract) গ্রন্থে এই কথাই স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি আরো বলেন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটিই মানব সভ্যতার বিকৃতি ও অবনমনের জন্য দায়ী। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন যে সকল মানবাধিকার সম্পর্কিত বাণীর প্রথম পরিচয় মেলে সেগুলোর একটি পরিপূর্ণ রূপ দেখা যায় রুশোর রচনাগুলোতে।

৪. **অর্থনীতিবিদদের প্রভাব:** ফ্রান্সের অর্থনীতিতে ক্রমাগত ধ্বস আর মানুষের জীবনযাত্রার ক্রমাবনত অবস্থা থেকেই ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিলো। তুর্গোর মতো একজন গুণী অর্থমন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করার মধ্য দিয়েই বলতে গেলে ফরাসি রাজতন্ত্র একটি বিপ্লবের সম্মুখীন হওয়ার পথ করে নেয়। বিখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথের নীতিতে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদগণ তখনকার ফ্রান্সে ফ্রিজিওক্র্যাট (Physiocrats) নামে পরিচিত ছিলেন। অর্থনৈতিক সংস্কারের ব্রত নিয়ে আন্দোলন পরিচালনাকারী এই গ্রুপের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন সে (Say), কুইজনে (Quesnay) ও মিরাবুঁ (Mirabeau)। তবে এঁদের মধ্যে সবথেকে চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন কুইজনে। তাঁর নেতৃত্বে ফিজিওক্র্যাটরা অর্থনীতির নতুন নতুন ব্যখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিতে মূল উৎপাদনকারী শ্রেণি হিসেবে কৃষক, শ্রমিক ও বিভিন্ন মজুর হচ্ছে সম্পদের প্রকৃত মালিক কিন্তু তারা নির্যাতিত নিষ্পেষিত। পাশাপাশি কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন তাঁরা। তাঁরা সবসময় চাইতেন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরভাগ ও বাইরে বাণিজ্য সুবিধা অবাধ ও অরারিত করা হোক। শিক্ষা মানুষের জীবনকে পরিশীলিত, মার্জিত ও উন্নত করে এই বিশ্বাস থেকে শিক্ষাকে শ্রেণি-ধর্ম নির্বিশেষে অবারিত করার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরা।

৫. **বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়া রচনাকারী:** আলোকময়তা পরবর্তীকালের ইউরোপে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চায় নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছিলো। এই সময়ের ফ্রান্সে একদল চিন্তাশীল গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে যাঁরা বিশ্বের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে একত্রিত করে গ্রন্থিত করার মহান ব্রত গিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যে দিদেরো, দ্য এলেম্বার্ট প্রমুখ ব্যক্তি অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। এঁদের নেতৃত্বাধীন বিশ্বকোষ প্রণেতাগণ লেখনীতে ফ্রান্সের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও চার্চের অনৈতিক নির্যাতনের কঠোর সমালোচনা করেন। পাশাপাশি সামাজিক অনাচার, দুর্বলের উপর অভিজাতদের চড়াও হওয়ার নীতি, বিচারব্যবস্থার কলুষিত দিক, অসম রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আর্চ বিশপের নেতৃত্বাধীন ধর্মাধিষ্ঠানভিত্তিক ষড়যন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করা হয়। শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এই গোষ্ঠী লেখনীর দ্বারা বিভিন্ন অনৈতিকতা ও অসমতা জনগণের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যা বিদ্রোহের আগুনে ঘি ঢালে এবং ফরাসি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে।

ফরাসি বিপ্লবের অন্যান্য কারণগুলো

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি কিছু বিচ্ছিন্ন কারণ ছিলো যেগুলো ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পটভূমি রচনা করেছিলো। বিশেষত ফ্রান্সের অসমতা ও অসঙ্গতির সময়ে আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের সফলতা, ইংল্যান্ডে গৌরবময় বিপ্লব, কিছুদিন আগে সংঘটিত হওয়ার দুর্ভিক্ষ ও মঙ্গা থেকে শুরু করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অসমতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এই বিষয়গুলো মানুষকে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে বাধ্য করে। মানুষ আমেরিকার বিপ্লবীদের দেখে প্রতিবাদ করতে আগ্রহী হয়। বিশেষ করে বিভিন্ন লেখকের রচনা পড়ে তারা বাইরের দেশগুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছিলো। বাইরের দেশগুলোতে কিভাবে বিপ্লবীরা সফল হয়েছে তা জানতে পেরে তারাও অনেক সাহস নিয়ে ফ্রান্সের স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিল।

১. **ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের প্রভাবঃ** দ্বিতীয় জেমসের অত্যাচারে অতীষ্ঠ ইংরেজরা হল্যান্ডের অরেঞ্জ পরিবারের রাজকুমারী মেরির স্বামী উইলিয়ামকে ইংল্যান্ডের সিংহাসন লাভের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। প্রথমত ইংল্যান্ডের মানুষ ভেবেছিল দ্বিতীয় জেমসের পর রাণী হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন মেরি। কিন্তু জেমসের এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয়াতে মানুষের মনে আশংকা জন্ম নেয়। তারা ভাবতে থাকে প্রোটেস্ট্যান্ট মেরির বদলে দ্বিতীয় জেমসের পুত্র ক্যাথলিক হবেন তাদের শাসনকর্তা। ফলে তিনিও পিতার মতোই অত্যাচারী হয়ে উঠতে সময় নেবেন না। ইংরেজদের আমন্ত্রণে অরেঞ্জ পরিবারের উইলিয়ামের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসনকর্তাকে রাজি করানো যায়নি। ইংরেজরা মেরিকে রাণী হিসেবে সিংহাসন প্রদান করে উইলিয়ামকে সহচর রাজা হিসেবে ক্ষমতায় বসাতে রাজি হয়। উইলিয়াম স্ত্রীর সহচর রাজা হিসেবে ইংরেজ সিংহাসনকে অবহেলায় ফিরিয়ে দিলেন। পরে তাঁকে যুগ্ম রাজা

ঘোষণা করায় তিনি ইংল্যান্ডের সিংহাসন গ্রহণ করতে রাজি হন। ১৬৮৮ সালের নভেম্বর মাসে বিশাল বাহিনী নিয়ে ডেভনশায়ারের টোরে নামক স্থানে উপস্থিতি হন উইলিয়াম। বীরবিক্রমে উইলিয়ামের মতো একজন কুশলী যোদ্ধা ও জনপ্রিয় সেনানায়কের আগমনে দ্বিতীয় জেমসের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। তিনি উইলিয়ামকে বাধা দেয়ার সাহস হারিয়ে ফ্রান্সে পলায়ন করেন। এই সময় দ্বিতীয় জেমসের পদচ্যুতি 'রক্তপাতহীন বিপ্লব' বা 'গৌরবময় বিপ্লব' নামে পরিচিত। উইলিয়ামের সিংহাসন লাভের সাথে সাথে রাজার সর্বময় ক্ষমতার দর্শন ইংল্যান্ডের ইতিহাস থেকে আপাতত বিদায় নেয়। উইলিয়ামের সময় থেকে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট চাইলে যেকোনো ব্যক্তিকে সিংহাসন প্রদান করার অধিকার লাভ করে। ইংল্যান্ডের এই বিপ্লব ফরাসি বিদ্রোহীদের প্রভাবিত করে।

২. **আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ:** আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ফরাসি বিপ্লবকে নানা দিক থেকে প্রণোদনা যোগায়। বিশেষ করে আমেরিকায় ফ্রান্সের অনেকগুলো উপনিবেশ ছিলো। অন্যদিকে লাফায়েত (Lafayette) নামে একজন বিপ্লবী আমেরিকায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়ে দেশে ফিরে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। উপনিবেশের যুদ্ধে আমেরিকাকে সহায়তাকারী ফরাসি সৈন্যবাহিনী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সফল হয়ে দেশে ফিরে আসে। তাদের অনেকেই বেকার হয়ে গিয়েছিল। দেশে ফিরে তারা স্বৈরাচারী শাসকদের নানামুখী শোষন নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত হয়। যুদ্ধে পারদর্শী এই সকল বরখাস্ত সৈনিকদের উপর যখন অভিজাতশ্রেণি সাধারণ কৃষকদের মতো অত্যাচার চালাতে শুরু করে তখন তারা চুপ করে থাকেনি। লাঙল কোদাল দিয়ে নরম মাটি চাষ করা নিরীহ কৃষকদের মতো এদের হৃদয় সহনশীল ছিলো না। বলতে গেলে রাজতন্ত্রের প্রয়োজনে যুদ্ধকারী এসব সৈনিক অস্ত্র জমা দিলেও তাদের ট্রেনিং জমা দিতে হয়নি। ফলে শত্রুপক্ষের রক্তঝরিয়ে যুদ্ধজয়ী এসব সৈনিক সময় সুযোগ বুঝে নিজ দেশে প্রশাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দেয়। এই দিক থেকে বলতে গেলে ফরাসি বিপ্লবের একটি সফল পরিণতির বীজ প্রোথিত রয়েছে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে।

৩. **দুর্ভিক্ষ:**সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনিতে ফ্রান্সের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছিলো যেসব শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষ তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন একটি সময় সীমা ছাড়ায়। রাষ্ট্রের অসহনীয় কর, অভিজাতদের শোষণ নিপীড়নের সাথে যুক্ত হয় গির্জার বিশপদের ধর্মনির্ভর ষড়যন্ত্র। একটি সময় এসব সাধারণ মানুষের দিন পার হতে থাকে জীবন্মৃত অবস্থায়, পুরো দেশজুড়ে দেখা যায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের ফলে ফরাসিদের জীবনে দুঃখ দুর্দশার অন্ত ছিলো না। এই সময় মানুষ স্পষ্ট দেখতে পায় ফরাসি রাজতন্ত্র ও গির্জার ধর্মীয় ষড়যন্ত্রের সকল নিপীড়ন মুখ বুজে সহ্য করলে তাদের না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে। অন্যনিকে এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যদি মৃত্যুও আসে তা হবে অনেক শান্তির। পাশাপাশি আমেরিকার বিপ্লবীদের সাফল্য তাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জয়ের স্বপ্ন দেখায়। এদিক থেকে বলতে গেলে ১৭৮৮-৮৯ খ্রি. সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষ ফ্রান্সের মানুষকে শুধু যন্ত্রণাই দেয়নি পাশাপাশি বিদ্রোহী হয়ে উঠতে বাধ্য করেছে।

৪. **ধর্মীয় প্রভাব:**ক্যাথলিক মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি প্রতিবাদী ধর্মগুলোর প্রতি ভয়াবহ দমননীতি ছিলো ইউরোপের যেকোনো দেশের মতো ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে চার্চের মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্মীয় নীতি নির্ধারক ও বিশপরা রাজতন্ত্রকে সমর্থন দিয়ে গেছেন। অন্যদিকে রাজারাও নিজেদের প্রয়োজনে ধর্মকে কাজে লাগাতে পেরে ধন্য হয়ে চার্চ ও বিশপদের নানাভাবে সহায়তা করেছেন। মার্টিন লুথার, জন কেলভিন থেকে শুরু করে এমনি কিছু ধর্ম সংস্কারকের ভূমিকায় ক্যাথলিকবাদের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ে। চার্চ ও পোপের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সম্রাট থেকে শুরু করে গির্জা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মারাত্মকভাবে চড়াও হয় প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদে দীক্ষিত মানুষের উপর। ইনকুইজিশনের মতো বর্বর বিধান চাপিয়ে মানুষকে নির্যাতন এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হয়। এই অবস্থায় ধর্মের অধিকার আদায়ে স্বোচ্চার প্রতিবাদী মানুষ ফরাসি বিপ্লবের হাতিয়ারে পরিণত হতে সময় নেয়নি।

৫. **রাজবংশের ভূমিকা:** ফরাসি বিপ্লবের জন্য সেখানে শাসনরত বুরবোঁ রাজবংশকে সবার আগে দায়ী করতে হয়। ফ্রান্সের রাজাগন নিজেদের ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে মনে করতেন। চতুর্দশ লুইয়ের সময় ক্ষমতার অবস্থান এমন স্তরে উপনীত হয় যেখানে তিনি সরাসরি ঘোষণা দিয়ে বসেন 'আমিই রাষ্ট্র'। আর এই ঘোষণা থেকে ফরাসি রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছিলো। এই সময় থেকেই

ফরাসিদের পতন শুরু হয় কিন্তু তা বুঝতে অনেক সময় পায় হয়ে যায়। ফ্রান্স একাধারে নিজ দেশ ও পৃথিবীর নানা স্থানে স্থাপিত উপনিবেশগুলো থেকে বিদ্রোহে টালমাটাল অন্যদিকে শুরু হয়ে যায় রাজাকে অপসারণের আয়োজন। চতুর্দশ লুইয়ের সময় ফ্রান্সের রাজ্যসীমা সবথেকে বেশি বিস্তৃতি লাভ করলেও তখন থেকেই ফরাসিদের পতন শুরু হয়। বিশালায়তনে বর্ধিত এই রাষ্ট্রের জন্য যেমন সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিলো বুরবোঁ রাজাগণ সেক্ষেত্রে পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়েছিলেন।

পাঠ-২.৩ ফ্রান্সে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কারণ

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ শ্রেণি সংঘাত, শ্রমিক অসন্তোষ থেকে শুরু করে নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এই অবস্থায় কেবলমাত্র ফ্রান্সেই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। অন্য কোথাও না হয়ে ফ্রান্সে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার উপযুক্ত কারণ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা গেছে। ফিশার মনে করেন 'ফ্রান্সে উপরের শ্রেণির মানুষের অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধার বিপরীতে নিম্ন শ্রেণির সমস্যায় জর্জরিত হওয়ার ফলে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল'। ফ্রান্সের রাজশক্তি যদি সামন্ত প্রথার নিপীড়নমূলক নীতিগুলোর সংস্কার সাধন করে এর ত্রুটি দূর করতে সমর্থ হত, তবে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটার সম্ভাবনা কমে যেত। কিন্তু ফ্রান্সের রাজশক্তি সামন্তবাদ নিয়ন্ত্রণে তো আনেইনি, উপরন্তু তারাও সামন্ত প্রভুদের সাথে মিলেমিশে দেশের সাধারণ জনগণ, কৃষক ও শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল। জীবন বাঁচানোর দায়টা যেখানে বড়, সেখানে আর কোনো সহজ বিষয় কাজ করবে না। এই রকম একটি পরিস্থিতিতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ফরাসি জনগণ বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণি বিদ্রোহ ঘটায়। দুর্নিবার প্রতিরোধ গড়ে তুলে পতন ঘটায় দুর্ভাবনার বাস্তিল দুর্গের।

তবে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মোর্স স্টিফেন্স মনে করেন ইউরোপের অন্য দেশে না ঘটলেও ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটে যাওয়ার অন্যরকম কারণ ছিল। তিনি মনে করেন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা দার্শনিক কারণে ফরাসি বিপ্লব ঘটেনি। তাঁরা দৃষ্টিতে ফ্রান্সে তেজদীপ্ত বিপ্লবী সাহিত্য রচিত হয়েছিল প্রচুর, সেগুলো মানুষকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করে। এর থেকেই অনেকটা আশাবাদী হয়ে ওঠে নিপীড়িত মানুষ বিদ্রোহ করে। ঐতিহাসিক হার্নস মনে করেন বুর্জোয়া শ্রেণি সমাজের অসন্তোষের কথা জানতো। পক্ষান্তরে এই সব সাহিত্য পাঠ ও চর্চা করে তারা বুঝতে পারে খুব সহজেই ফরাসি রাজতন্ত্রের সমাধি রচনা করা সম্ভব। পক্ষান্তরে শ্রমিক ও জনতার অসন্তোষকে উস্কে দিতে পারলেই ক্ষমতার বদল ঘটবে। আর সে সময় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে জ্ঞানী বুর্জোয়ার পক্ষে অনেক সুযোগ আসবে। বিশেষ করে একটি সরকারের পতনের পর নতুন সরকার গঠনকালীন সময়ে বুর্জোয়াদের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। ঐতিহাসিক মদেলা মনে করেন , ফ্রান্সের রাজশক্তি সময়মত তার অভিজাতদের দমন করতে সক্ষম না হওয়ার পাশাপাশি তাদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা বন্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বিপ্লব আসন্ন হয়ে পড়েছিল। ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটার বিশেষ কিছু কারণ ছিল। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হল–

১. অর্থনৈতিক সংস্কারজনিত কারণে ফ্রান্স ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়েছিল। চরম অর্থনৈতিকস দুরাবস্থার মধ্যে মানুষের মনে ভর করে তীব্র হতাশা। এই সময় খুব সহজেই বলে দেয়া যায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রক্ষমতায় একটি বদল সময়ের দাবি। এখানে একটি বিপ্লব আসন্ন সে বিপ্লবে কারা জিততে যাচ্ছে তার থেকে বড় বিষয় হয়ে পড়ে জনমত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে জনগণের রায় চলমান রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধেই শুধু যায়নি তারা লিপ্ত হয়েছে এক দুর্ধর্ষ সংগ্রামে। এই সংগ্রাম ইউরোপের আর কোথাও না ঘটায় বিপ্লব ফ্রান্সেই সংঘটিত হয়।

২. বিপ্লবীদের সব থেকে বড় সাফল্য এ-যাবৎ অবহেলিত প্রান্তিক ও নিপীড়িত গোষ্ঠীর সমর্থন আদায় করা। বিশেষ করে শ্রমিকদের মনে বদ্ধমূল ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সীমাহীন দু:শাসন চালিযে ফ্রান্সের রাষ্ট্রক্ষমতা যেটাই তুলে ধরুক না কেনো এই শক্তিশালী রাজতন্ত্র আর তার দানবীয় অভিব্যক্তি তাদের প্রান্তিক করে দিয়েছে। মানুষের মনে বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে– এবারের প্রতিরোধ সংগ্রাম শুধু একটি আন্দোলনই নয়, এবার তাদের সামনে রাজতন্ত্রের অত্যাচার, লুণ্ঠন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সুযোগ এসেছে। তারা মনে করেছেন, বিপ্লবীরা বিজয়ী হলে প্রতিটি শ্রেণির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। র বিপ্লবীদের পক্ষে কাজ করে কয়েকজন দার্শনিক তার জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তিও মজবুত করে দিতে পেরেছিলেন। ফলে নৈতিক, জ্ঞানগত ও অবস্থানগত প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপ্লব ঘটানোর একটি প্রেক্ষাপট প্রস্তুত হয়ে যায় ফ্রান্সে যা ইউরোপের আর কোথাও হয়নি।

৩. ফরাসি বিপ্লবের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী চেয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আর নিম্ন শ্রেণী তাদের যন্ত্রণায় ভরা ক্ষুধা-দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি। পক্ষান্তরে ধনী শ্রেণী তাদের ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশে চেয়েছে। কিন্তু রাজা ও তাদের আজ্ঞাবহ নাইট এবং সামন্ত প্রভুদের নিষ্পেষণে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল বেশ কঠিন। ফলে ফ্রান্সের বিপ্লবপূর্ব পরিস্থিতিতে শ্রেণি সংঘাত উৎরে গিয়ে একটি প্রতিরোধের মত প্রেক্ষাপট প্রস্তুত হয়ে যায়। বিশেষ করে দীর্ঘদিনের শাসনে রাজাদের কীর্তিকলাপ জনগণের সামনে উপস্থিত থাকায় প্যারিস থেকে লিঁও প্রায় সবখানেই এক ধরনের রাজতন্ত্রবিরোধী মনোভাব বিরাজ করছিল। তারা ক্ষমতায় কে আসবে তার থেকে বেশি আগ্রহী হয়েছিলেন রাজতান্ত্রিক দস্যুবৃত্তির হাত থেকে মুক্তি ও একটি পরিবর্তনের জন্য। এক্ষেত্রে বিপ্লবীদের যৌক্তিত অবস্থান ও জনসংযোগের স্বার্থকতার পাশাপাশি জনমত তাদের পক্ষে কাজ করায় বিপ্লব ঘটানো অনেক সহজ হয়ে যায় তাদের পক্ষে। এই দিক

থেকে বিচার করতে গেলে ইউরোপের অন্য যেকোন স্থানের থেকে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটার সুযোগ ছিল সব থেকে বেশি।

৪.রাজতান্ত্রিক শাসনামলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ছন্দপতন ঘটেছে তার তাদের দুরদর্শিতার অভাবের কারণেই হয়েছিল। ফলে ফরাসি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনরোষ এবং বিপ্লবীরা সংশ্লিষ্ট যে মিথগুলোর জন্ম দিয়েছিল, সেগুলোকেও বাস্তব প্রমাণ করে দেয়। তাদের বিশ্লেষণে ছিল প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সঞ্চয়, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বেসরকারি বিনিয়োগ থেকে শুরু করে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মতো বিষয়। এ ধরনের কয়েকটি প্রকল্প সরাসরি মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় জনগণ রাজতন্ত্রের প্রতি বিষিয়ে ওঠেন এবং বিপ্লবীদের পক্ষে প্রবল শক্তিশালী অবস্থান তৈরি হয়ে যায়।

৫. ফরাসি রাজাদের স্বেচ্ছাচারী আচরণ সাধারণ মানুষের কাছে অসহ্য হয়ে যায়। এর বিপরীতে বিপ্লবীদের জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার আশ্বাস প্রদান এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় দাবি সকলের কাছে অনেক বেশি জোরালো ও যুগোপযোগী হওয়ায় তার গ্রহণযোগ্যতাও বেড়ে যায়। অন্যদিকে উপযুক্ত প্রচারণায় বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে তাদের উদ্যোগের সংবাদ নিয়ে পৌঁছে যাওয়াটাও ছিল অনেক বড় একটি বিষয়। বিপ্লবীরা অনেক দিন আগে থেকেই অবহেলিত মানুষকে সাথে নিয়ে সংগ্রামের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। অন্যদিকে ফ্রান্সের লিঁও কিংবা প্যারিস থেকে প্রচারিত রাজতন্ত্রের স্তুতিকে মানুষ নিছক রাজতন্ত্রের পক্ষে দালালি এবং অন্তঃসারশূন্য প্রচারণা হিসেবে বিবেচনা করেছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে বিপ্লবীদেরই জয় হয়েছে। শক্তিশালী ফরাসি রাজতন্ত্র জনতার প্রতিরোধে স্রোতের মুখে পড়া দুর্বল বালির বাঁধের মত ধ্বসে গেছে।

৬. সীমাহীন ক্ষমতা নিয়ে দেশ শাসনে বুরবোঁ রাজাদের নানা অপকর্ম ফরাসিদের বিক্ষোভে ফেটে পড়তে বাধ্য করে। ১৮ শতকের ইউরোপে অন্য দেশের রাজতন্ত্র যেখানে আস্তে আস্তে মানুষের জন্য কল্যাণকামী হয়ে উঠছে ঠিক তখন বুরবোঁদের স্বেচ্ছাচারীতা সীমা ছাড়িয়েছিলো। এর ফলে ফ্রান্সের মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ফলে সেখানেই বিপ্লব ঘটেছিল।

৭. ফ্রান্সে বিদ্যমান ৪০ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজা কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দিয়ে নানামুখী প্রভাব খাটালেও মূল ক্ষমতা ছিল স্থানীয় সরকারের প্রশাসকদের হাতে। এই সমস্ত স্থানীয় সরকারের প্রধান ইনটেনডেন্ট ও তার কর্মচারীরা জনগণের উপর নানামুখী অত্যাচার চালাতো। অন্যদিকে প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণের দীর্ঘসূত্রিতা, অনিয়ম ও বেআইনি কার্যকলাপের আধিক্য থেকে শুরু করে নানা অনাচার দেখা দেয়। এই অনাচারে অতিষ্ঠ ফ্রান্সের মানুষ বিপ্লব ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল।

৮. ১৮ শতকে এসেও মধ্যযুগীয় বর্বর সামন্তপ্রথা ফ্রান্স থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়নি। সামন্তপ্রভুদের নারকীয় অত্যাচার নির্যাতন আর অনৈতিক কর্মকাণ্ড মানুষকে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এক মানবেতর অবস্থানে এনে দাঁড় করায়। সময়ের দাবি মেটাতে তাদের সামনে বিপ্লবী হয়ে ওঠা বাদে দাবি আদায়ের আর কোনো বিকল্প পথ ছিলো না। তাই ইউরোপের অন্যদেশে না ঘটে বিপ্লব ফ্রান্সেই ঘটেছিল।

৯. ফ্রান্স এমন একটি দেশে পরিণত হয়েছিল যেখানে ক্ষমতার বিভিন্নতায় একই আইন প্রায়োগিক দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক লাভ করেছিলো। আইন প্রয়োগের এই অসম অবস্থান প্রশাসনযন্ত্রকে নিয়মতান্ত্রিক ষণ্ডাতন্ত্রের রূপ দিয়েছিলো। বিশেষ করে রোমান আইনে পরিচালিত দক্ষিণ ফ্রান্সের সাথে উত্তর ও মধ্য ফ্রান্সের আইনের পার্থক্য থাকায় অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীরা স্থান বদল করতো। এভাবে দোষী ব্যক্তিরা খুব সহজেই উপযুক্ত শাস্তি থেকে বেঁচে যেতো। অন্যদিকে প্রচলিত কঠোর আইনে মামুলি অপরাধেও মানুষের অঙ্গচ্ছেদ করার পর্যন্ত বিধান রাখা হয়েছিলো। এভাবে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষ একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন চেয়েছিল।

১০. ১৮৫৫ সালে সাক্ষরিত গুরুত্বপূর্ণ অগসবার্গের সন্ধির পর রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম এমন নীতি প্রতিষ্ঠা পায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রজাদের বাধ্যতামূলক ক্যাথলিক কিংবা প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতে দীক্ষিত করা হয়। ধর্ম বিশ্বাস যার যার আর দেশটা সবার এমন ধারণা তখনো প্রতিষ্ঠা পায়নি। মানুষ তার চিন্তাজাগতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলো। বারংবার সংস্কার, পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টধর্ম ততোদিনে একটি নতুন রূপ লাভ করেছে। কিংবা ক্যাথলিকদের অত্যাচারের অতিষ্ট অনেক প্রজা চাইছে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদে দীক্ষিত হবে। এক্ষেত্রে উভয় চিন্তার মানুষের উপরেই নেমে আসে বিভীষিকাময় নির্যাতনের ঘটনাগুলো। তখন দেখা গেছে তাদের সামনে বিদ্রোহ ছাড়া অন্যকোন পথ খোলা নেই।

১১. অর্থনৈতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে একটি কারণ ছিল ফ্রান্সের কর সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার খাতটি। অযৌক্তিক, বিভ্রান্তিকর ও ত্রুটিপূর্ণ এই ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণি বলতে গেলে ফ্রান্সের বেশিরভাগ ভূমি তাদের দখলে রেখেও করের

আওতার বাইরে থেকে যায়। তারা করের বাইরে থাকায় রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত অর্থের যোগান নিশ্চিত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। এই ত্রুটিপূর্ণ কর পদ্ধতির কারণে রাজকর্মচারী ও জমিদার এমনকি চার্চের রক্ষীদের হাতে পর্যন্ত নির্যাতিত হতো অসহায় কৃষক। আর এই নির্যাতিত জনগোষ্ঠীই পরবর্তীকালে ফরাসি বিপ্লবের মূল হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিলো যা স্পষ্টতই বোঝা যায়।

১২. চতুর্দশ লুই অযৌক্তিকভাবে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এই যুদ্ধগুলোর ফলে ফরাসি রাজকোষ প্রায় শূন্যের কোটায় গিয়ে দাঁড়ায়। তিনি তাঁর পরবর্তী রাজা পঞ্চদশ লুইকে অর্থনৈতিক সংস্কারে মনোযোগী হতে নির্দেশ দিলেও তিনি তার কথার পরোয়া করেননি। পঞ্চদশ লুই অনিয়ন্ত্রিত বিলাস-ব্যাসনের পাশাপাশি আরো কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ফরাসি রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়।

১৩. ডেভিড থমসন দেখিয়েছেন প্রায় ৬৫ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি ঘটলেও সেই অনুপাতে মানুষের আয় একদম বাড়েনি যা ফরাসি বিপ্লবের আগমণ ত্বরান্বিত করে। ফ্রান্সের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য রুটির মূল্য শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়াতে সাধারণ শ্রমিক ও চাকুরীজীবীদের পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্ধাহার, অনাহার ও আর রুটিদাঙ্গা হয়ে ওঠে তখনকার ফ্রান্সের নিত্য নৈমিত্যিক ব্যাপার। ফলে মানুষের সামনে প্রবল বিদ্রোহের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের পতন ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না।

১৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি ১৭৮৮ সালের ফ্রান্সে ভয়াবহ খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে। জীবন বাঁচানোর জন্য হাজার-হাজার বুভুক্ষু মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে পাড়ি দেয় এবং প্যারিসে এসে সমবেত হতে থাকে। ক্ষুধার্ত মানুষ শহরে এসে বাকিদের বিলাস ব্যসনের জীবন দেখে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তারা এখানে এসে একইসাথে দেখতে পায় নিজেদের দৈন্য আর তাদেরই হাতে উৎপাদিত ফসলে শহুরেদের অযৌক্তিক বিলাসিতা। তখন বেশিরভাগ ফরাসি গ্রামবাসী প্রতিবাধ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাজকর্মচারীরা তাদের দমন করার চেষ্টা করলে সাধারণ বিদ্রোহ রূপ নেয় রাজতন্ত্রবিরোধী এক স্বশস্ত্র সংগ্রামে।

পাঠ-২.৪ ফরাসি বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

রাজতন্ত্রের অত্যাচারের মুখে প্রতিবাদী জনগণ যখন ফুঁসে ওঠে ঠিক তখনি তাদের সাথে যোগ দেয় বুর্জোয়া শ্রেণি বা নতুন ধনিক শ্রেণি। আরেকটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় ফরাসি বিপ্লবের ভিত্তি রচনা করে দেয় অধিকারবঞ্চিত বুর্জোয়া শ্রেণি। তাদের সক্রিয় কর্মকাণ্ডে অনেক বেগবান হয় আন্দোলন। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রচার ও প্রণোদনায় একসময় সাধারণ জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে বিদ্রোহ সর্বাত্মক রূপ নিয়ে সূচনা হয় ফরাসি বিপ্লবের। বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করলে ফরাসি বিপ্লবকে তিনটি ধাপে আলোচনা করা যেতে পারে। কালপরিসর বিবেচনায় প্রথমত উন্মেষ পর্ব, সক্রিয়করণ পর্ব, পরিণতি পর্ব এই তিনটি ধাপে ফরাসি বিপ্লবকে আলোচনা করা যেতে পারে। নিচে একটি সারণিতে সময়কাল অনুযায়ী ফরাসি বিপ্লবের ঘটনাগুলো তুলে ধরা হল–

সময়কাল অনুযায়ী ফরাসি বিপ্লব

প্রথম ধাপ: সমগ্র ফ্রান্সজুড়ে কৃষিকাজে মন্দাভাব। খাদ্য ও এবং আবাসন সংকটের কারণে কৃষকরা দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে পড়ে। জীবন বাঁচানোর তাগিদেই তারা বিভিন্ন স্থানে ফরাসি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।	
জুন-জুলাই ১৭৮৮:	গ্রেনোবেল এর বিদ্রোহ
৮ আগস্ট ১৭৮৮:	বিভিন্ন জনের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে জানতে জাক ন্যাকারের কথামত রাজা স্ট্রেটস-জেনারেল এর সভা অহবান করেন।
৫ মে ১৭৮৯:	ভার্সিলিস এ স্ট্রেটস জেনারেলের সভা শুরু।
১৭ জুন ১৭৮৯:	নতুন সংবিধান প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলন শুরু।
২৩ জুন ১৭৮৯:	রাজা টায়ারের রেজুলেশন বাতিল ঘোষণা করেন।
৯ জুলাই ১৭৮৯:	ফরাসি সংসদ থেকে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয়।
১২ জুলাই ১৭৮৯:	ন্যাকারের পদচ্যুতি, সেই সাথে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ মিলে অস্ত্রধারণ করে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে।
১৪ জুলাই ১৭৮৯:	সশস্ত্র জনতা তীব্র-আক্রমণ করে বাস্তিল দুর্গের দখল নিয়ে নেয়।
১৫ জুলাই ১৭৮৯:	ন্যাশনাল গার্ডের সর্বাধিনায়ক হিসেবে লাফায়েত এর নিয়োগ।
১৭ জুলাই ১৭৮৯:	ফ্রান্স জুড়ে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হলে সর্বত্র তীব্র ভীতির সঞ্চার হয়।
৫-১১ আগস্ট১৭৮৯:	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ডেকে ফ্রান্সের সামন্তপ্রথা বাতিল করা হয়।
২৬ আগস্ট১৭৮৯:	মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি থেকে বিশেষ আইন পাশ করা হয়।
৫ অক্টোবর ১৭৮৯:	নারীদের একটি প্রতিনিধি দল রাজার সাথে সাক্ষাত করে তাদের উপযুক্ত অন্ন সংস্থানের পাশাপাশি ন্যায্য অধিকার দাবি করে।
৬ অক্টোবর ১৭৮৯:	রাজার প্যারিস প্রত্যাবর্তন।
২ নভেম্বর ১৭৮৯:	চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ নিয়ে গণপরিষদে বিশেষ আইন পাস হয়।
১৬ ডিসেম্বর ১৭৮৯:	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে কিছু জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
২৮ জানুয়ারি ১৭৯০:	ইহুদিদের বিরুদ্ধে আনীত সামাজিক অপরাধের অভিযোগ প্রত্যাহার।
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৭৯০:	ধর্মীয় ক্ষেত্রে নানাবিধ বাড়াবাড়ির শুরু।
১৯ জুন ১৭৯০:	অভিজাত শ্রেণির পদমর্যাদায় বিলোপ সাধন।
১৪ জুলাই ১৭৯০:	ষোড়শ লুইয়ের ভূমিকায় রাজা ও চার্চের অবস্থানগত সাম্যাবস্থা অর্জন।
১৮ আগস্ট১৭৯০:	বিপ্লব প্রতিরোধে বিশেষ অ্যাসেম্বলি সভা আহবান।
৩০ জানুয়ারি ১৭৯১:	ফরাসি অ্যাসেম্বলির সদস্য হিসেবে মিরাবুঁর নির্বাচন।
২ মার্চ ১৭৯১:	রাজকীয় গিল্ড ও নিয়ন্ত্রণাধীন একচেটিয়া বাজারের দাপট হ্রাস।
১৫ মে ১৭৯১:	ফরাসি উপনিবেশগুলোতে কালো মানুষের সম-অধিকার অর্জন।

২১ জুন ১৭৯১:	উপয়ান্তর না দেখে প্যারিসে থাকতে বাধ্য হন রাজা ষোড়শ লুই।
১৫ জুলাই ১৭৯১:	অ্যাসেম্বলির বিশেষ ঘোষণায় রাজাকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করে।
১৭ জুলাই ১৭৯১:	রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের উপর সরকারি বাহিনীর গুলিবর্ষণ।
১৩ সেপ্টেম্বর ১৭৯১:	রাজার সংবিধানকে বৈধতা দান।
৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৯১:	গণপরিষদের সভা অনুষ্ঠিত।
১ অক্টোবর ১৭৯১:	বিশেষ সরকারি আদেশ জারি।
৯ নভেম্বর ১৭৯১:	বিয়ের পাশাপাশি বিচ্ছেদ বিষয়ে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয় সেখানে সাংসারিক জীবনের উপরেও রাজ্য ও রাজার হস্তক্ষেপের সুযোগ রাখা হয়।
১১ নভেম্বর ১৭৯১:	অ্যাসেম্বলির কাজে রাজার ভেটো দান।
জানুয়ারি মার্চ ১৭৯১:	প্যারিসের আশেপাশে খাদ্য নিয়ে দাঙ্গা শুরু।
৯ সেপ্টেম্বর ১৭৯১:	এমিগ্রের সম্পত্তির চারপাশে প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ।
২০ এপ্রিল ১৭৯২:	ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও ফরাসি বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে থাকে।
২০ জুন ১৭৯২:	অ্যাসেম্বলিতে বিশেষ ক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি জ্যাকোবিনরা রাজার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে।
২৫ জুলাই ১৭৯২:	ডিউক ব্রাঞ্চউউক ফ্রান্সের আক্রমণ সামনে রেখে বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারি করেন।
১০ আগস্ট ১৭৯২:	শক্তি বৃদ্ধির এক পর্যায়ে জ্যাকোবিনরা অস্ত্রধারণ করে অনেক সুইস গার্ডকে হত্যা করে এবং রাজাকে বন্দি করে।
১৯ আগস্ট ১৭৯২:	লাফায়েত অস্ট্রিয়ায় পালিয়ে যান।
২২ আগস্ট ১৭৯২:	ভেন্দেই ও ব্রিটানিতে অভিজাতদের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। পাশাপাশি ল্যাংওয়ে ও ভের্দুন আক্রান্ত হলে সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় ধাপ: বুর্জোয়া এবং অভিজাতদের ক্রমাগত দ্বন্দ্বের সেই রীতি অনেকটা পাল্টে যায়। এই সময় বুর্জোয়াদের সাথে অধিকার আদায় নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধে প্রলেটারিয়েটদের। ধীরে ধীরে এই সংঘাত ফ্রান্স থেকে ছড়িয়ে পড়ে পুরো ইউরোপের নানা স্থান জুড়ে।

১ সেপ্টেম্বর ১৭৯২:	জনগণের সরকারবিরোধী বিক্ষোভ।
২ সেপ্টেম্বর ১৭৯২:	প্যারিসের কারাগারে আটক প্রায় ১২০০ অভিজাতকে এই সময় হত্যা করা হয়।
২০ সেপ্টেম্বর ১৭৯২:	সেনাবাহিনীতে দ্বন্দ্ব শুরু হলে বিপ্লবীদের পক্ষে বিক্ষোভ জমিয়ে তোলা অনেক সহজ হয়ে যায়।
২১ সেপ্টেম্বর ১৭৯২:	দেশের আইন সংহিতা পরিবর্তন করে রাজার মত রাজনীতিতে পোপের হস্তক্ষেপের সুযোগও পুরোপুরি রোহিত করা হয়।
১৯ নভেম্বর ১৭৯২:	এডিক্ট অপ ফ্রেটার্নিটির অধীনে দুস্থদের সাহায্য প্রদানের আশ্বাস।
১১ ডিসেম্বর ১৭৯২:	রাজার বিচার শুরু।
২১ জানুয়ারি ১৭৯৩:	ষোড়শ লুইয়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর।
১ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৩:	ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণা।
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৩:	প্যারিসের রাস্তায় খাদ্য নিয়ে দাঙ্গা শুরু।
৬ এপ্রিল ১৭৯৩:	জননিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষ কমিটি পত্তন।
২৪ এপ্রিল ১৭৯৩:	সেপ্টেম্বরের গণহত্যার জন্য মারাতের বিচার শুরু।
৪ মে ১৭৯৩:	রুটির দাম সর্বোচ্চ অবস্থানে উন্নীত।

২৭ মে ১৭৯৩:	প্যারি কমিউনের বিরুদ্ধে জনরোষ তুঙ্গে ওঠে।
২ জুন ১৭৯৩:	প্যারি কমিউন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।
২৪ জুন ১৭৯৩:	পার্লামেন্টের সম্মেলনে জ্যাকবিনদের সংবিধান সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
১৩ জুলাই ১৭৯৩:	ক্যারোলেট কর্ডে জনগণের বন্ধু মারাতকে হত্যা করে।
১৭ জুলাই ১৭৯৩:	জনরোষ থামাতে ক্যারোলেটের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর।
১ আগস্ট১৭৯৩:	মাপজোকের ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতি গৃহীত হয়।
২৩ আগস্ট১৭৯৩:	বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংকট চূড়ান্ত আকার ধারণ করে।
৪-৫ সেপ্টেম্বর ১৭৯৩:	প্যারিসের রাস্তায় দাঙ্গা শুরু।
১৭ সেপ্টেম্বর ১৭৯৩:	সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার নিপীড়ন শুরু হলে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।
১৪ অক্টোবর ১৭৯৩:	বিচারের মধ্য দিয়ে মেরি এন্টয়নিয়েট এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর।
২৩ অক্টোবর ১৭৯৩:	রিপাবলিকান ক্যালেন্ডার গৃহীত।
২৪ অক্টোবর ১৭৯৩:	২২ জন গিরনডিস্টকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর।
১০ নভেম্বর ১৭৯৩:	দু:শাসনে পুরো ফ্রান্সে অসহনীয় অবস্থা বিরাজ করছিল।
২৪ মার্চ ১৭৯৪:	ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্বের হোতা রোবেসপিয়ের অনেক বেশি শক্তিমত্তার অধিকারী হয়ে অনেকটাই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রচলন করে।
১৮ মে ১৭৯৪:	ধর্মীয় রীতি নীতিতেও রোবেসপিয়ারের অনৈতিক হস্তক্ষেপ।
৮ জুন ১৭৯৪:	শাসকের সর্বময় ক্ষমতাধর হিসেবে অভিষেক।
১০ জুন ১৭৯৪:	প্রায় ২৭৫০ জন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ব্যক্তিকে বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করে গিলোটিনের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। অনেক অভিজাত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিও অরাজকতার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে গিয়ে গিলোটিনের শিকার হন।
২৭ জুলাই ১৭৯৪:	ক্রমশ স্বৈরশাসক হয়ে ওঠা রোবেসপিয়ারের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। পালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ রোবেসপিয়ারকে তার অপরাধের শাস্তি হিসেবে প্রায় ১৫০ জন সঙ্গীসহ মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।
তৃতীয় ধাপ: রুটির দামের নির্ধারিত মূল্য উঠিয়ে নেয়ায় বিক্ষোভ শুরু হয়। প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন দলের হাতে বিপ্লবীরা প্রচণ্ড মার খায়। বিভিন্ন স্থানে আক্রমণের শিকার বিপ্লবীরা এই সময় দিশেহারা হয়ে পড়ে।	
১২ নভেম্বর ১৭৯৪:	গণপরিষদের বিশেষ আইন জারির মধ্য দিয়ে বিপদের মুখে পড়ে জ্যাকোবিনরা।
১ জানুয়ারি ১৭৯৫:	খ্রিস্টানদের ধর্মীয় আরাধনার জন্য চার্চ নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।
মে - জুন ১৭৯৫:	দক্ষিণে শুরু হয় শ্বেত সন্ত্রাস।
৮ জুন ১৭৯৫:	জেলহাজতে ডাফিনের মৃত্যু হয়। কোঁৎ দ্য প্রোভেন্সি অষ্টাদশ লুই এর খেতাব লাভ করে।
২২ আগস্ট১৭৯৫:	তিন বছরের বিশেষ সংবিধান চালু করে ডাইরেক্টরির পত্তন।
৫ অক্টোবর ১৭৯৫:	সরকার পরিবর্তন নিয়ে অভিজাতরা নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে যার সুযোগ গ্রহণ করেন নেপোলিয়ন।.
২৬ অক্টোবর ১৭৯৫:	সংবিধান স্থগিত করে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন জারি করা হয়।
২ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৬:	ইতালিতে ফরাসি বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ হিসেবে নেপোলিয়নের সাফল্যলাভ।
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৬:	ডিরেক্টরগণ প্যানথিয়নের জনসভা নিষিদ্ধ করে দেয়।
১০ মে ১৭৯৬:	অনেক রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
৭ সেপ্টেম্বর ১৭৯৬:	বাবিউফের প্রায় শতাধিক সমর্থক ডিরেক্টরদের প্রাসাদ আক্রমণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়।
২৭মে ১৭৯৭:	দোষী সাব্যস্ত হয়েও অনেক বাবিউফ সমর্থক প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়।

মে ১৭৯৭:	১৭৯৮-৯৯ সালের নির্বাচন ডিরেক্টরদের আরো অসহনীয় করে তোলে।
১৮ জুন ১৭৯৯:	ডাইরেক্টরির পতন।
৯ নভেম্বর ১৭৯৯:	কনসাল জেনারেলের সভা আহবান করে ফ্রান্সের ক্ষমতা নিয়ে নেন নেপোলিয়ন।
২ ডিসেম্বর ১৮০৪:	নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন।

সারাংশ

সামন্ত্রতান্তিক ফ্রান্সের নতুন ধনিক শ্রেণি বা বুর্জোয়াদের ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত ছিল। ফলে তারা পেছন থেকে ফরাসি বিপ্লবের নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসে। এই সময় অর্থনৈতিক দৈন্য থেকে শুরু করে নানা কারণে জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল ফ্রান্সের দরিদ্র শ্রেণি। এই ধরনের একটি প্রেক্ষাপট বিপ্লব অনিবার্য করে তোলে যারা শুরুটা হয় সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। দরিদ্রশ্রেণির এই সংগ্রাম ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে 'সাঁকুলেৎ' বা দরিদ্র শ্রেণির সর্বাত্মক সংগ্রাম নামে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শুধু ফ্রান্সের রাষ্ট্রক্ষমতায় পরিবর্তন এসেছে এমনটি নয়। বরং পুরো ইউরোপের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এসেছে অন্যরকম এক জোয়ার, বদলে গিয়েছিল রাজনীতির গতি প্রকৃতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ভার্সাই সন্ধি ও লিগ অব নেশনস

ইউনিট ৩

ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পেছনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণসমূহ জড়িত ছিল। ফলে ১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দের হত্যাকাণ্ডকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এক এবং একমাত্র কারণ ভাবার কোনো সুযোগ নেই। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, অর্থনৈতিক স্বার্থ, সংস্কৃতিগত দৈন্য ও উৎকর্ষতার বিপরীতে আরো কিছু গৌণ কারণ এ যুদ্ধকে প্রণোদিত করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পেন্ডুলামের মত দুলতে থাকা রাজক্ষমতার দেশগুলোতে দৃষ্টি দিয়ে অনেক রাষ্ট্রচিন্তাবিদই তৎকালীন ইউরোপের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিলেন যার পর নাই হতাশ। বিশেষ করে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার পাশাপাশি একে অন্যের উপর অহেতুক চড়াও হওয়ার মানসিকতা নিয়ে চেষ্টা চলছিল একের পর এক জোট গঠনের প্রচেষ্টা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের এই প্রবণতা তাদের কতটুকু লাভবান করেছিল তা নিয়ে হয়ত নিশ্চিত করে কিছু বলার সুযোগ নেই। তবে এতে করে পুরো ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবেশ যে অশান্ত হয়ে উঠেছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

পাঠ- ৩.১ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্ব

পাঠ- ৩.২ অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সামরিক শক্তি

পাঠ- ৩.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ

পাঠ- ৩.৪ বিভিন্ন রণক্ষেত্রের সংঘাত

পাঠ- ৩.৫ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

পাঠ- ৩.৬ ভার্সাই সন্ধিচুক্তি

পাঠ- ৩.৭ লিগ অব নেশনস ও তার ব্যর্থতা

পাঠ-৩.১ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্ব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর নানা কারণ রয়েছে। তবে যুদ্ধের একেবারে শুরুর গল্পটাকে সাজানো যেতে পারে সরাসরি সারায়েভো হত্যাকাণ্ড থেকেই। বসনিয়ার জাতীয়তাবাদী গ্রুপ ব্ল্যাক হ্যান্ড এক্ষেত্রে তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে উগ্রপন্থা অবলম্বনে বাধ্য হয়। তারা অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দ ও কাউন্টেস সোফিয়াকে হত্যা করে। সারায়েভো হত্যাকাণ্ডের দায়টা তারপরেও পুরোপুরি জাতীয়তাবাদীদের উপর বর্তায় না। বিশেষ করে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা একটি দুর্বল রাষ্ট্র ছিল। তারা ইউরোপের রাজনৈতিক পরিসরে তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা কোনোদিনই রাখতে পারেনি। এই সুযোগ নিয়ে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের অহেতুক সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশা পেয়ে বসে। তারা ১৮৭৪ সালে এসে দখল করে নেয় বসনিয়া-হার্জেগোভিনার ভূখণ্ড। এরপর ১৯০৮ সালে এই ভূখণ্ড একীভূত করা হয়।

বসনিয়ায় বসবাসরত মুসলিম সম্প্রদায় থেকে শুরু করে সেখানকার সার্বরাও এ দখলদারিত্ব মেনে নিতে পারেনি। তারা অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সাথে না থেকে সরাসরি সার্বিয়া কিংবা অন্য কোনো স্লাভ ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত হতেই বেশি আগ্রহী ছিল। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের পরিণতি ঘটায় তারা ১৯১৪ সালের ২৮ জুন অস্ট্রীয় যুবরাজ হত্যার মধ্যদিয়ে। সম্রাট ফ্রাঞ্জ জোসেফের অনুজ ফার্দিনান্দ ছিলেন আর্চ ডিউক কার্ল লুডিগের ছেলে। একটি ভোজসভায় ১৮৯৫ সালের দিকে কাউন্টেস সোফিয়ার সাথে সাক্ষাতের সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত প্রেম গড়িয়ে শুভ পরিণয়। তবে ফার্দিনান্দের প্রথম দিকের বৈবাহিক জীবন অতটা সুখের হয়নি।

আর্চডিউক ফ্রেডরিখের স্ত্রী এলিজাবেথের লেডি ইন ওয়েটিং সোফিয়ার সাথে ফার্দিনান্দের এই সম্পর্ককে ফ্রেডরিখ প্রথম প্রথম আঁচ করতে পারেননি। তিনি যখন বুঝতে পারেন তখন একে যেকোনো মূল্যে আটকাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এতে করে আর্চডিউক কন্যা মারিয়া ক্রিস্টিনের পর্যন্ত কপাল পোড়ে। অন্যদিকে সোফিয়া রাজপরিবারের কেউ না হওয়াতে তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে ঘোর আপত্তি জানান ফ্রাঞ্জ জোসেফ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস, জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেম ও ১৩ তম পোপ লিও ফার্দিনান্দের পক্ষাবলম্বন করে রাজার কাছে সুপারিশ করেন। এতে বরফ গললেও শেষ রক্ষায় হয়নি ফার্দিনান্দের। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৭ জন অনভিজ্ঞ বন্দুকধারী আততায়ীর সামনেই তাঁকে সস্ত্রীক জীবন দিতে হয়েছিল।

অস্ট্রো-হাঙ্গেরির রাজ পরিবার অবৈধভাবে দখল করেছিল বসনিয়ার ভূখণ্ড। সেখানে বসবাসরত মুসলমানদের অনেককে গণহত্যার শিকার হতে হয় হাঙ্গেরীয় হানাদার বাহিনীর হাতে। পাশাপাশি সেখানে বসবাসরত সার্ব-ক্রোয়াটরাও রেহাই পায়নি এ নির্মম হত্যাযজ্ঞ থেকে। তারপর যারা হাঙ্গেরির বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয় তাদের উপর সীমাহীন জুলুম-নিপীড়ন চলতে থাকে। অনেকে শুধুমাত্র স্বাধীন বসনিয়া আন্দোলনের সাথে জড়িত অনেকের শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে যায়। এমনি এক তরুণের নাম প্রিন্সিপ যে কৈশোরেই জীবনের স্বপ্ন মুছে যাওয়ায় বাধ্য হয় প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্পে। আর তার হাতেই প্রাণ যায় ফার্দিনান্দ ও সোফিয়ার। এর পাশাপাশি নেদেলজাকো ক্যাবরিনোভিস কিংবা ড্যানিলো আইলিচও জীবনের নানা ক্ষেত্রে হাঙ্গেরির দখলদারিত্বের যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। জীবনের নানা ক্ষেত্রে বলতে গেলে সর্বস্ব খুইয়ে তারা বাধ্য হয়েছিলেন সরাসরি ফার্দিনান্দকে নির্বংশ করে বসনিয়ার উপর থেকে হাঙ্গেরির অশুভ ছায়া দূর করতে। প্রথম কয়েকজন পরিকল্পনাকারী পরপর ব্যর্থ হলেও কিশোর প্রিন্সিপ তিনটি গুলিতে হত্যা করে ফার্দিনান্দ-সোফিয়াকে।

নেহাত ক্রোধ ও প্রতিশোধস্পৃহা থেকে হত্যাযজ্ঞে অংশগ্রহণকারীরা মরতে গিয়েও পারেনি। তাদের কেউ কেউ গুলি চালাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়, কেউবা সায়ানাইড পিল খেয়েও অদ্ভুতভাবে বেঁচে যায়। আর শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তে হয় হাঙ্গেরিয়ান বাহিনীর হাতেই। কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে যক্ষ্মা আক্রান্ত হয়ে পচে মরার আগে তাদের কপালে রিমান্ডের যে নির্যাতন জোটে তাতেই ফাঁস হয় এ হত্যাকাণ্ডের। হাঙ্গেরি দাবি করে সার্বিয়া এই হত্যাকাণ্ডকে প্রণোদিত করেছে। আর এর সূত্র ধরেই তারা নানাবিধ চাপ প্রয়োগ করতে থাকে সার্বিয়ার উপরে। বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলে সার্বিয়াকে। কিন্তু প্রথম থেকেই অবিচল সার্বিয়া এতে টলতে রাজি ছিল না। হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীদের জবানবন্দি থেকে নিশ্চিত করা হয় যে এর নীলনকশা সাজানো হয়েছিল বেলগ্রেডে। সার্বিও জাতীয়তাবাদী গ্রুপ নারোদনা ওদব্রানার প্রণোদনাতেই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এত সহজে সংগঠিত হয়ে এ হত্যাকাণ্ড ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। এমন দাবি করে সার্বিয়ার উপর আক্রমণের চিন্তা করে হাঙ্গেরির বাহিনী।

পাঠ-৩.২ অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সামরিক শক্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেভাবেই শুরু হোক না কেনো যুদ্ধবাজ দেশগুলোর উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। বিভিন্ন স্থানে স্ব আধিপত্য নিশ্চিত করার জন্য তারা এই যুদ্ধ বাধিয়েছিল। অস্ট্রো-হাঙ্গেরির ফার্দিনান্দ কিংবা সোফিয়ার হত্যাকাণ্ড থেকে বড় বিষয় তাদের একটা আক্রমণের কারণ প্রয়োজন ছিল। আর সেটা পাওয়ার সাথে সাথে পরস্পর বিবাদে জড়াতে তাদের সময় লাগেনি। একত্রীভূত ইতালি কিংবা জার্মানির হোহেনজোলার্নদের একক দাপট মেনে নেয়া তাদের জন্য অনেকটাই অসম্ভব হয়ে দেখা দেয়। যুদ্ধে অক্ষশক্তি কিংবা মিত্রশক্তি যাদের কথাই বলা হোক না কেনো কেউ শক্তিমত্তার দিক থেকে পিছিয়ে থাকার পাত্র নয়। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মান, ইতালি, কানাডা, ফরাসি, তুরস্ক, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি, সার্বিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, গ্রিক কেউই শক্তিমত্তা প্রদর্শনের দিক থেকে পিছিয়ে থাকতে চায়নি। আর এর ফলাফল হিসেবেই দীর্ঘ চার বছর স্থায়ী হয়েছিল এ মরণঘাতী সংগ্রাম।

ব্রিটেন

ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর পাশাপাশি তাদের বিমান ও সেনাবাহিনীও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তবে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর তুলনায় তাদের নৌবাহিনী ছিল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। যুক্তরাষ্ট্রের মত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জনশক্তিও সময়ের সাথে সাথে বেড়ে বিশাল আকার ধারণ করে। ১৯১৪ সালে মাত্র ২ লাখ ৪৭ হাজার ৪৩২ জন সৈন্য ব্রিটিশ সৈন্যের প্রতিনিধিত্ব করলেও ১৯১৬ সাল নাগাদ এই সৈন্য সংখ্যা বেড়ে গিয়ে হয় ২৬ লাখের কাছাকাছি। যার প্রায় ১৬ লাখ সৈন্য হতাহত হওয়ার ঘটনা থেকেই বোঝা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কত ধ্বংসাত্মক ছিল। তেমনি প্রথম দিকের একটি বেলুন ইউনিট দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বিমান বাহিনীও বলার মত শক্তিমত্তা অর্জন করে। তারা ১৯১৫ সালের মে মাসের দিকে ১৬৬ এর মত বিমান সংযোজন করতে সক্ষম হয়।

১৮টির মত আধুনিক ড্রিডনট, ১০টি ব্যাটল ক্রুজার, ২০টি টাউন ক্রুজার, ১৫টি স্কাউট ক্রুজার, ২০০টির মত ডেস্ট্রয়ার আর ২৯টি শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ নিয়ে তখনকার দিনে ব্রিটিশ নৌবাহিনী ছিল অন্যতম সেরা। অর্কনির স্কাপা ফ্লো কিংবা স্কটল্যান্ডের রোসিথে থেকে জার্মানদের যে কোনো ধরনের আক্রমণ প্রতিরোধে সদা প্রস্তুত থাকতো ব্রিটিশ নৌবাহিনী। আর এক্ষেত্রে ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার, সাবমেরিন ও হালকা অস্ত্রে সজ্জিত জাহাজগুলো এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করত। এর পাশাপাশি ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল, জিব্রালটার, মালটা ও আলেকজান্দ্রিয়া উপকূলের প্রহরায় নিযুক্ত থাকে দুটি বাটলক্রুজার ও ৮ টির মত ক্রুজার। তবে জার্মান ইউবোটের আক্রমণে এই শক্তিশালী ব্রিটিশ বাহিনীও বেশ কয়েক দফা সংকটে পরে। যুদ্ধে জার্মানরা প্রথম দিকে তিনটি ক্রুজার ও একটি ডেস্ট্রয়ার হারালেও তারা ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ আরথোসার প্রায় ধ্বংস করে দেয়। এদিকে জার্মান ইউবোটের লাগাতার আক্রমণে ১৯১৪ সালের মধ্যেই ব্রিটিশরা তাদের যুদ্ধ জাহাজ ক্রেসি, আবুকির ও হগ হারায়। এতে প্রায় ১ হাজার ৪০০ নৌসেনার প্রাণ যায়। পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে পেতে রাখা মাইনের বিস্ফোরণে অনেক ব্রিটিশ নৌবহরের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

১৯১৪ সাল থেকে শক্তিশালী ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য মূর্তিমান আতঙ্ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন জার্মান নৌ অধিনায়ক ফাঞ্জ ফন হিপার। তিনি নানাস্থানে আক্রমণ করে ব্রিটিশদের জন্য সংকট তৈরি করে। তবে নানা স্থানের যুদ্ধে এত ক্ষয়ক্ষতি ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে নিঃশেষ করতে পারেনি। তারা ১৯১৫ সালের ২৩ জানুয়ারি জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে এক মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। জার্মান যুদ্ধজাহাজ সিডলিজ ও ব্লচার এবার আক্রান্ত হয় ব্রিটিশ নৌসেনার দ্বারা। জার্মানরা এর প্রতিশোধ নিতে ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল ডেভিড বিটির ফ্ল্যাগশিপ লায়নের সলিল সমাধি নিশ্চিত করে। ব্রিটিশরা আবার নতুন করে জার্মান নৌসেনার মুখোমুখি হয় ১৯১৬ সালের ৩১ মে জুটল্যান্ডের যুদ্ধে। এবার দুপক্ষেই প্রচুর হতাহত হয়। তাদের প্রত্যেকেরই ক্ষয়ক্ষতি হয় অনেকগুলো যুদ্ধজাহাজ, ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার ও ব্যাটল ক্রুজার। এতে করে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি হতাশ হয়ে পড়ে। তারপরেও জুটল্যান্ডের লড়াইকে ব্রিটিশ কমান্ডারদের পক্ষ থেকে একটি বিজয় হিসেবে দাবি করা হয়। এরপর থেকেই ব্রিটিশ নৌবাহিনী বুঝে যায় যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকতে হলে সবার আগে জার্মান ইউবোটগুলোর আক্রমণ ঠেকাতে হবে। অন্যথায় এই বিপদজনক নৌযানগুলো সমুদ্রপথে কাউকেই আর দাঁড়াতে দেবে না। আর এতো কিছুর পরেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এক ব্রিটিশ নৌবাহিনীরই প্রায় ৩৪ হাজর ৬৪২ জন সদস্য নিহত হয় যার মধ্যে অনেক এশীয় নাগরিক ছিল। আর আহতের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না।

জার্মানি

কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম ও আর্মি চিফ অব স্টাফ জেনারেল হেলমুট ফন মোল্টকির অধীনে ছিল চৌকশ জার্মান বাহিনী। ১৯১৪ সালের বাস্তবতায় জার্মান সেনাবাহিনী ছিল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী। পরবর্তীকালে জেনারেল ফন ফাকেনহায়েন কিংবা পল ফন হিন্ডেনবার্গ সেনাপ্রধান হলেও তাদের শক্তিমত্তায় তেমন হেরফের ঘটতে দেখা যায়নি। বরং যুদ্ধে পরাজয় ও লজ্জাজনক ভার্সাই চুক্তিতে বসার পূর্ব পর্যন্ত জার্মান সেনাবাহিনীকে ক্রমশ উন্নত থেকে উন্নততর হতে দেখা গেছে। ১৯১৪ সালের দিকে প্রায় ৭ লাখ সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত ২৫টি কোর নিয়ে যাত্রা শুরু করে জার্মান বাহিনী। এক্ষেত্রে বিদ্যমান ৮টি কমান্ডের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে আরো ১০টি যুক্ত হলে অপ্রতিরোধ্য রূপ ধারণ করে জার্মান বাহিনী। বিশেষ করে যুদ্ধ ঘোষণার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে রিজার্ভ সৈন্যদের ডেকে এনে সেনা সংখ্যা ৩৮ লাখে উন্নীত করা হয়। এক্ষেত্রে ১৯১৬ সালের আগস্টে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান সৈন্য ছিল ২৮ লাখ ৫০ হাজার। এ সময় পূর্ব রণাঙ্গনেও সৈন্য ছিল প্রায় ১৭ লাখের মত। আর এক্ষেত্রে জার্মান সৈন্য নিয়োগের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানা যায় যুদ্ধ শেষ হলে প্রায় ১৭ লাখ ৫০ হাজার সৈন্য সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিল বলে জানা গেছে। জার্মান সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বিমান ও নৌবাহিনীও ছিল বেশ শক্তিশালী। বিশেষ করে তাদের সেনাবাহিনী প্রথম থেকে শক্তিশালী হওয়াতে বিমান ও নৌবাহিনী উন্নতকরণের তেমন গুরুত্ব দেয়নি জার্মানি। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর চেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে দেখে নৌ ও বিমান বাহিনীকেও সমান গুরুত্ব দিলে একটি পর্যায়ে এসে অন্যদের ছাপিয়ে যায় তারা। বিশেষ করে নৌপথে জার্মানির ডিজেল চালিত ইউবোট ও সাবমেরিন যে কোনো যুদ্ধ জাহাজের সর্বনাশ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। পাশাপাশি তাদের ১৭টি অত্যাধুনিক ড্রিডনট, ৫টি ব্যাটেল ক্রুজার, ২৫টি ক্রুজার, ২০টি যুদ্ধজাহাজ ও ১০টি ইউবোট নিয়ে জার্মানির নৌবাহিনী হয়ে ওঠে দ্বিতীয় বৃহত্তম। তবে আকৃতিতে যাই হোক না কেনো নৌপথে জার্মান বাহিনী যে কোনো দেশকে সংকটে ফেলে দেয় বিভিন্ন স্থানের নৌযুদ্ধে।

সিনক্রোনাইজড গিয়ার আবিষ্কৃত হওয়ার পর জার্মান বিমান বাহিনী বেশ উপকৃত হয়। বলতে গেলে এ সময় থেকেই থেকেই তাদের নামেমাত্র উপস্থিত থাকা সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে ফ্রান্সের যুগান্তকারী আবিষ্কার রোঁলা-গারোঁর উপযুক্ত জবাব দিতে এদিকে জার্মানিও তৈরি করে ফকার-ই, হালবারস্ট্যাড এবং অ্যালব্যাট্রস ডি-এর মত বিমান। এদিকে ম্যালফ্রেন ফন রিচথোপেন কিংবা আর্নেস্ট ওডেট হয়ে ওঠেন আকাশ যুদ্ধের প্রতীক। ধীরে ধীরে লোকবল বাড়তে বাড়তে ১৯১৭ সালের দিকে এসে এক পশ্চিম রণাঙ্গনেই জার্মানির ৩ হাজার ৬৬৮ টি বিমান উড়তে দেখা যায়। আর যুদ্ধবিরতিকালে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায় এই বাহিনীকেই। তখন জার্মান আর্মি এয়ার সার্ভিসের ২ হাজার ৭০৯টি বিমান এবং সাড়ে চার হাজার পাইলট থাকার কথা। ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে জার্মান বিমান বাহিনী বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। তবে এ বিলুপ্তির আগে জার্মান বাহিনী থেকে প্রায় ৬ হাজার ৮৪০ জন বৈমানিক নিহত ও নিখোঁজ হয়েছে বলে স্বীকার করা হয়। শেষ পর্যন্ত ভার্সাই চুক্তির অন্যতম শর্তবলে ১৯২০ সালের ৮ মে বিলুপ্ত হয় জার্মান বিমান বাহিনী।

যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিনরা জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে সমান তালে আক্রমণ চালায়। বলতে গেলে তাদের এই আক্রমণ যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করে দিয়েছিল। ১৯১৪ সালের দিকে ৯৮ হাজার নিয়মিত মার্কিন সৈন্যের প্রায় ৪৫ হাজার মোতায়েন করা হয় দেশের বাইরে। জেনারেল লিওনার্ড উডের সুপারিশক্রমে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এই সংখ্যা বাড়িয়ে ১ লাখ ৪০ হাজার করতে সময় নেননি। আর ১৯১৭ সালের দিকে যুক্তরাষ্ট্র যখন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন জেনারেল পার্শিংয়ের নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয় আমেরিকান এক্সপিডিশনারি ফোর্স বা এইএফ। এরই মাঝে মার্কিন কংগ্রেস ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিউজ জনসন প্রণীত সিলেক্টিভ সার্ভিস অ্যাক্ট পাস করে। এর আওতায় ২১-৩০ বছর বয়সের সব মার্কিন পুরুষ নাগরিকের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এই আইনের আওতায় মার্কিন সেনাবাহিনীর জনবল বাড়তে থাকে।

চাকরি প্রত্যাশী মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও দলে দলে যোগ দিতে থাকে সেনাবাহিনীতে। তাদের আগমনে ১৯১৮ সাল নাগাদ মার্কিন সামরিক বাহিনীর আকার দাঁড়ায় ২ কোটি ৩৯ লাখ ৮ হাজার ৫৬৬ জনে। আর তার মধ্যে প্রায় ৪০ লাখ পুরুষকে সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয় সামরিক বাহিনীতে। এরা অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়ে দায়িত্ব পালন করে দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানের যুদ্ধে। এর মাধ্যমেই ১৯১৮ সালের দিকে এসে এক ফ্রান্সেই মার্কিন সেনাবাহিনীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়েছিল। মার্কিন বিমান ও নৌবাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করেই মূলত কোণঠাসা করে ফেলে অক্ষ শক্তিকে। ১৯০৩ সালের দিকে রাইট ব্রাদার্স বিমান আবিষ্কার করলে যুক্তরাষ্ট্র সেটাকে যুদ্ধে ব্যবহারের কথা চিন্তা করে। শেষ পর্যন্ত এর প্রায় ১৪ বছর পর প্রথমবারের মত যুদ্ধে বিমান বাহিনীর সম্পৃক্তি ঘটায় তারা। আর ১৯১৮ সালের দিকে প্রথমবারের মত সরাসরি ফ্রান্সের মাটিতে বিমান থেকে হামলা করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্যকে। বিমান হামলা চালিয়ে শত্রুকে পর্যুদস্ত করে ইতিহাস বিখ্যাত

মার্কিন বৈমানিক হচ্ছেন এডওয়ার্ড রিকেনবেকার, ফ্রেডরিখ গিলেট ও উইলফ্রেড রিভার। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নৌবাহিনী হিসেবে ১৮১৪ সালের দিকেই মার্কিন নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়েছিল। এসব জাহাজ আটলান্টিকের বিস্তৃত এলাকায় মার্কিন সামরিক ও বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে নিরাপত্তা প্রদানের কাজ করত। তবে কুশলী জার্মান নৌবাহিনীর ইউবোট থেকে চার্জ করা মাইনের আঘাতে এসব যুদ্ধ জাহাজের ব্যাপক ক্ষতি গুণতে হয় যুক্তরাষ্ট্রকে।

ইতালি

অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশ ইতালি শুরু থেকেই যুদ্ধবাজ দেশগুলোর শীতল সম্পর্ক থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ১৯১৫ সালের ২৬ এপ্রিল থেকে বিশ্বযুদ্ধে তাদের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ মিলেছে। তবে এ যুদ্ধে তারা প্রথম থেকেই তেমন কোনো সুবিধা করতে পারেনি। ২৫ পদাতিক এবং ৪টি ক্যাভালরি ডিভিশনের সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে জড়ায়। এক্ষেত্রে ব্রিটেন সরাসরি তাদের অর্থসাহায্য করার কথা বলে। তারা মাত্র ১২০টি কামান ও ৭০০টি মেশিনগান নিয়ে এসময় অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিতে সর্বাত্মক হামলা চালায়। আইসোনজো অভিযানের একেবারে গোড়ার দিকের দু সপ্তাহেই ইতালির বাহিনী তাদের ৬০ হাজার সৈন্য হারায়। এদিকে শীতকালে আক্রমণ বন্ধ থাকলেও শেষ পর্যন্ত ইতালীয় বাহিনী তাদের লাখ তিনেকের মত সৈন্য হারিয়েছে। বস্তুত এসব সৈন্যের সিংহভাগ ছিল নানা পদে প্রতিষ্ঠিত যারা যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। তবে প্রায় সাত বারের মত শত্রুর ব্যুহ ভাঙার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল এই বাহিনী।

১৯১৬ সালের আগস্টে গরজিয়ায় ইতালীয় বাহিনীর সফলতা বাকিদের সতর্ক করে দেয়। তারা নতুন এটা ভেবে সবাই তাদের দুর্বল প্রতিপক্ষ ভাবত এতদিন। কিন্তু এ যুদ্ধের সাফল্য পরিস্থিতি যেমন বদলে দেয় তেমনি ইতালির শক্তিমত্তা সম্পর্কেও নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে সবাইকে। প্রথম দিকে বেশ দুর্বল হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও বিভিন্ন যুদ্ধে সফলতা ইতালীয়দের সাহস বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয় শত্রুসেনার মনে ত্রাস সৃষ্টি করে। গ্যারিবল্ডির রক্ত তাদের ধমনীতে বহমান তা প্রমাণ করতে একের পর এক আক্রমণ শানাতে থাকে ইতালীয়রা। ১৯১৫ সালের বসন্ত আসার আগেই ইতালীয় বাহিনী বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা দেখাতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯১৫ সালে জেনারেল লুইগি কাডোরর্নার অধীনস্থ ২৫টি পদাতিক ও ৪টি ক্যাভালরি ডিভিশন এক্ষেত্রে তাদের শক্তিমত্তা প্রদর্শন শুরু করে।

লুইগি কাডোর্নারের অধীনস্থ মাত্র ১২০টি কামান এবং ৭০০টি মেশিনগানধারী সৈন্যরাই ১৯১৫ সালের মে মাসের যুদ্ধে কাঁপন ধরিয়ে দেয় অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সৈন্যদের মাঝে। তবে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে ইতালির প্রতিকূল হয়ে পড়ে। ইতালীয় সৈন্যদের সর্বত্মক হামলার মুখে আক্রান্ত সেনারা প্রতিরোধব্যুহ রচনা করে। এবার পাল্টা আঘাতে ছত্রখান হয়ে পড়ে ইতালির সৈন্যরা। আইসোনজো অভিযানের সপ্তাহ না পেরোতেই ৬০ হাজার ইতালীয় সৈন্য মারা যায়। এদিকে যমদূতের শীতলতা নিয়ে ঋতু পরিবর্তন হয়। তুষারে চারদিক ঢাকা পড়তে শুরু করে হামলা বন্ধ করে ইতালি। কিন্তু এরই মাঝে হতাহত সৈন্যের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়েছে তাদের। ৭ বারের মত আক্রমণ করে শত্রুর ব্যুহ ভেদ করতে ব্যর্থ কডোর্না এবার সাথে থাকা ৩ হাজার ফিল্ড গান পর্যন্ত খুইয়ে বসেন।

কানাডার সৈন্যদল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইউরোপের নানা দেশ যেখানে লক্ষাধিক সৈন্যের সমাবেশ করতে ব্যস্ত সেখানে মাত্র ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের বাহিনী গঠন করেছিল কানাডা। একটি সমুদ্র বন্দর ও ডকইয়ার্ডের নিরাপত্তায় নিয়োজিত সৈন্যরাই ছিল তাদের মূল ভরসা। তবে বিশ্বযুদ্ধের আলামত পেয়ে তারা নতুন করে বাহিনী তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ফল হিসেবেই ১৯১৪ সালের অক্টোবর নাগাদ কানাডার সৈন্য বাহিনীতে সদস্য সংখ্যা ৩ থেকে বেড়ে গিয়ে ৩০ হাজারে উন্নীত হয়। তবে এর আরো এক বছর পর ১৯১৫ সালে ইপ্রেঁ রণাঙ্গনে গিয়ে যোগদান করে কানাডার বাহিনী। তবে লে. জেনারেল উইলিয়াম অ্যান্ডার্সনের নেতৃত্বাধীন এই বাহিনী পেশাদার জার্মানদের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। মাত্র দু'সপ্তাহের লড়াইয়েই ৫ হাজারের বেশি সৈন্যের হতাহতের মধ্য দিয়ে অনেকটা দুর্বল হয়ে যায় কানাডা। তবে এই দুর্বলতা কাটিয়ে ক্রমশ লড়াইয়ে ফিরে আসে কানাডার বাহিনী। ১৯১৬ সালের দিকে ফ্রান্সের রণাঙ্গনে প্রেরিত বাহিনী প্রথমবারের মত সফলতার মুখ দেখে। ১৯১৭ সালের দিকে জেনারেল জুলিয়ান বায়ানগের বাহিনী ভিমি রিজের দখল নিতে খুব বেশি সময় নেয়নি। জেনারেল আর্থার কুরি বায়ানগের স্থলাভিষিক্ত হলেও কানাডীয় বাহিনীর সাফল্য অব্যাহত থাকে।

শুরুতে দুর্বল হিসেবে পরিচিত এই কানাডীয় সৈন্যরাই যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে একের পর এক সাফল্য লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় ৬ লাখ কানাডার নাগরিক যুদ্ধে যোগদান করে যার মধ্যে ৪ লাখ ১৮ হাজার কানাডীয় নাগরিক কাজ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এক্সপিডিশনারি ফোর্স হিসেবে। এই সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের অনেকেই লাভ করে

ভিক্টোরিয়া ক্রসসহ আরো অনেক পুরস্কার। তবে কানাডিয়ান এক্সপিডিশনারি ফোর্স তথা সিইএফের প্রায় ২ লাখ ১০ হাজার সৈন্য এ যুদ্ধে হতাহত হয়েছিল। অনেক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে নিহত কানাডীয় সৈন্যের সংখ্যা কম করে হলেও ৫৬ হাজার ছাড়িয়েছিল তখন। এর বাইরে ব্রিটিশ বিমান বাহিনীতে নিযুক্ত কানাডিয়ান সৈন্যের সংখ্যাও নেহায়েত কম ছিল না।

ফ্রান্স

১৯১০ সালের দিকে ফরাসি আর্মি এয়ার সার্ভিস গঠন করা হলে তা ইউরোপের ত্রাস হিসেবে আবির্ভূত হয়। পাশাপাশি তাদের সেনা ও নৌবাহিনীও ছিল বেশ বিখ্যাত। ১৯১২ সালের মধ্যেই তারা ফিল্ড আর্মিসহ ফাইভ স্কোয়াড্রন বিমান তাদের সার্ভিসে যুক্ত হয়। প্রায় ৬টির মত বিমান নিয়ে গঠিত হয়েছিল তাদের এক একটি ফিল্ড আর্মি। এদিকে ১৯১৪ সালে না পড়তেই ফ্রান্সের অধিকারে থাকা বিমানের সংখ্যা দেড়শ' হয়ে যায়। ফারম্যান এমএফ-৭, ফারম্যান এইচএফ-২০ ও ব্লেরিওঁ-১১ বিমান মিলে সংখ্যাটা প্রাথমিকবাবে ১৩২ ছিল বলে ধারণা করা হয়। তবে ১৯১৫ সালের মধ্যেই জার্মান হামলায় ফরাসি বিমান বাহিনী বিস্তর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ সময় ক্ষতি কাটিয়ে উঠে নতুন করে লড়াই শুরু করার উদ্যোগ হিসেবে ফ্রান্স ২ হাজার ৩০০ বিমান তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ভয়েসিন ফাইভ, মরানি সাউলনাই, নিউপোর্ট সেকেন্ড, ফারম্যান এমএফ- সেকেন্ড প্রভৃতি তৈরিতে গুরুত্ব দেয়া হয় বেশি। আর সামার অফেন্সিভ শুরুর আগে পশ্চিম রণাঙ্গনে ফ্রান্স মওজুদ করে প্রায় ১ হাজার ১৪৯টির মত বিমান। তবে দ্রুত ফ্রান্সের বিমান উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯১৭ সালে তা ২ হাজার ৮৭০ হয়েছিল । যুদ্ধ বিরতির পূর্বে ফরাসি বিমান বাহিনীর জনবল ছিল ১ লাখ ২৭ হাজার ৬৩০ যাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল ৩ হাজার ২২২টি বিমান। এক্ষেত্রে রেনে ফ্রাঙ্ক, জর্জেজ গাইনেমাঁ, চার্লস নানগেসাঁ ও জর্জ ম্যাডোঁর মত জগদ্বিখ্যাত বৈমানিক ছিলেন ফ্রান্স বিমান বাহিনীর কর্ণধার।

অ্যাটাচড ক্যাভালরি ও ফিল্ড আর্টিলারিসহ ২১টি আঞ্চলিক কোরের ৪৭টি ডিভিশন নিয়ে ১৯১৪ সালের দিকে গড়ে ওঠে শক্তিশালী ফরাসি সৈন্যদল। এক্ষেত্রে ফরাসি সৈন্য সংখ্যাই ছিল শুরুতে ৭ লাখ ৭৭ হাজার যার সাথে যুক্ত হয়েছিল ঔপনিবেশিক অঞ্চলের আরো ৪৬ হাজার সদস্য। তবে পশ্চিমের রণাঙ্গনে সব সৈন্য মোতায়েন না করে তাদের বেশিরভাগ সৈন্য মোতায়েন করা হয় পূর্বের রণাঙ্গনে। অনেক সৈন্য ফ্রান্সের অভ্যন্তরে আপৎকালীন প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে অবস্থান নেয়। ১৯১৪ সালের গ্রিষ্ম আসতে না আসতেই আরো ৪৯ লাখ সৈন্য যুক্ত করে সেনাবাহিনীর কলেবর আরো বৃদ্ধি করা হয়। যুদ্ধের শুরুতে পশ্চিম রণাঙ্গনে বহু ফরাসি সৈন্য হতাহত হওয়ায় তারা আইন করে ৪৫ বছর বয়সী সব ফরাসি নাগরিকের সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করে তোলে। এতে করে সৈন্যসংখ্যা বাড়লেও সেনাবাহিনীর কাঠামো ও ভারসাম্য দ্রুত ভেঙে পড়ে।

১৯১৮ সালের দিকে ফরাসি সৈন্যের ৪০ শতাংশ ছিল গোলন্দাজ। বিশেষ করে ক্রমশ ফরাসি এয়ার সার্ভিস তাদের সৈন্যবাহিনীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত সফল হওয়ায় সৈন্য বাহিনীর কলেবর আর না বাড়িয়ে উদ্যোগ নেয়া হয় বিমান বাহিনী শক্তিশালী করার। তবে নির্বিচারে জোর করে দেশের সব নাগরিককে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা ফরাসিদের সর্বনাশ ডেকে আনে। যুদ্ধে প্রায় ১৩ লাখের মত ফরাসি সৈন্য মারা যায়। ১৯১০-১৪ সালের দিকে এসে ফরাসি নৌবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি তার ব্যয় বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে তোলে। এক্ষেত্রে তাদের বাহিনীতে লভ্য ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার ও সাবমেরিনের সাথে সাথে যুক্ত হয় ১৪টির মত যুদ্ধজাহাজ, ৩২টি ক্রুজার, ৮৬টি ডেস্ট্রয়ার, ৩৪-সাবমেরিন ও ১১৫টি টর্পেডো বোট। দার্দানেলিস অভিযানের সময় শুরুতেই আক্রান্ত হয়ে ফরাসি বাহিনী পিছু হটে যায়। এরপর ভূমধ্যসাগরে ফরাসি বাণিজ্য জাহাজগুলোর নিরাপত্তা দিতে গিয়েও ব্যর্থ হয় ফরাসি নৌবাহিনী। বিশেষ করে নানা স্থানে শক্তি দেখাতে গিয়ে তাদের মুখোমুখি হতে হয় জার্মান ইউবোটের। বেশ কয়েকটি স্থানে এই ইউবোটের আক্রমণেরই ছত্রখান হওয়ার যোগাড় ফরাসি নৌবাহিনীর বিপরীতে ধ্বংসের মুখে পড়ে তাদের নৌবাণিজ্য।

তুরস্ক

আরব, আর্মেনীয়, কুর্দি, সিরীয় ও আনাতোলীয় তুর্কি নিয়েই গঠিত হয়েছিল তাদের সেনাবাহিনী। তবে ১৯১২-১৩ সালের দিকে ঘটে যাওয়া বলকান যুদ্ধের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। তারা সেসময়ের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে দেখে পুরো বাহিনীকে ঢেলে সাজানো ছাড়া আরো কোনো পথ নেই। তাদের বন্ধুরাষ্ট্র জার্মানি এবার সেনাবাহিনীর

আধুনিকীকরণে সাহায্যের হাত বাড়ায়। বিখ্যাত সমরবিশারদ জেনারেল লিমান ফন স্যান্ডার্স এক্ষেত্রে তুরস্কের ত্রাণকর্তার ভূমিকায় আবির্ভূত হন। এরপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ায় তুর্কি বাহিনী। তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনটি আর্মির অধীনে ৩৬ ডিভিশন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। যুদ্ধমন্ত্রী আনোয়ার পাশার নেতৃত্বাধীন তুর্কি বাহিনী নানা স্থানে ইঙ্গো-ফরাসি প্রশিক্ষিত বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। বিশেষ করে গ্যালিপলির যুদ্ধে তুর্কিদের সাফল্য ইংরেজ বাহিনীর মনে ত্রাস সৃষ্টি করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সবমিলিয়ে তাদের সাড়ে তিন থেকে সাড়ে চার লাখ সৈন্য অংশ নিয়েছিল বলে মনে করা হয়।

অস্টো-হাঙ্গেরিয়ান বাহিনী

যুদ্ধের শুরুটা হিসেব করতে গেলে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির নাম সবার আগে চলে আসে। তাই যুদ্ধ শুরুর পূর্বে তাদের সৈন্যদলের অবস্থান ও যুদ্ধকালীন সাফল্য গাথা কিংবা ব্যর্থতার খতিয়ান সবই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির আলাদা সেনাবাহিনী থাকলেও তা ১৯১৪ সালের দিকে অর্ধলক্ষ অতিক্রম করতে পারেনি। তবে তাদের বিমান ও নৌবাহিনী বেশ শক্তিশালী ছিল। বলতে গেলে ক্ষুদ্রাকৃতির দেশ হলেও স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে টিকে থাকার ক্ষমতা তাদের ছিলো। এক্ষেত্রে নানা স্থানের রণাঙ্গনে তারা আঘাত হানতে থাকে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ থেকে আক্রমণ চালানোর জন্য। তাদের সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ ছিলেন মার্শাল কাউন্ট ফন কনরাড। আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক কনরাডও অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বযুদ্ধ বাধার কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে কাজ করেছিলেন। পাশাপাশি গডউইন ব্রমবোস্কি ছিলেন একজন খ্যাতনামা পাইলট। পরপর প্রায় ৩৫টি যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি হয়ে ওঠেন পুরো সেনাবাহিনীর অনেক পরিচিত মুখ।

সার্বিয়া ও বেলজিয়াম

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই বেশ শক্তিশালী ছিল সার্বিয়ান বাহিনী। ১৯০১ সালের দিকে প্রায় সব পরিণত বয়স্ক সার্বিয়ান যুবকের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার কথা বলা হলে মাত্র এক যুগ ব্যবধানে ১৯১২ সালে এসে ২ লাখ ৬০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী গড়ে ওঠে তাদের। এরপর তারা মন্টেনিগ্রো, গ্রিস ও বুলগেরিয়ার সাথে যোগদান করে বলকান লীগে। তাদের মিলিত বাহিনী তুর্কি ভূখণ্ডের অনেক এলকা আগ্রাসন চালিয়ে দখল করে নেয়। ৩ লাখ ৬০ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে যোগদান করে প্রথম দিকে বেশ সফলতার সাথে কয়েকটি আক্রমণ তারা প্রতিহত করে। তবে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির দুর্বার আক্রমণের মুখে ধসে গিয়ে ষাটোর্ধ্ব পুরুষদের যুদ্ধে নিয়োগের পাশাপাশি মিত্রবাহিনীর দিকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায় সার্বিয়ানরা।

১৯১৫ সালের ৫ অক্টোবরের দিকে তাদের সহায়তায় এসে পৌঁছায় ফ্রান্স-ব্রিটিশ মিত্রবাহিনীর একটি দল। ব্রিটিশ সেনাদলের নেতা জর্জ মিলনি সেলোনিকা ও ফরাসি দলপতি মরিস সরাই সীমান্তে সরাসরি জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরিতে অংশ নিয়েছিলেন। তবে ১৯১৫ সালের দিকে জার্মান বাহিনীর দুর্বার আক্রমণে সেখান থেকে মিত্রবাহিনীসহ সার্বিয়ার সৈন্যরা পালিয়ে যায়। তাদের বেশিরভাগ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে গিয়ে আশ্রয় নেয় আলবেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে। সেনাবাহিনীর ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করলে বেলজিয়াম ছিল দুর্বল একটি দেশ। তারপর ১৯১৪ সালের দিকে জার্মান আক্রমণে ধসে পড়ে তাদের সীমান্তবর্তী সবগুলো দুর্গ। তাদের ২ লাখ ৬৭ হাজার সৈন্যের মধ্য থেকে প্রায় ১৪ হাজার নিহত ও অগণিত সৈন্য আহত হয়েছিল এ যুদ্ধে।

বুলগেরিয়ার সেনাদল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষমতা প্রদর্শনের মহড়া ও শক্তিমত্তা বিচার করতে গেলে বুলগেরিয়ার সৈন্যদলকে তেমন গুরুত্বের মধ্যে ফেলা যায় না। তবে ২০ থেকে ৪৬ বছর বয়স্ক প্রতিটি পুরুষকে সেনাবাহিনীর ট্রেনিং বাধ্যতামূলক করার পর ১৯১২-১৩ সালের দিকে ১০ ডিভিশনে উন্নীত হয়েছিল। তারা বলকান ফ্রন্টে সমবেত হয়ে ১৯১৫ সালের দিকে সার্বিয়া আক্রমণ করে বসে। তাদের কোনো কারখানা না থাকার পরেও জার্মান বাহিনীর থেকে সহায়তা পাওয়ায় কখনই গোলাবারুদ, বুলেট, কামান ও মেশিনগান সংকটে পড়তে হয়নি। পাশাপাশি জার্মান আর্মি এয়ার সার্ভিস তাদের লোকবলের পাশাপাশি বিমান দিয়েও সহায়তা করেন। শেষ পর্যন্ত ১২ লাখ বুলগেরিয়ার সৈন্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। যুদ্ধবিরতির আগে পর্যন্ত তাদের নিহত সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১ লাখের উপরে।

গ্রিক বাহিনী

বলকান অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হলে গ্রিক রাজার অনুসারী সামরিক কর্মকর্তারা সরাসরি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সমর্থন দিয়ে বসে জার্মানিকে। তখন তাদের সেনা সংখ্যা ৩২ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২ লাখ ১০ হাজার করা হয়। তবে এক্ষেত্রে

বলকানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে গ্রিক প্রধানমন্ত্রী এলিফথিরিওস ভেনিজেলস অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেই আগ্রহী ছিলেন। তবে রাজা কনস্টান্টাইন ভিন্নমত দেয়াতে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল তাকে। এদিকে ১৯১৫ সালে ক্ষমতায় গিয়ে তিনি আবার মিত্রবাহিনীর পক্ষে সেনা সমাবেশের চেষ্টা করলে রাজা কনস্টান্টাইন তাকে আবার বরখাস্ত করেন। এরপর তিনি ক্রিট দ্বীপে পালিয়ে গিয়ে সেখান থেকে মিত্রবাহিনীর সহায়তায় আক্রমণ চালিয়ে রাজা কনস্টান্টাইনকে পরাজিত করে ক্ষমতা উদ্ধারে সক্ষম হন। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ১৫ হাজার গ্রিক সৈন্যের প্রাণ যায়, পাশাপাশি হতাহত হয় প্রায় এর পাঁচ গুণ।

ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ের বাহিনী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে পশ্চিম রণাঙ্গনের পাশাপাশি মেসোপটেমিয়া, গ্যালিপলি, ফিলিস্তিন, পূর্ব আফ্রিকা ও মিশরের নানা স্থানে নিযুক্ত করা হয় ব্রিটিশ-ভারতীয় বাহিনীকে। ফ্রান্সে পাঠানো ৭০ হাজার ভারতীয় সৈন্যের প্রায় ৫ হাজার নিহত হয়, আহত হয় ১৬ হাজারের বেশি। জেনারেল লর্ড কিচেনারের নেতৃত্বাধীন এ বাহিনীর সিংহভাগই ছিল ভারতের নানা স্থানে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ব্রিটিশ। পাশাপাশি গোলন্দাজ বাহিনীতে যুক্ত হয়েছিল বেশ কিছু সংখ্যক জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক। এদিকে ১৯১২ সালের দিকে গঠিত দক্ষিণ আফ্রিকার বাহিনীতে ৫টি অশ্বারোহী রেজিমেন্টের পাশাপাশি একটি ক্ষুদ্র গোলন্দাজ দল যুক্ত করা হয়। জেনারেল জান স্মার্টসের নেতৃত্বে তাদের প্রায় ১ লাখ ৪৬ হাজার সৈন্য অংশ নেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। এর মধ্যে নিহত ও আহতের সংখ্যাও দশ হাজারের বেশি কিংবা কারো কারো মতে পাঁচ হাজারের মত। এদিকে স্থানীয় শিকারী বয়েড কানিংহামের নেতৃত্বে তৎকালীন রোডেশিয়া তথা জিম্বাবুয়েতে গঠিত হয় বিশেষ বাহিনী। তাদের সিংহভাগ গিয়ে উপস্থিত হয় পশ্চিম রণাঙ্গনে যার বেশিরভাগই ছিল পুরুষ ও ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ।

পাঠ-৩.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগের সময়কে বলা হয়ে থাকে সশস্ত্র শান্তির যুগ। কারণ এই সময় প্রায় প্রতিটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র নানাভাবে তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। উপরে বর্ণিত বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীর আকার বৃদ্ধির আলেখ্য থেকে দৃষ্টিগোচর হয় যুদ্ধ না হলেও কোনো দেশ নিশ্চুপ বসে থাকেনি। তারা আইন করে নির্দিষ্ট বয়সের মানুষকে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে বাধ্য করে। এক্ষেত্রে বিশেষ যুদ্ধের প্রস্তুতির ভাব অনেকটাই স্পষ্ট। এসময় বিভিন্ন শক্তিশালী দেশের দখলে থাকা অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলো যেমন স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। তেমনি শক্তিশালী দেশগুলোর সন্দেহ, পরস্পর বিশ্বাসহীনতা, ভয়-ভীতি আর স্বার্থপর তৎপরতা বাড়িয়ে তোলে তাদের সম্পর্কের শীতলতা। ১৯ শতকের একেবারে গোড়া থেকে এক দশক নানা কারণে দুটি জোটে বিভক্ত হয়ে যায় পুরো ইউরোপ। এর সাথে যুক্ত হয় পুরো বিশ্বে তাদের সাথে সম্পর্কিত দেশগুলোও। আর সাথে জড়িত কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. **জাতীয়তাবাদ :** ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে যে উগ্র ফরাসি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল তা অনেকাংশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকেও প্রণোদিত করে। বলতে গেলে এর মধ্যদিয়েই অনেক ইউরোপের দেশ স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। ১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেস বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। তবে ১৮৪৮ সালের পর থেকে শুরু করে ১৮৭০-এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ অর্জন করে তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এর মধ্যে ইতালি, জার্মানি, গ্রিস, সার্বিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের কথা বলা যেতেই পারে। পাশাপাশি তাদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ চেষ্টা করতে থাকে স্বাধীন হওয়ার। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে হঠাৎ জাগ্রত হওয়া জাতীয়তাবাদ পুরো ইউরোপকে ঠেলে দেয় এক ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে।

২. **জাতিগত দ্বন্দ্ব :** ইউরোপের বাইরে উপনিবেশ স্থাপন নিয়ে স্থানীয় পরিসর এবং নানা উপনিবেশে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘাত চলে আসছিল। এরই মধ্যে ঘটে যায় বিখ্যাত সিডানের যুদ্ধ। যুদ্ধের পর ১৮৭১ সালে জার্মানি ফ্রান্সের থেকে লরেন ও আলসেস কেড়ে নেয়। এ দুই এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ফ্রান্সের অধীনে থাকায় নিজেদের ফ্রান্সের অধিবাসী বলে মনে করার পরেও নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে দখল করা হয় স্থান দুটি। অন্যদিকে জার্মান জাতির অংশ ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেও তারা জার্মান এই দাবিও তোলা হয় তখন। এ থেকে ফ্রান্স ও জার্মানির সংঘাত শুরু হয়। পাশাপাশি এমনি নানা অসম্ভব বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে ১৮৭০ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয় ঐক্যবদ্ধ ইতালি। ঐক্যবদ্ধ ইতালির সাথে ট্রেনটিনো ও ট্রিয়েস্টের সংযুক্তীকরণ নিয়ে একটি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এ অঞ্চল অস্ট্রিয়ার দখলে থাকায় তাদের বিরুদ্ধে ইতালির অভিযান হয়ে যায় অবশ্যম্ভাবী। পাশাপাশি বলকান অঞ্চলে জাতিগত দাঙ্গা আরো চাঙ্গা হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়।

৩. **উপনিবেশ বৃদ্ধি :** ইউরোপের নানা দেশে শিল্প বিপ্লবের পর নানা ধরনের শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বহুলাংশে বেড়ে যায়। এই বাড়তি পণ্যের বিপনন ও বাজারজাতকরণ নিয়ে ঝামেলায় পড়ে দেশগুলো। তখন নতুন ভূখণ্ড দখলের অন্যরকম এক তাগিদ লক্ষ করা যায় তাদের মধ্যে। তাদের এই দখলবাজির প্রবণতাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী।

৪. **অর্থনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদ :** ইউরোপে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল চোখে পড়ার মত। অর্থনৈতিক দৈন্য তাদের বিশ্বের নানাদেশে উপনিবেশ স্থাপনে প্রণোদিত করে। এ নিয়েও ইউরোপের নানা দেশের মধ্যে চলত ক্রমাগত সংঘাত। বিশ্বের নানা স্থানে তাদের পণ্যবাজার সৃষ্টি নিয়ে যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয় এ থেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত। এই সংঘাত একদিন অনেক বড় আকার ধারণ করে রূপ নেয় বিশ্বযুদ্ধের। এক্ষেত্রে বিশেষ করে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের কথা বলা যেতে পারে সবার আগে। পাশাপাশি ব্রিটেন অধিকৃত অঞ্চলের দিকে জার্মানির দৃষ্টি গেলে একটি যুদ্ধ হয়ে পড়ে অনিবার্য। আর সবদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল অর্থনৈতিক।

৫. **সামরিক শক্তি বৃদ্ধি :** বিশ্বের নানাস্থানে বাজার সৃষ্টি ও বিভিন্ন দেশের সাথে অহেতুক প্রতিযোগিতা বহুগুণে বৃদ্ধি করে প্রতিটি দেশের সামরিক বাহিনীর আকার। বর্ধিত সেনাবাহিনীর ভরণপোষণের জন্য যে অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন অনেক দেশের পক্ষে এ সংস্থানও সম্ভব ছিল না। তাই যুদ্ধ আর দখলবাজিতে মেতে উঠতে হয় তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই।

তাদের ধারণা ছিল বিভিন্ন দেশের সাথে যুদ্ধে জিততে পারলে তাদের শক্তিমত্তা যেমন বাড়বে তেমনি বিশাল সৈন্যদলের দায়ভারও বইতে হবে না তাদের।

৬. **ইতালি ও জার্মানির একত্রীকরণ :** ইউরোপের দুটি বিশাল ভূখণ্ড হিসেবে ইতালি ও জার্মানির কথা বলা যেতে পারে যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে বিভক্ত থাকায় কোনোদিন নিজেদের অবস্থান জানান দিতে পারেনি। বিসমার্ক কিংবা গ্যারিবল্ডি আর কাউন্ট কাভুঁরের মত নেতার কৌশলে একত্রিত হয় জার্মানি ও ইতালি। তারপর থেকে তারা নিজেদের অধিকার প্রসঙ্গে বেশ সোচ্চার থাকেন। এতে করে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর আঁতে ঘা লাগে। তারা বুঝতে শুরু করে ধীরে ধীরে ইতালি কিংবা জার্মানির শক্তিবৃদ্ধি তাদের জন্য আখেরে মঙ্গল বয়ে আনবে না। আর শেষ পর্যন্ত ইতালি আর জার্মানির বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধটা লেগেই যায়।

৭. **দুর্দমনীয় জার্মানি :** বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড হিসেবে ইউরোপের নানা শক্তির হাতে নিষ্পেষিত ছিল জার্মানি। তারা ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর বিসমার্কের নেতৃত্বে অনেক শক্তিশালী অবস্থানে চলে যায়। একসময় যেসব দেশ তাদের দখল করে রেখেছিল এক্ষেত্রে তাদের শক্তিমত্তা ওই দেশগুলোকে ছাড়িয়ে যায়। এদিকে দীর্ঘদিন শোষিত জার্মানির মধ্যে তখন কাজ করছে তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা। বিসমার্কের হাত ধরে যে নতুন ঐক্যবদ্ধ জার্মানি আত্মপ্রকাশ করেছিল তা কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সময় এসে ইউরোপের দুর্দমনীয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ইউরোপের অন্য দেশগুলোর সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি ও সামরিক প্রস্তুতি দেখে তারাও থেমে থাকেনি। একটি পর্যায়ে সবগুলো শক্তিকে একই সাথে চ্যালেঞ্জ করে তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন করে তোলে। বিশেষ করে কাইজার দ্বিতীয় ইউলিয়াম বিসমার্কের নীতি ত্যাগ করেন। তিনি মনে করেন ঐক্যবদ্ধ জার্মানিই সবকিছু নয়। আর এতে করে তিনি জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ও বলকান রাষ্ট্রগুলোর পাশাপাশি তুরস্ক পর্যন্ত নিজ দখলে নিয়ে গঠন করতে চেয়েছেন নিজস্ব এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য। আর এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তাই তাকে এতটা আগ্রাসী করে তোলে যা আসন্ন করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

৮. **অস্ট্রিয়ায় রদবদল :** অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যে দ্বৈত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৮৬৭ সালের দিকে হ্যাপসবুর্গরা তাদের শাসন নীতি পরিবর্তন করে। শাসন ক্ষমতায় জার্মান আভিজাত্যের প্রাধান্য খর্ব করা নিয়ে এসময় দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বিশেষ করে একইসাথে জার্মান ও অস্ট্রিয়া দুই দেশের অভিজাতদের মানিয়ে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা বেশ কঠিন হয়ে যায়। অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের গৃহীত নানা উদ্যোগ হিসেবে সেখানে জার্মানদের প্রভাব ক্ষুণ্নের চেষ্টা করা হয়। বিভিন্নভাবে দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে আসার চেষ্টা করে স্লাভদের। এভাবে ক্রমাগত স্লাভ অভিবাসন তাদের অভ্যন্তরীণ সংকটকে আরো বড় করে।

৯. **দখলবাজ মনোভাব :** ইউরোপে নানা দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি হেতু তারা পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে প্রতিটি দেশ এবার চেষ্টা করে সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যে থেকে যতটুকু পারা যায় নিজ রাজ্য পরিসীমা বাড়িয়ে নেয়া। বিশেষ করে ফ্রান্স ও ব্রিটিশদের নৌপথে যে দীর্ঘদিনের সংঘাত তা আরো বড় আকারে হতে পারত। কিন্তু এবার সময়ের চাহিদায় যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে যায়। উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জার্মানি এবং ইতালি নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে হাজির হয়।

১০. **চুক্তি ও জোট গঠন :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার বেশ আগে থেকেই ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি হয়। এসময় নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশ পরস্পরের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তি তাদের শক্তিমত্তার পাশাপাশি যুদ্ধবাজ প্রবণতাও বাড়িয়ে তোলে বহুলাংশে। এতে করে দেখা গেছে অনেক দুর্বল অর্থনীতির দেশও অহেতুক ক্ষমতা প্রদর্শনের ইচ্ছায় বিশাল সেনা সমাবেশ করে বসে। আর ওই সেনা সমাবেশ তাদের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে।

১১. **অমীমাংসিত বিরোধ :** ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের শত্রুতা কাজ করছিল। ঐতিহাসিকভাবে পরস্পরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ দিনে দিনে আরো ভয়াবহ রূপ লাভ করে। এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ থেকেই একটি যুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ে। ভূমি দখল, শক্তি প্রয়োগ আর যুদ্ধবাজ প্রবণতা এই দেশগুলোর সম্পর্কহানির মূল কারণ।

১২. **শাসনগত জটিলতা :** রাজতান্ত্রিক শাসনের ক্রমবিস্তার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনগণের অধিকার বিপন্ন করেছিল। অরাজক পরিস্থিতিতে রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখার জন্য জনগণকে কোনো একটা কাজে ব্যস্ত রাখাটা তখনকার প্রশাসনের জন্য বেশ জরুরি ছিল। দেশে শিক্ষা, চিকিৎসা আর কর্মসংস্থানের অভাব যখন চরমে তখন শাসকগোষ্ঠী নিজেদের পিঠ

বাঁচাতে আগ্রহ দেখিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এতে অন্তত কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হয়। অতিরিক্ত সেনাসদস্য নিয়োগ শাসকদের একটি সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করে। এদিকে সামরিক দিক থেকে বলবান কিন্তু শাসনান্ত্রিক কাঠামোয় জট পাকিয়ে ফেলেছে এমন রাষ্ট্রগুলোর শাসকরা নিজের ক্ষমতা সংহত করতেই পা বাড়ায় ভয়াবহ এ যুদ্ধের দিকে।

১৩. **দ্রুত যুদ্ধ শেষের প্রচারণা :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগেই এর প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির আপাত হিসাব দেখে অনেক সচেতন ও বিবেকবান মানুষ এর থেকে পিছিয়ে আসতে শুরু করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ তখন প্রচার চালায় যুদ্ধ শুরু হলে তাদের জয়লাভ সময়ের ব্যাপার। আর এক্ষেত্রে প্রত্যেক পক্ষই দাবি করে খুব দ্রুত যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার। আর তারপর জনগণকে নানা সুবিধার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দেয়া হয়। এই প্রচারণাও অনেক দিক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে প্রণোদিত করে।

১৪. **সিলাইফেনের ভূমিকা :** প্রখ্যাত জার্মান সেনানায়কের নাম আলফ্রেড গ্রাফ ফন সিলাইফেন। তিনি বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানিকে প্ররোচিত করেন। বিশেষ করে তিনি ১৯০৫ সালের দিকে অবসর গ্রহণের পূর্বে জার্মানির উন্নয়নে কিছু প্রস্তাবনা পেশ করে যান। এক্ষেত্রে ১৯০৪ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়া হার মানলে তার প্রস্তাবনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যা প্ররোচিত করে অন্যসব যুদ্ধবাজ জার্মান সেনানায়ককে। প্রাথমিকভাবে অনেক দুঃসাহসী এ পরিকল্পনাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

১৫. **ভিয়েনা কংগ্রেস :** ফ্রান্স আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফরাসি বিপ্লব যেমন ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস ও মানচিত্র বদলে দিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। তেমনি ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় ইউরোপের ইতিহাসকে প্রবাহিত করে ভিন্ন খাতে। যুদ্ধজয়ী ব্রিটেন, প্রুশিয়া, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া এ সম্মেলনের আয়োজক ছিলো। এক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ার মন্ত্রী মেটারনিক পুরো ইউরোপকে জোর করে ঠেলে ফরাসি বিপ্লব-পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার প্রস্তাবনা পেশ করে। এ প্রস্তাবনাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

১৬. **ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়া যুদ্ধ :** ১৮৭০-৭১ সালের দিকে অনুষ্ঠিত ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়া যুদ্ধ ইউরোপের শক্তিসাম্য নষ্ট করে। নিকট ভবিষ্যতে এ ভারসাম্যহীনতা বিভিন্ন শক্তিশালী দেশকে নিপীড়নকারী ও ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করে। শেষ পর্যন্ত এই শক্তিসাম্য নষ্টের ঘটনা অনেক দিক থেকে বিশ্বযুদ্ধকে প্রণোদিত করেছে।

১৭. **বিসমার্কের দূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতি :** কুশলী নেতা ও সমরনায়ক অটো ফন বিসমার্কের নেতৃত্বে পতনোন্মুখ জার্মানি ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করে। তারা অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির সাথে জোট গঠন করে শক্তিমত্তা আরো বাড়িয়ে তোলে। পাশাপাশি রশিয়ার সাথে সফল কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারায় জার্মানির শক্তিমত্তা বেড়ে যায়। তিনি ফ্রান্স ছাড়া ইউরোপের প্রায় সব রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। এজন্যই হয়ত ফ্রান্স জার্মানির প্রতি বিরূপ অবস্থান দেখিয়ে আসছে দীর্ঘদিন। এ দ্বিপক্ষীয় চুক্তির দুর্বলতা ও জার্মানির দ্রুত শক্তিবৃদ্ধির হেতু একটাই, যুদ্ধ জড়িয়ে পড়া।

১৮. **কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম :** একমাত্র ফ্রান্স ছাড়া ইউরোপের প্রায় সবগুলো দেশের সাথে চুক্তি করেছিলেন বিসমার্ক। তিনি জানতেন চুক্তি করে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি না করে অহেতুক যুদ্ধে জড়ালে শিশু জার্মানির পক্ষে তখনকার ইউরোপে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। তবে কাইজার দ্বিতীয় ইউলহেম ক্ষমতায় বসলে তার অদূরদর্শিতা বিসমার্ককে ত্যক্ত বিরক্ত করে। তিনি ১৮৯০ সালে পদত্যাগ করলে কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম আরো অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন। তিনি সাগরে ইংরেজ বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার মত আরেকটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গড়ে তোলেন। নৌবাহিনীর দিক থেকে জার্মানির এমন শক্তিশালী অবস্থানে চলে যাওয়া ১৯০৪ সালের দিকে অ্যাংলো-ফরাসি জোট গঠনে বাধ্য করে। এরপর জোট আরো শক্তিশালী করে তুলতে ১৯০৭ সালে তারা রাশিয়াকে নিজেদের সাথে যুক্ত করে।

১৯. **জার্মান-ইংরেজ নৌবহর :** কাইজার দ্বিতীয় উইলহেমের উত্থানের আগে সাগরে অপ্রতিরোধ্যভাবে রাজত্ব করত ইংরেজ নৌবাহিনী। তারা পর পর বেশ কয়েকটি নৌযুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে পুরোপুরি সাগরের ত্রাস হিসেবে আবির্ভূত হয়। ঠিক এমনি পরিস্থিতি কাইজারের পক্ষ থেকে জার্মান নৌবাহিনী গঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন গ্রান্ড অ্যাডমিরাল অ্যালফ্রেড ফন টার্পিজ। ১৮৯৮-১৯১২ সালের মধ্যে তাঁর প্রচেষ্টায় জার্মান নৌবাহিনী ইংরেজদের সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে লড়ার ক্ষমতা অর্জন করে। এদিকে ফার্স্ট সি লর্ড জ্যাকি ফিশার নতুন করে ঢেলে সাজান ইংরেজ নৌবাহিনীকে। দুই দেশের নৌবাহিনীর শক্তিমত্তা বৃদ্ধি নতুন করে আরেকটি সংঘাতে জড়াতে প্রণোদিত করে যাকে প্রথম মহাযুদ্ধের অন্যতম পরোক্ষ কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

২০. **ক্রমবর্ধমান সামরিকবাদ :** ১৯০৪ সালের পর ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশ সেনাবাহিনীর আকার বৃদ্ধি করে। এ বর্ধিত সেনাবাহিনী তাদের কৃতকর্মের জন্য কোনো নির্বাচিত সরকার নয় বরং দায়ী থাকতো সম্রাটের কাছে। বেশিরভাগ যুদ্ধবাজ সম্রাট চাইতেন যেভাবেই হোক শান্তিতে-অশান্তিতে তার রাজ্যসীমা কিঞ্চিত হলেও বৃদ্ধি পাক। এ নীতি বুঝতে পেরে সামরিক বাহিনীর প্রধানরা বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। তাদের অহেতুক যুদ্ধবাজ নীতিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচ্য।

পাঠ-৩.৪ বিভিন্ন রণক্ষেত্রের সংঘাত

সামরিক বেসামরিক মিলে প্রায় দেড় কোটি মানুষের প্রাণহানি ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। প্রায় ৯০ লাখ সামরিক ও ৭০ লাখ বেসামরিক মানুষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত হয়েছিল। রুশ গৃহযুদ্ধ এবং আর্মেনীয় গণহত্যার কাহিনীকে বাদ দিলেও এ যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যায় তেমন কোনো হেরফের হয় না। বলতে গেলে ১৯১৪ সালের ২১ আগস্ট ব্রিটিশ এক্সপিডিশনারি ফোর্সের চতুর্থ ড্রাগন গার্ডসের ১২০ জন অশ্বারোহী সৈন্য গিয়ে অবস্থান নেয় বেলজিয়ামের চ্যাস্টাউ গ্রামে। সেখানে জার্মান সৈন্যদের জোরদার অবস্থান দেখে নিজেকে সামলাতে পারেননি ১৬ বছর বয়স্ক কিশোর ব্রিটিশ সৈন্য বেন ক্লাউটিং। ২২ আগস্ট তাঁর ছোড়া গুলির মধ্য দিয়েই মূলত হয়ে শুরু যায় এ যুদ্ধ। তারপর এগিয়েছে নানা সংঘাত আর ঘটনার ঘনঘটায়, সেগুলোর মধ্যে থেকে কিছু অংশ এখানে বর্ণনা করা হল–

রণাঙ্গনে প্রথম লড়াই

১৯১৪ সালের ৩ আগস্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সীমান্ত লংঘনের অভিযোগ এনে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় জার্মানির পক্ষ থেকেই। পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান ও ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ বাহিনীর সৈন্য সমাবেশ যেকোনো মুহূর্তে প্রলয়ঙ্করী সংঘাত বাধার কথা জানান দেয়। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেই যুদ্ধে ক্ষান্ত দেয়নি জার্মানরা। তারা একইসাথে বেলজিয়ামেও সৈন্য প্রেরণ করে। ৪ আগস্ট ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও শুরুতেই তারা শান্তি আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিল। তাদের শান্তি আলোচনার প্রস্তাব আমলে না দিয়ে দুর্নিবার আক্রমণ চালিয়ে মাত্র ৩ দিনের মাথায় লাইজি দখল করে বেলজিয়ামের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়। পুরো বেলজিয়াম দখলে নিতে জার্মানির ১৮ আগস্ট পর্যন্ত সময় লেগে যায়। এর মাত্র দুদিন পর জার্মান বাহিনীর আক্রমণ লোরেন থেকে ফরাসিদের পিছু হটতে বাধ্য করে। ২২-২৫ আগস্ট পাল্টা হামলার চেষ্টা করেও নিউচাটাও ও লংওয়ের লড়াইয়ে বিধ্বস্ত হয় ফরাসিরা।

ব্রিটিশ-জার্মান মুখোমুখি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম লড়াই শুরু হয় ব্রিটিশ ও জার্মান সৈন্যদের পরস্পর মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণের মধ্য দিয়ে। বেলজিয়ামের পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্রিটিশ ও জার্মান সৈন্যরা সমবেত হয়। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ এক্সপিডিশনারি ফোর্সের সৈন্যরা ৭০ হাজারের একটি দল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয় ১৪ আগস্ট। এরপর তাদের সাথে গিয়ে যোগদান করে ফরাসি জেনারেল লানরেজাসের নেতৃত্বাধীন ফিফথ আর্মি। এসময় ফিল্ড মার্শাল ফ্রেঞ্চ জেনারেল স্মিথ ডোরেন ও হেইগের নেতৃত্বে পশ্চিমের প্রায় ৪০ কিলোমিটার রণাঙ্গনে সমবেত হতে থাকে সৈন্যরা। আর তাদের প্রতিরোধে উপস্থিত হয় জেনারেল ফন ক্লার্কের নেতৃত্বাধীন চৌকস জার্মান সৈন্যের একটি দল। তিনি শুরুতে ব্রিটিশ সৈন্যদের ধাওয়া করেন। পরে আক্রমণ বন্ধ করে সংখ্যা পূরণ করার চেষ্টা করেন।

সার্বিয়া অভিমুখে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির বাহিনী

গ্রিস, সার্বিয়া ও আলবেনিয়ার সংঘাত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে অন্যতম। সার্বিয়ার অস্ট্রো-হাঙ্গেরির আক্রমণ বলতে গেলে এ সময়ে যুদ্ধের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ১৯১৪ সালের আগস্টে যুদ্ধ শুরু হলে এর শেষ তথা ১৯১৮ সাল নাগাদ চলতে থাকে এ দু'পক্ষের লড়াই। মার্শাল রাদোমিক পুতনিকের নেতৃত্বাধীন সার্বিয়ার সৈন্যদের সাথে যুক্ত হয়েছিল মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা। এদিকে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির পাশাপাশি বেলজিয়ামের সৈন্যরা সেখানে প্রথম অভিযান চালায় জেনারেল অস্কার পোটিওরেকের নেতৃত্বে। যুদ্ধে শুরুতে জেনারেল রামোমির পুতনিকের নেতৃত্বাধীন সার্বিয়ার সৈন্যসংখ্যা মাত্র ২ লাখ ছিল। তখন অস্ট্রিয়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁকে গ্রেফতার করে অস্ট্রীয় বাহিনী। তবে তাঁকে চিনতে না পেরে চরম বোকামির পরিচয় দিয়ে একটি ট্রেনে করে সার্বিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়। তারপর সার্বিয়ায় অস্ট্রো-হাঙ্গেরির আক্রমণ হলে শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ। ভয়ানক অসুস্থ শরীর নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সার্বিয়ার সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করেন মার্শাল রাদোমির পুতনিক। ২১ আগস্ট দ্রিনা নদী অতিক্রমের পর শুরু হয় মরণপণ লড়াই। তখন একজন অসুস্থ সেনানায়ক পুতনিক জেনারেল অস্কার পোটিওরেকের চৌকস বাহিনীকে হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেন প্রতিরোধ লড়াই কাকে বলে। পুতনিকের যোগ্য নেতৃত্ব এবং অসুস্থ অবস্থায়ও দেশের প্রতি সীমাহীন আন্তরিকতা সার্বিয়ার বাহিনীকে পথ দেখায়। তারা প্রতিপক্ষের দ্রিনা ও সাভা নদী পার হওয়ার সব ধরনের চেষ্টা নস্যাৎ করে নিজেদের শক্ত অবস্থান জানান দেয়।

পূর্ব রণাঙ্গনের লড়াই

মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দিকে বিস্তৃত পূর্ব রণাঙ্গন পশ্চিম থেকে আলাদা ছিল। এখানকার ভৌগোলিক অবস্থান যুদ্ধ এগিয়ে নেয়ার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পশ্চিম রণাঙ্গনের লড়াইয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে পরিখার লড়াই বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। তবে পূর্ব রণাঙ্গনের দীর্ঘ বিস্তৃত ও এবড়ো থেবড়ো ভূ-প্রকৃতির কারণে এখানে কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা গড়ে ওঠেনি। পাশাপাশি এখানকার দীর্ঘ বিস্তৃতি হেতু প্রতিরক্ষা রেখা বরাবর সৈন্য মোতায়েনের ঘনত্বও ছিল বেশ কম। এক্ষেত্রে একবার কোনোক্রমে প্রতিরক্ষাব্যুহে ফাটল দেখা দিলে তা পুষিয়ে নেয়া বেশ কঠিন ছিল। পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন সুগঠিত না হওয়ায় একবার সৈন্যবাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হলে নতুন করে সৈন্য এনে ক্ষতিপূরণ করটাও ছিল বেশ কঠিন একটা কাজ। এখানে প্রতিরোধ লড়াই যতটা সহজ ছিল বাইরে থেকে আক্রমণ করে সুবিধা অর্জন ছিল ঠিক ততটাই কঠিন। বলতে গেলে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত এখানে জার্মান বাহিনীই সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। রুশ সেনাবাহিনী প্রথম পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ করে। তারা প্রুশিয়ার একটি প্রদেশ এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরির গ্যালিসিয়া প্রদেশে হামলা করার চেষ্টা চালালে পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ বাধে। তবে ১৯১৪ সালের আগস্টে টানেনবার্গের লড়াইয়ে তাদের বড় রকমের বিপর্যয় ঘটে। একই বছরের শরৎ আসতে না আসতেই তারা হানা দেয় গ্যালিসিয়ায়। এক্ষেত্রে তাদের দ্বিতীয় অভিযানকে অনেকাংশেই সফল বলা যেতে পারে। তারপর সেপ্টেম্বরে লাম্বার্গ যুদ্ধে জয়ী হয়ে ক্রাকো ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সীমান্ত দুর্গ পারমিজাইলে অবরোধ শুরু করে।

টানেনবার্গের সংঘাত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একেবারে সূচনাপর্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা টানেনবার্গের যুদ্ধ। জার্মানির টানেনবার্গে অনুষ্ঠিত এ লড়াইয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রুশরা। রাশিয়ার পক্ষে আলেকজান্ডার সামসোনভ তার ১ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। অন্যদিকে জেনারেল পল ফন হিন্দেনবার্গের ২ লাখ ১০ হাজার প্রশিক্ষিত সৈন্য রুশ বাহিনীকে ছত্রখান করে দেয়। জার্মান পক্ষে ২০ হাজার নিহত হলেও তারা ৩০ হাজার রুশ সৈন্যকে হত্যার পাশাপাশি ৯৫ হাজার সৈন্যকে বন্দি করে। রুশ সাম্রাজ্য ও জার্মান রাইখের এ লড়াই অনেকাংশে যুদ্ধে জার্মানদের আরো অনুপ্রাণিত করেছিল। এখানে অষ্টম জার্মান আর্মির সঙ্গে রুশদের ফার্স্ট ও সেকেন্ড আর্মির সংঘাত বাধলে রুশ সেকেন্ড আর্মি প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসে। ১৯১৫ সালের বসন্তকাল আসা পর্যন্ত এ লড়াইয়ে রুশরা আর কিছুতেই ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। বিশেষ করে যুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই জার্মানরা রাশিয়াকে তাদের জন্য হুমকি মনে করত। এ লড়াইয়ের মাধ্যমে তারা রণাঙ্গনে তাদের প্রথম শত্রুকে চাপে রাখতে চেয়েছিল। আর যুদ্ধের প্রাথমিক ফলাফল হিসাব করা হলে এ এক্ষেত্রে জার্মানিকেই পুরোপুরি সফল বলাটা কোনোদিক থেকেই দোষের হবে না।

পারমিজাইল দুর্গ অবরোধ :

১৯১৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে পারমিজাইল দুর্গ অবরোধ শুরু করে রুশ বাহিনী। এ অবরোধে রুশদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন তৃতীয় আর্মির কমান্ডার জেনারেল রাডকো দিমিত্রভ। অবরোধের শুরুতে পর্যাপ্ত সংখ্যক কামান না থাকায় তিনি একদফা হোঁচট খান। ১১ অক্টোবর পাল্টা হামলা চালিয়ে তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির বাহিনী। এদিকে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে ৯ নভেম্বর থেকে দুর্গ অবরোধ শুরু করে রুশরা। তখন দিমিত্রভের বাহিনীর কাছে পর্যাপ্ত কামান এসে না পৌঁছলেও তিনি বাহিনীকে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এদিকে পারমিজাইল দুর্গে রুশ অবরোধ দেখে জার্মানরাও থেমে থাকেনি। এসময় জেনারেল ফন ফন হিন্দেনবার্গ উত্তর দিকে ওয়ারশতে হামলা চালান। আর এর সাথে মিল রেখে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির জেনারেল বারোয়িভিক ফন বোজনা দুর্গকে সহায়তা করতে পারমিজাইলের দিকে অগ্রসর হন। মূলত তিনি এগিয়ে আসাতেই দিমিত্রভ অবরোধ প্রত্যাহারে বাধ্য হয়েছিলেন। অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সমর নেতা জেনারেল কাউন্ট ফন কনরাড ভেবেছিলেন ফন বোজনার আক্রমণেই কুপোকাত হয়ে যাবে রুশ বাহিনী। তবে ৩১ অক্টোবরে ভিশ্চুলা নদীতীরের লড়াইয়ে রুশ বাহিনী হিন্দেনবার্গের চৌকস সেনাদলকে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়ে। এতে ফন কডরাডের সব চিন্তা ধূলিসাত হয়ে যায়। তবে দুই পক্ষ থেকে তেমন কোনো ছাড় দেয়ার মানসিকতা লক্ষ করা যায়নি। তাই ১৯১৫ সালের ২২ মার্চ দুর্গ পতন পর্যন্ত প্রায় ১৯৪ দিনের লড়াই চলে দু'পক্ষে।

ব্রাসিলভের লড়াই

১৯১৬ সালের গ্রীষ্মকাল মিত্রবাহিনীর জন্য এক নাজুক সময়। তখন পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্রিটিশ হামলার ধার অনেকটাই কমে যায়। বিশেষ করে জার্মান বাহিনীর মুহুর্মুহু আক্রমণে ছত্রখান হওয়ার দশা হয় তাদের। এসময় উপায় না দেখে রুশদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে মিত্রবাহিনী। বিশেষ করে ভার্দুনে অবস্থানরত ফরাসি বাহিনী জার্মান আক্রমণে প্রায় দিশেহারা অবস্থায় পড়ে। তারা মনে করে এসময় রুশরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলে অন্তত এ যাত্রা রক্ষা পাবে তারা। এ ধরনের নানা অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রুশ জেনারেল অ্যালেক্সি ব্রাসিলভের নেতৃত্বে পূর্ব রণাঙ্গনে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে শুরু হয় রুশ অভিযান। ব্রাসিলভের নামানুসারে এ অভিযানের নাম দেয়া হয় 'ব্রাসিলভ অফেনসিভ'। রুশ জেনারেল স্টাফ স্টাভকার সামনে ব্রাসিলভ একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। সেখানে তার অভিযানের লক্ষ ছিল ফ্রান্সে ফরাসি ও ব্রিটিশ বাহিনীর পাশাপাশি আইসনজো ফ্রন্টে

ইতালীয় বাহিনীর ওপর থেকে চাপ কমিয়ে আনা। অন্যদিকে যেভাবেই হোক অস্ট্রো-হাঙ্গেরিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে দেয়া। এক্ষেত্রে জার্মানরা পরিস্থিতি বুঝতে পেরে পূর্ব রণাঙ্গনেও সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। এ হামলায় রুশদের পক্ষে প্রচুর হতাহত হলেও ফলাফল মিত্রবাহিনীর পক্ষে নিয়ে আসে। বিশেষ করে এ হামলার মধ্য দিয়েই টনক নড়ে জার্মানদের, তারা পশ্চিম রণাঙ্গনে সব সৈন্যের সমাবেশ না করে তাদের অনেকগুলো ইউনিটকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মোতায়েন করে পূর্ব রণাঙ্গনেও। এতে আর যাই হোক তাদের হামলার ধার কমে যায় অনেকাংশে।

ভয়াবহ পশ্চিম রণাঙ্গন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ লড়াইগুলো হয়েছিল পশ্চিমের রণাঙ্গনেই। এক্ষেত্রে উত্তর সাগর থেকে শুরু করে ফ্রান্সের সীমান্তঘেঁষে সুইজারল্যান্ডের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এ রণাঙ্গন। প্রথম দিকে জার্মান বাহিনী কিংবা মিত্রবাহিনী কারো দিক থেকেই কোনো ধরনের দুর্বলতা লক্ষ করা যায়নি। দুপক্ষেই প্রচুর হতাহত হলেও শেষ পর্যন্ত নতুন সৈন্য এনে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা লক্ষ করা গেছে তাদের মধ্যে। ব্রিটেনের নেতৃত্বে বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র এখানে মার্শাল ফার্দিনান্দ ফচের নেতৃত্বে মোকাবেলা করে জার্মানদের। এদিকে কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম স্বয়ং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই ফ্রন্টের লড়াইয়ে। শেষ পর্যন্ত মিত্রবাহিনীর তরফ থেকে ৪৮ লাখ হতাহতের কথা বলা হলেও জার্মান বাহিনী তাদের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির উপযুক্ত সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারেনি। তবে যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ হওয়ার অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত বেলজিয়ামের বেশিরভাগ এলাকা, লুক্সেমবার্গ ও ফ্রান্সের শিল্পাঞ্চলগুলো ছিল জার্মানির দখলেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গের পর ফ্রান্সে নিজেদের অগ্রযাত্রাকে ধারাবাহিক করে জার্মান বাহিনী। তবে ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সাল নাগাদ এ ফ্রন্টে পরপর কয়েকটি প্রাণঘাতী লড়াই হয়। দলবদ্ধ পদাতিক বাহিনীর হামলার পাশাপাশি ব্যাপক কামানের গোলাবর্ষণ করা হয় দুই বাহিনীর পক্ষ থেকেই। কাঁটাতারের শক্ত বেষ্টনীর পাশাপাশি পরিখা খনন করে আগে থেকেই উপযুক্ত অবস্থান নিয়ে বসে থাকে জার্মান বাহিনী। পাশাপাশি পথগুলো আরো নিরাপদ করতে নির্দিষ্ট দূরত্বে মাইন পুঁতে রাখে জার্মানরা। তাই অনবরত মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়তে থাকলেও শেষ পর্যন্ত জার্মানদের তেমন কোনো ক্ষতিই করতে পারেনি মিত্রবাহিনী। পশ্চিম রণাঙ্গনের এ অচলাবস্থা কাটাতে মরিয়ে হয়ে ওঠে মিত্রবাহিনী। তারা শেষ পর্যন্ত এখানে বিষাক্ত গ্যাসবোমা হামলা করে। পাশাপাশি জঙ্গবিমান থেকে চলতে থাকে লাগাতার বোমাবর্ষণ।

আটলান্টিকের ত্রাস জার্মান ইউবোট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে ইউরোপের প্রতিটি দেশ সমীহ করে চলতে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে দেখা যায় এক ভিন্ন চিত্র। ১৯১৪ সালের দিকে উদ্ভাবিত জার্মান ইউবোট এক্ষেত্রে হঠাৎ করেই আটলান্টিকের অতলে ত্রাস সৃষ্টি করে। জার্মান শব্দ 'আন্ডারসিবোটভাভি' থেকেই এ ইউবোটের নামকরণ যা পানির তলদেশ দিয়ে আক্রমণ চালাতে অনেক কার্যকর একটি

জার্মান ইউবোট

সাবমেরিন। ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক দুদিন পর তৎপরতা শুরু করে এ ইউবোট। ১৯১৪ সালের ৬ আগস্ট হোলিগোল্যান্ডে অবস্থিত নৌঘাঁটি থেকে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির ওপর আক্রমণ শানাতে যাত্রা করে ১০টি জার্মান ইউ বোট।

ইতিহাসে প্রথমবারের মত সাবমেরিন টহল শুরু হলে মাইনের আঘাতে কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে ১৯১৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে সফলতার মুখ দেখে ইউবোটগুলো। লেফটেন্যান্ট অটো হার্সিং ইউ-২১ থেকে টর্পেডো নিক্ষেপ করে ব্রিটিশ ক্রুজার পাথফাইন্ডারকে ডুবিয়ে দেয়। এতে ২৫৯ জন ক্রুর কেউই প্রাণরক্ষা করতে পারেনি। এদিকে ২২ সেপ্টেম্বর লেফটেন্যান্ট অটো ওয়েডিগেন ইউ-৯ তিনটি ব্রিটিশ ক্রুজারে প্রাণঘাতী হামলা চালান। এতে তিনটি ব্রিটিশ ক্রুজার আবুকির, ক্রেসি ও হগ পুরোপুরি পানিতে ডুবে যায়। মাত্র আধঘণ্টার এ লড়াইয়ে প্রায় ১ হাজার ৪৬০ জন ব্রিটিশ নাবিক প্রাণ হারায়। এরপর আরো কয়েকটি হামলা চালিয়ে এককথায় আটলান্টিকের ত্রাস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে জার্মান ইউবোট।

অন্তরীক্ষেও দুর্নিবার যুদ্ধ

প্রথম দিকে পদাতিক বাহিনী যুদ্ধ শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিমান বাহিনী এর শৈশব অতিক্রম করছে মাত্র। প্রথম দিকে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের জন্য ক্যাম্বিস ও কাঠের তৈরি বিমানগুলোকে ব্যবহার করা হয়। খুবই ধীরগতির কিছু জেপেলিন ও বেলুন এক্ষেত্রে বেশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। প্রথম দিকে শুধুমাত্র শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে সংবাদ বিনিময় শুরু হলেও পরের দিকে ইট থেকে শুরু করে গ্রেনেড নিক্ষেপ শুরু হয় বিমান থেকে। প্রথম দিকে দুর্বল শক্তির মরিস ফারম্যান, শর্টহর্ন, লংহর্ন, ডিএফডব্লিউবি-১, র‍্যামপ্লার টাউব, বিই-২-এ, এইজি সেকেন্ড, ব্লেরিয়ট ইলেভেন প্রভৃতি বিমান ব্যবহার করা হয়। ধীরে যুদ্ধ এগিয়ে যাওয়া অবস্থায় বিমানের গঠন কাঠামোতে অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়। বিশেষ করে ১৯১৫ সালে জার্মানির উদ্ভাবিত ফকার বিমান মিত্রবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। প্রায় ১১০০ ফুট উচ্চতা দিয়ে ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রমে সক্ষম এই বিমান বলতে গেলে মিত্রবাহিনীর জন্য মহাবিপর্যয়ের কারণ হয়ে দেখা দেয়। ১৯১৭ সালের দিকে বিমান হামলা ভয়াবহরূপ লাভ করলে ব্রিটিশ বাহিনী তাদের ২৪৫টি বিমান হারায়। এক্ষেত্রে জার্মান বাহিনীর ক্ষতি হয় ৬৬টির মত বিমান। সবমিলিয়ে আকাশপথেও চলতে থাকে ভয়াবহ যুদ্ধ।

ট্যাংকের লড়াই

পশ্চিম রণাঙ্গনের ব্যর্থতা ব্রিটিশদের উন্নততর প্রযুক্তির সামরিক যান ও কৌশলগত অবস্থান গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। উপনিবেশ স্থাপন থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পেছনের দরজা যে ব্রিটিশদের প্রথম পছন্দ এবারেও তারা তেমন কোনো পদ্ধতি খুঁজতে চেষ্টা করে। তারা একইসাথে কাঁটাতারের বেড়া ধ্বংসের পাশাপাশি মেশিনগানের গুলি থেকে বেঁচে পরিখা অতিক্রমে সক্ষম যানবাহন তৈরি করে। এক্ষেত্রে কর্নেল আর্নেস্ট সুইনটনের নির্দেশনায় কাজে নেমে পড়ে ল্যান্ডশিপস কমিটি। তাদের দীর্ঘদিনের চেষ্টায় নির্মিত হয় লিটল উইলি নামক ট্যাংক। এক্ষেত্রে ব্রিটিশরা দুই মেইল ও ফিমেইল নামে দুই ধরনের ট্যাংক উদ্ভাবন করে। তারা দুইটি সিক্স পাউন্ডার গানের পাশাপাশি ৪টি মেশিনগান সজ্জিত ট্যাংকের নাম দেয় মেইল। অন্যদিকে সিক্স পাউন্ডারের পাশাপাশি ভাইকার্স মেশিনগান যুক্ত ট্যাংকে ফিমেইল নাম দেয়। বলতে গেলে পশ্চিম রণাঙ্গনের ব্রিটিশ ও ফরাসি বাহিনীর হাজার হাজার ট্যাংক এক্ষেত্রে অনেক কার্যকর হয়ে ওঠে। বলতে গেলে শুরুতে এ ট্যাংকের লড়াইতেই তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেনি শক্তিমান জার্মান বাহিনী। তবে পরিখা সুবিধা কাজে লাগিয়ে গতি শ্লথ করে দেয়ার পাশাপাশি জার্মানরাও বসে থাকেনি। তারা আবিষ্কার করে বসে ট্যাংক বিধ্বংসী নানা অস্ত্র। শেষ পর্যন্ত জার্মানরা তৈরি করে প্যাক ৪০-৭৫এমএম গান। বিশাল ক্যালিবারের এ গোলা যেকোনো ট্যাংকর ধ্বংস করে দিত।

অনৈতিক রাসায়নিক অস্ত্র

পশ্চিম রণাঙ্গনের দখল নিয়ে প্রতিযোগী দেশগুলোর অনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। পরিখা তৈরি করে বছরের পর বছর নিজেদের অবস্থান ধরে রাখে জার্মান বাহিনী। শেষ পর্যন্ত তাদের পিছু হটাতে জঘন্য রকমের গন্ধযুক্ত ক্লোরিন গ্যাসবোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। এতে যুদ্ধক্ষেত্রে চোখ জ্বালাপোড়া করার পাশাপাশি সৈন্যদের আরো নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। উপযুক্ত জবাব দিতে জার্মানিও চালায় মাস্টার্ড গ্যাসবোমা হামলা। চামড়ায় যন্ত্রণাদায়ক দহন ও কাপড়চোপড় ভেদ করে ভেতরে গিয়ে যন্ত্রণার কারণ হয়ে দেখা এই গ্যাস। সবমিলিয়ে এই গ্যাসবোমার হামলা সম্পূর্ণ অনৈতিক ও মানবতা বিবর্জিত হলেও তা শাপে বর হয়ে দেখা দেয় মিত্রবাহিনীর জন্য। বিশেষ করে বেশিরভাগ গ্যাস ছিল বাতাসের চেয়ে ভারী। এগুলো গিয়ে বিভিন্ন জার্মান বাংকারে জমা হয়। সেখানে শুধুমাত্র যন্ত্রণাদায়ক গ্যাসের জন্য অনেকে পিছু হটতে বাধ্য হয় জার্মান বাহিনী। অন্যদিকে কিছু বিষাক্ত গ্যাস পানিতে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। অনেক প্রাণি মারা যাওয়ার পাশাপাশি পানযোগ্য পানির অভাবেও ধুঁকতে থাকে শক্তিশালী জার্মান বাহিনী। অন্যদিকে গ্যাসবোমায় আক্রান্ত হয়ে মিত্রবাহিনীরও ক্ষয়ক্ষতি কম হয়নি। অসেক ক্ষেত্রে গ্যাসবোমার লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা নির্ভর করত বায়ুপ্রবাহের ওপর। বিশেষ করে বাতাসের উল্টোদিকে

গ্যাসবোমা নিক্ষিপ্ত হলে তার থেকে নিজেদের রক্ষা করা অনেক কঠিন হয়ে যেত। পক্ষান্তরে দূর থেকে কুণ্ডলি পাকানো গ্যাসের মেঘ থেকে শত্রু পক্ষ সাবধান হয়ে যায়। তবে পরবর্তীকালে ফরাসিরা কামানের গোলায় ভরে ফসজেন গ্যাস নিক্ষেপ করা শুরু করে। এতে ক্ষতির পরিমাণ আরো বেড়ে যায়।

ইপ্রেঁর যুদ্ধ

অন্যতম আলোচিত যুদ্ধক্ষেত্র ইপ্রেঁতে পরপর তিনটি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এগুলোকে ইপ্রেঁর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুদ্ধ হিসেবে ইতিহাসে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। মহাযুদ্ধের প্রথম বছরের দীর্ঘতম এবং ভয়াবহ লড়াই হিসেবে ইপ্রেঁর প্রথম যুদ্ধের কথা বলা যেতে পারে যা ব্যাটল অব ফ্লান্ডার্স নামেও পরিচিত। এক্ষেত্রে মিত্রবাহিনীর বিজয় হলেও দু'পক্ষে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১৯১৪ সালের ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত চলা এ যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর নেতৃত্ব দেন জন ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দ ফচ। যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স মিলিয়ে মিত্রবাহিনীর লক্ষাধিক সৈন্যের প্রাণহানি ঘটে। অন্যদিকে এরিক ফন ফাকেনহায়েনের নেতৃত্বাধীন জার্মান বাহিনীর বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাদের চতুর্থ ও ষষ্ঠ আর্মি থেকে সবমিলিয়ে ১ লাখ ৩০ হাজার সৈন্যের প্রাণহানি হয়। এদিকে ১৯১৫ সালের ২২ এপ্রিল আবার লড়াই বাধে বেলজিয়ামের ইপ্রেঁ যুদ্ধক্ষেত্রে যা ২৫ মে পর্যন্ত স্থায়ী হয়। হোরেস স্মিথ ডোরেনের নেতৃত্বে মিত্রবাহিনীর ৮টি পদাতিক ডিভিশন এতে অংশ নেয় যাদের ৭০ হাজার হতাহত কিংবা নিখোঁজ হয়। অন্যদিকে জার্মানির পক্ষে ৭টি পদাতিক ডিভিশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অলব্রেচট অব ওয়ার্টেম্বার্গ যার থেকে ৩৫ হাজার সৈন্য হতাহত কিংবা নিখোঁজ হলেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ থাকে অমীমাংসিত। এদিকে ১৯১৭ সালের ৩১ জুলাই বেলজিয়ামের পশ্চিম ফ্লান্ডার্সে নতুন করে শুরু হয় ইপ্রেঁর তৃতীয় লড়াই। এতে বিশালাকার মিত্রবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন চারজন কুশলী সেনানায়ক জেনারেল ডগলাস হেইস, জেনারেল হুবার্ট গাফ, জেনারেল হার্বার্ট প্লামার ও জেনারেল আর্থার কুরি। অন্যদিকে জেনারেল ম্যাক্স ফন গ্যালউইজ ও জেনারেল এরিক লুডেনডর্ফের নেতৃত্বে অংশ নেয় শক্তিশালী জার্মান বাহিনী। শেষ পর্যন্ত মিত্রবাহিনীর ৪ লাখ ৪৮ হাজার এবং জার্মানদের ২ লাখ ৬০ হাজার হতাহত হলেও যুদ্ধের ফলাফল ছিল অমীমাংসিত।

মারনির সংঘাত

ভয়াবহ পশ্চিম রণাঙ্গনের একক বৃহত্তম যুদ্ধ হিসেবে মারনির সংঘাতের কথা বলা যেতে পারে। এই লড়াইয়ে মিত্রবাহিনীর জয়ের মধ্য দিয়ে বলতে গেলে অনেক দিক থেকে যুদ্ধে স্থবিরতা লক্ষ করা গেছে। এতে দ্রুত জয়লাভের আশা বাদ দিয়ে জার্মান বাহিনী দুই রণাঙ্গনে দীর্ঘ লড়াইয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। রুশ জেনারেল সিলাইফেনের পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনী তাদের দক্ষতার স্বাক্ষর রাখে। ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন দুজন কুশলী সেনানায়ক ফিল্ড মার্শাল স্যার জন ফ্রেঞ্চ ও জেনারেল জোসেফ জোফরে। তাঁদের নেতৃত্বে প্যারিসের মারনি নদীর তীরে প্রায় ১০ লাখ ৭০ হাজার সৈন্য সমাবেশ করে মিত্রবাহিনী। মিত্রবাহিনীকে উপযুক্ত জবাব দিতে তিনজন জার্মান সমরনায়ক জেনারেল হেলমুট ফন মোল্টকি, জেনারেল কার্ল ফন বুলো, জেনারেল আক্সান্ডার ফন ক্লাকের প্রায় ১৪ লাখ ৮৫ হাজার সৈন্য এতে জড়ো করে জার্মান বাহিনী। এতে মিত্রবাহিনীর ৩ লাখ ৬৩ হাজার সৈন্যের পাশাপাশি জার্মান পক্ষে হতাহত হয় প্রায় আড়াই লাখ সৈন্য।

গ্যালিপলির যুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংঘাত শুরু হয় তুরস্কের গ্যালিপলি উপত্যকায়। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ব্রিটিশ, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের মিলিত বাহিনীর প্রায় ১৪টি ডিভিশন সৈন্য এসে জড়ো হয় স্যার আয়ান হ্যামিল্টনের নেতৃত্বে। এদিকে তাদের প্রতিরোধ করতে অটোমান সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে জমায়েত করা হয় ঠিক ১৪ ডিভিশন সৈন্য যার নেতৃত্বের পুরোভাগে লক্ষ করা যায় মোস্তফা কামাল ও অটো লিমান ফন স্যান্ডার্সের মত দক্ষ সেনানায়ককে। ১৯১৫ সালের ১৯ ফ্রেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ১৯১৬ সালের ৯ জানুয়ারিতে শেষ হওয়ার এ দীর্ঘ সংঘাতে মিত্রবাহিনীর ২ লাখ ৫২ হাজার সৈন্য নিহত হয়। অন্যদিকে অটোমান তুর্কিরা জয়ী হলেও জীবন দিতে হয় ২ লাখ ৫৩ হাজার সৈন্যকে। বিশেষ করে ২৭ এপ্রিল তুর্কি সেনানায়ক কামাল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মিলিত বাহিনী তথা আনজাক সৈন্যদের উপকূলের দিকে তাড়িয়ে দিতে সমন্বিত হামলা চালান।

কিংবদন্তী তুর্কি সেনানায়ক মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে রাতভর যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে তুর্কিরা। অন্যদিকে ১৯ মে তে ৪২ হাজার তুর্কি সৈন্য আনজাকের ১০ হাজার অস্ট্রেলীয় ও নিউজিল্যান্ডের বাহিনীর ওপর হামলা চালায়। টর্পেডো হামলা চালিয়ে পর পর বেশ কয়েকটি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে তুর্কিরা যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্য দেখায়। তবে ক্রিমিয়ার দখল বুঝে

নিতে মিত্রবাহিনী একের পর এক হামলা চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষের অনেক সৈন্য হতাহত হলেও যুদ্ধের ফলাফল অপরিবর্তিত থাকে। এদিকে উপর্যুপরি ব্যর্থতার দায়ভার গিয়ে বর্তায় জেনারেল হ্যামিল্টনের ওপর। তাকে পরিকল্পনার ত্রুটির জন্য দোষারোপ করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে জেনারেল হ্যামিল্টনকে বরখাস্ত করে ব্রিটিশরা সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়।

দার্দানেলিসের লড়াই

গ্যালিপলির পর তুরস্কের দার্দানেলিস প্রণালির দখল নিয়ে শুরু হয় এক মরণপণ লড়াই। ১৯১৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯১৬ সালেল ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত এ ভয়াবহ সংঘাত অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত তুর্কি বাহিনী জয়লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষেই হতাহত হয় অসংখ্য। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মিত্রবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন স্যাকভাইল কার্ডেন ও জন ডি রোবেক। প্রায় ৩১টি যুদ্ধজাহাজ, ৩টি ব্যাটল ক্রুজার, ২৪টি ক্রুজার, ২৫টি ডেসট্রয়ার, ৪টি মনিটর ও ২৫টি সাবমেরিন নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে মিত্রবাহিনী। তবে প্রবল ক্ষমতাধর মিত্রবাহিনী তুর্কিদের কৌশলের কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানে। বিশেষ করে সাবমেরিন হামলায় তুর্কিদের একের পর এক সাফল্য মিত্রবাহিনীকে কোণঠাসা করে দেয়।

ভার্দুনের সংঘাত

১৯১৪ সালে যুদ্ধ শুরু হলে জার্মানরা দ্রুত জয়লাভের চেষ্টা করে নানা দিক থেকে ব্যর্থ হতে থাকে। তবে তাদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে মিত্রবাহিনীও তেমন সুবিধা করতে পারেনি। বিশ্বযুদ্ধের মূল যুদ্ধ যখন পরিখার যুদ্ধে পরিণত হয়েছে ঠিক তখনি ফ্রান্সের ভার্দুনে সংঘটিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। ১৯১৬ সালের ২১ ফ্রেব্রুয়ারি থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ মাস ধরে চলা এ সংঘাতে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় ফরাসি বাহিনী। মার্শাল ফিলিপ পেঁতা ও জেনারেল রবার্ট নিভেলির নেতৃত্বে জার্মানদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ফরাসি সৈন্যরা। জেনারেল এরিক ফন ফাকেন হায়েন প্রায় দেড় লাখ জার্মান সৈন্য নিয়ে তাদের বাধা দিতে গিয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত লক্ষাধিক জার্মান সেনার প্রাণহানি ঘটে এ সংঘাতে। পাশাপাশি আহত ও নিখোঁজ হয় আরো অনেকে।

নিভেলি অফেন্সিভ

ফরাসি সেনানায়ক জোসেফ জোফরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ফরাসি জেনারেল রবার্ট নেভেলি ঘোষণা করেন মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় জার্মানদের বিধ্বস্ত করা হবে। তাঁর নামানুসারে এ লড়াইকে নিভেলি অফেন্সিভ বলা হয়। ফ্রান্সের পক্ষে তিনিসহ নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল চার্লস মানগিন, জেনারেল ফ্রাঁসোয়া অ্যান্থনি ও জেনারেল মাজেন। ১২ লাখ ৭ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে হামলা চালিয়ে সেখান থেকে ১ লাখ ৮৭ হাজার সৈন্য হারায় ফ্রান্স। অন্যদিকে জার্মান পক্ষে জেনারেল ফন বোহেন ও জেনারেল ফ্রিটজ ফন বুলোর নেতৃত্বাধীন ১০ লক্ষ সৈন্যের বাহিনী থেকে নিহত হয় ১ লাখ ৬৮ হাজার। আইসনি নদী উপত্যকায় চলা এ সংঘাতে জেনারেল নিভেলি শেষ পর্যন্ত তার কথা রাখতে পারেননি। ফলে এ যুদ্ধে জার্মানদের কৌশলগত বিজয়ের কথা ধরে নেয়া যেতেই পারে। ফরাসি যুদ্ধমন্ত্রী হুবার্ট লাইটি, চিফ অব স্টাফ জেনারেল হেনরি ফিলিপ পেঁতা এবং ব্রিটিশ কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল ডগলাস হেইগ নিভেলির এ পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন শুরু থেকেই। তাদের আপত্তি সত্ত্বেও ফরাসি প্রধানমন্ত্রী অ্যারিস্টাইড ব্রায়ান্ড এ পরিকল্পনা অনুমোদন করলে ক্ষোভে পদত্যাগ করেন যুদ্ধমন্ত্রী হুবার্ট লাইটি।

ব্যাটল অব সোম

ফ্রান্সের পিকার্ডির সোম অঞ্চলে ১৯১৬ সালের ১ জুলাই থেকে শুরু হয় এক প্রাণঘাতী সংঘাত যা ১৯১৭ সালের ১৮ জুলাই পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল অমীমাংসিত থাকলেও দু'পক্ষেই প্রচুর হতাহত হয়। ম্যাক্স ফন গ্যালউইজ ও ফ্রিটজ ফন বুলোর নেতৃত্বাধীন জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা। এক্ষেত্রে মিত্রবাহিনীর পক্ষে যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স ও নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের সৈন্যরা জড়ো হয় ডগলাস হেউগ ও ফার্দিন্যান্দ ফচের নেতৃত্বে। চূড়ান্ত পর্যায়ে ৫০ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে লড়তে থাকা জার্মানদের পক্ষে এ যুদ্ধে মারা যায় ৪ লাখ ৬৫ হাজার সৈন্য। অন্যদিকে ৫১ ডিভিশন মিত্রবাহিনীর সৈন্য থেকে হতাহত হয় সাড়ে ছয় লাখের মত। মিত্রবাহিনীর অনেকগুলো বিমান ও শক্তিশালী ট্যাংকও ধ্বংস হয় এ যুদ্ধে।

ভিমি রিজের লড়াই

ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ভিমি ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনের অন্যতম সুরক্ষিত স্থান। এটাকে অনেকটা দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে মনে করা হত। ১৯১৭ সালের ৯ থেকে ১২ এপ্রিল এ তিন দিন এখানে চলে ভয়াবহ সংঘর্ষ। জার্মান বাহিনীর পক্ষ থেকেও এখানে

শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে দেখা যায়। তারা সুড়ঙ্গ, কাঁটাতারের বেড়া, তিন স্তরের পরিখা, প্রচুর কামানের প্রহরার পাশাপাশি অগণিত মেশিনগান পয়েন্ট স্থাপন করে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করেছিল। এর আগে পাহাড়টির দখল নিতে গিয়ে ব্রিটিশরা হাজার হাজার সৈন্য খুইয়েছিল। ১৯১৫ সালের লড়াইয়ে সেখানে ফরাসি সৈন্যরাই মারা যায় দেড় লাখের মত। এবার কানাডা ও যুক্তরাজ্যের বাহিনী সম্মিলিতভাবে জেনারেল জুলিয়ান বায়ানগ ও জেনারেল আর্থার কুরির নেতৃত্বে আক্রমণ চলায়। তাদের ৩০ হাজার সৈন্য থেকে ৩৫৮৯ জন নিহত হলেও যুদ্ধের ফলাফল তাদের পক্ষেই যায়। জার্মানি প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের ২০ হাজার সৈন্য নিহত হয়। এক্ষেত্রে কানাডার ৯টি প্রদেশের প্রত্যেকটি স্থান থেকে সৈন্যরা দিয়ে ভিমি রিজের দখলযুদ্ধে অংশ নেয়।

জুটল্যান্ড রণাঙ্গন

উত্তর সাগরের জুটল্যান্ড রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর মুখোমুখি হয় ব্রিটিশ-আইরিশ যৌথ বাহিনীর একটি দল। ১৯১৬ সালের ৩১ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত চলতে থাকা এ যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কৌশলগত বিজয় লক্ষ করা যায় জার্মান বাহিনীর। স্যার জন জোলিকোয়ি ও স্যার ডেভিড বিটির নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী নিয়ে সমবেত হয় ইঙ্গো-আইরিশ সেনারা। তাদের সাথে ২৮টি যুদ্ধজাহাজ, ৮ টি ব্যাটল ক্রুজার, ৮টি সাঁজোয়া ক্রুজার, ২৬টি হালকা ক্রুজার ও ৭৮টি ডেস্ট্রয়ার ছিল। এদিকে ১৬টি যুদ্ধজাহাজ, ৫টি ব্যাটল ক্রুজার ড্রিডনট, ১১টি হালকা ক্রুজার ও ৬১টির মত টর্পোডো বোট নিয়ে রেইনহার্ড শীয়ার ও ফ্রাঞ্চ ফন হিপারের নেতৃত্বে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে জার্মানরা। তবে এবারের যুদ্ধে জার্মান ইউবোটকে অকার্যকর রাখাটাই ছিল ব্রিটিশ বাহিনীর বড় কৃতিত্ব।

ককেশাসের যুদ্ধ

একেবারে শুরু থেকে শেষ অর্থাৎ ১৯১৪ সাল হতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ককেশাসের দখল নিয়ে লড়াই চলতে থাকে রুশ ও অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে। পূর্বাঞ্চলীয় আনাতোলিয়ার এ স্থান কৌশলগতভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় রুশ ও তুর্কি বাহিনীর কেউই ছাড় দিতে চায়নি। ফলে তুরস্কের জেনারেল আনোয়ার পাশা, জেনারেল করিম পাশা, জেনারেল মোস্তফা কামাল ও জেনারেল কাজিম কারাবাকির নেতৃত্বে অটোমান বাহিনী তুমুল লড়াই জমিয়ে রাখে শেষ পর্যন্ত। এদিকে বেশ কয়েকজন সেনানায়ক যেমন জেনারেল আইভানোভিচ ভরন্তসভ দাসখব, জেনারেল নিকোলাই ইউদেনিস, জেনারেল আন্দ্রানিক ওজানিয়ান, জেনারেল দ্রাস্তামাত কানায়ান, জেনারেল নাজদেহ, জেনারেল মোভসেজ সিলিকায়েন, ক্রেস ফন কেসেনস্টোইন, জেনারেল লিওনেল দুনস্তারভিল প্রমুখের নেতৃত্বে রুশ সাম্রাজ্য আর্মেনিয়ার লড়াই চলতে থাকে। দীর্ঘ যুদ্ধে দু'পক্ষের প্রচুর হতাহত হলেও কোনো পক্ষই বড় বিজয় অর্জন করতে পারেনি।

সিনাই-ফিলিস্তিনের পথে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পশ্চিম ও পূর্ব রণাঙ্গনের মত মধ্যপ্রাচ্য রণাঙ্গনেও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। ১৯১৫ সালের ২৮ জানুয়ারি থেকে ১৯১৮ সালের ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত সিনাই উপদ্বীপ, ফিলিস্তিন ও সিরিয়াতে তুমুল লড়াই চলে। যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী জয়লাভ করলেও অটোমান তুর্কিদের পাশাপাশি জার্মান বাহিনী ছেড়ে কথা বলেনি। স্যার জন ম্যাক্সওয়েল, আর্চিবল্ড মুরে, হেনরি, জর্জ চাউভেল, ফিলিপ চেটউট, চার্লস ডোবেল ও এডমন্ড অ্যালেনবাইয়ের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বাহিনী আক্রমণ করে সিনাই উপত্যকা। তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন জামাল পাশা, ক্রেস ফন ক্রেসেনস্টেইন, জাদির বে, তালা বে, এরিক ফন ফাকেনহায়েন ও অটো লিমান ফন স্যান্ডার্সের নেতৃত্বাধীন তুরস্ক ও জার্মানির মিলিত বাহিনী। তুর্কি নৌমন্ত্রী জামাল পাশার নেতৃত্বে অটোমান বাহিনী সুয়েজ খালের প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত ছিল। পানি ও রাস্তাঘাটবিহীন সিনাইয়ের ফাঁকা উপত্যকা পাড়ি দেয়া যেকোনো সেনাবাহিনীর জন্য এককথায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু ক্রেস ফন ক্রেসেনস্টেইন এই মরুভূমি পাড়ি দিয়ে তুর্কি বাহিনীর কাছে রসদ পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত মিসরে নিযুক্ত ব্রিটিশ বাহিনীকে অটোমান তুর্কিদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিন অভিযানে নির্দেশ দেয়া হয়। এদিকে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানদের স্প্রিং অফেন্সিভ শুরু হলে সিরিয়ায় হামলার পরিকল্পনা কয়েক মাস পিছিয়ে দেয় মিত্রবাহিনী।

কুত অবরোধ

মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে অটোমান তুর্কিদের বিজয় অভিযান হিসেবে কুত অবরোধের কথা বলা যেতে পারে। ব্রিটিশ ভারতের সৈন্যসহ ব্রিটেনের সেনাবাহিনীর ৩০ হাজার সৈন্যের নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল টাউনশেন্ড যার ২৩ হাজার এ যুদ্ধে হতাহত হয়। অন্যদিকে তুর্কি বাহিনীর ৫০ হাজার সৈন্যের নেতৃত্বে ছিলেন ব্যারন ফন ডার গোলটাজ ও খলিল পাশা। শেষ পর্যন্ত তুর্কি

বাহিনীর ১০ হাজার সৈন্য নিহত হলেও কুল আল-আমারা মেসোপটেমিয়া তথা বর্তমান ইরাকের কাছাকাছি সংঘটিত এ লড়াইয়ে জয়লাভ করে অটোমান তুর্কিরাই। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ জেমস মরিস কুতের যুদ্ধে পরাজয়কে তাদের ইতিহাসে একটি ন্যক্কারজনক আত্মসমর্পণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ম্যাগিদোর সংঘাত

১৯১৭ সালের শেষদিকে জেরুজালেম দখল করেও স্বস্তি মেলেনি মিত্রবাহিনীর নেতা জেনারেল এডমান্ড অ্যালেনবাইয়ের। ঠিক এসময়ে জার্মানরা স্প্রিং অফেন্সিভ শুরু করে পশ্চিম রণাঙ্গনে আতঙ্কের জন্ম দেয়। সেখানে মিত্রবাহিনী নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। জেরুজালেম থেকে কয়েক ইউনিট সৈন্য সরিয়ে সেখানে শক্তিবৃদ্ধি করা হলে এদিকে দুর্বলতা দেখা দেয়। এদিকে তার ট্যাংক বাহিনীকেও পাঠিয়ে দেয়া হয় ফ্রান্সের রণাঙ্গনে। বলতে গেলে নানা দিক থেকে কোণঠাসা অবস্থায় পড়েও অ্যালেনবাই জর্দার নদীর দখল নিতে মরিয়া হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের ম্যাগিদোতে ১৯১৮ সালের ১৯ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ঘটে তুমুল সংঘাত। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত ও আরব বিদ্রোহীদের সে বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল এডমান্ড অ্যালেনবাই। ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ৫৭ হাজার পদাতিক সৈন্যের পাশাপাশি ৫৪০টি কামান নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে তারা। শেষ পর্যন্ত তুর্কি বাহিনী তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

জেরুজালেমের যুদ্ধ

মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদি এ তিন ধর্মের কাছে পবিত্র ঐতিহ্যবাহী নগরী জেরুজালেমের দখল নিয়ে ১৯১৭ সালের ৮-২৬ ডিসেম্বর তুমুল যুদ্ধ চলে। এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মিশরীয় এক্সপিডিশনারি ফোর্সের সৈন্যরা জেনারেল এডমন্ড অ্যালেনবাইয়ের নেতৃত্বে আক্রমণ করে ফিলিস্তিনের জেরুজালেম অঞ্চল। তাদের প্রতিরোধে জেনারেল এরিক ফন ফাকেন হায়েনের সপ্তম আর্মি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশদের পক্ষে ১৮ হাজার হতাহতের বিপরীতে তুর্কি সৈন্যদের মধ্যে ২৫ হাজার সৈন্য নিহত হয়। তবে অবাক করার বিষয় হচ্ছে উভয় পক্ষ প্রথমে পবিত্র এ নগরীর মর্যাদা রক্ষার শপথ নিলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা শপথ ভঙ্গ করে জয়লাভের জন্য নগরীর আশে পাশেও লড়াই চালিয়ে যায়।

স্প্রিং অফেন্সিভ

মর্কিন বাহিনী এসে পৌঁছে গেলে তাদের বিশাল বহরের সামনে জার্মানদের টিকে থাকার আর কোনো সম্ভাবনা নেই জেনেই লড়াইয়ের শেষ চেষ্টা হিসেবে চালানো হয় স্প্রিং অফেন্সিভ। জেনারেল লুডেনডর্ফের বাহিনী ১৯১৮ সালে পশ্চিম রণাঙ্গনে এক ব্যাপক অভিযান শুরু করে। ২১ মার্চ ব্রিটিশ বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে জার্মানরা ৬০ কিলোমিটার এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বলতে গেলে ১৯১৪ সালের পর এটাই তাদের প্রথম সাফল্য। এক্ষেত্রে পদাতিক বাহিনী হুঁশিয়ার কৌশলে এগিয়ে যেতে থাকে। তারা শত্রুর এগিয়ে আসা বাহিনীগুলোকে ছত্রখান করে দিতে স্টর্মস্ট্রুপার গঠন করে। অন্যদিকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল গিওর্গ ব্রুচমুলার ফিউয়ারভালজি কৌশলে গোলন্দাজ বাহিনীকে পরিচালনা করেন। তাদের কার্যকর ও পরিমিত গোলাবর্ষণে শত্রু কমান্ড ধ্বংস হয়। পাশাপাশি এর মাধ্যমে খুব সহজে শত্রুর অগ্রবর্তী ইউনিটগুলোর গতিরোধ করে তাদের কমান্ড ও লজিস্টিক এরিয়াগুলোর দখল নেয়া সম্ভব হয়। এভাবে জার্মান বাহিনী প্যারিসের ১২০ কিলোমিটার ভিতরে চলে গিয়ে তিনটি ভারী সুপার ক্রুপ রেলওয়ে গান থেকে এক প্যারিসেই ১৮৩ টি গোলা নিক্ষেপ করে। লোকজন প্যারিস থেকে পালাতে শুরু করে উচ্ছ্বসিত কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম ২৪ মার্চ জাতীয় ছুটি ঘোষণা করেন। তবে মিত্রবাহিনীর প্রবল প্রতিরোধ জার্মানদের সব চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ করে দেয়। তারা বিভিন্ন স্থান থেকে সৈন্য এনে পশ্চিম রণাঙ্গনে নিজেদের অবস্থান আরো শক্তিশালী করে। অন্যদিকে ট্যাংক ও মোটরচালিত আর্টিলারি ফোর্সের ঘাটতি জার্মানদের অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে দেয়নি।

মিত্রবাহিনীর জয়লাভ

জার্মানির দুর্নিবার আক্রমণে অপারেশন মিচেল, জর্জেটি এবং ব্লুচার ইয়র্ক শিরোনামে শেষ হয় স্প্রিং অফেন্সিভ। প্রথম দিকে আশাতীত সাফল্য পেলেও শেষ পর্যন্ত তারা সাফল্য ধরে রাখতে পারেনি। তারপর ১৯১৮ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎ আসতে না আসতেই মিত্রবাহিনী নানা স্থানে জার্মানদের ওপর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে শুরু করে। বিশেষ করে মার্কিন সৈন্যরা রণাঙ্গনে পা রাখতেই যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন শুরু করে। নানা স্থানে এগিয়ে থাকা জার্মান সৈন্যরাও এবার ধীরে ধীরে পিছু হটতে থাকে। এতদিন মিত্রবাহিনী সহযোগী হিসেবে থাকা মার্কিনরা সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে পা রেখে ফলাফল ভিন্নদিকে ঘুরিয়ে দেয়। ১৯১৭ সালের ৬ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন সরাসরি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। একইভাবে জার্মানির সাথে বন্ধুত্ব ধরে রাখায় ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রো-হাঙ্গেরির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে।

জার্মানি মনে করেছিল তাদের ইউবোট মার্কিন বাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধ করে দেবে। অন্যদিকে স্প্রিং অফেন্সিভের মাধ্যমে তারা দ্রুত জয়লাভের যে স্বপ্ন দেখেছিল সেটাও আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসতে শুরু করে। আর এমনি পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী সরাসরি মিত্রবাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে ১৯১৮ সালের ৮ আগস্ট হান্ড্রেড ডেজ অফেন্সিভ শিরোনামে শুরু করে পাল্টা অভিযান। মার্শাল ফচের সুদক্ষ অভিযান জার্মানির গড়ে তোলা হিন্দেনবার্গ লাইনকে ছত্রখান করে দেয়। জার্মান ইউবোটগুলোকে আগেই প্রতিরোধ করেছিল বিশেষ মার্কিন নৌ ব্যবস্থা। মিত্রবাহিনী সার্বিয়া দখল করে নিলে ৩০ সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়া শান্তিচুক্তিতে সই করে। এর একদিন পরেই ৩১ অক্টোবর যুদ্ধবিরতিতে বাধ্য হন তুর্কি সুলতান। একইভাবে ইতালির যুদ্ধ পরাজিত হয়ে ৩ নভেম্বরেই শান্তিচুক্তিতে সম্মত হয়েছিল অস্ট্রিয়া। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের পাশাপাশি মিত্রবাহিনীর সুগঠিত আক্রমণ দেখে কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম হল্যান্ডে পালিয়ে যান। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর জার্মানির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মিত্রবাহিনীর চূড়ান্ত বিজয় সম্পন্ন হয়।

অস্ত্র সমর্পণ

প্রচুর আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি ৩৫ লাখ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করা জার্মানির সৈন্যসংখ্যা ২৫ লাখে এসে দাঁড়ায়। ১০ লক্ষাধিক সৈন্য হারিয়ে অনেক দিক থেকেই দুর্বল হয়ে পড়ে জার্মানরা। এসময় মিত্রবাহিনীর সাথে সাথে তাদের সহযোগী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা সরাসরি মাঠে নামলে পরিস্থিতি জার্মানির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় । রণাঙ্গনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জার্মান সৈন্যরা প্রতিপক্ষের বহুমুখী আক্রমণ ও কূট কৌশলের পাশাপাশি একটি বৈশ্বিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একা একা লড়াই করে শেষ পর্যন্ত টিকতে পারেনি। জনমত থেকে শুরু করে সবকিছু তাদের বিরুদ্ধে চলে গেলে ১৯১৮ সালের ৩ অক্টোবর যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয় জার্মানি। তবে পুরোটা সময় বীরত্বের সাথে লড়াই করে শেষ পর্যায়ে এসে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে রাজি না হয়ে বরং ২৬ অক্টোবর পদত্যাগ করেন জেনারেল লুডেনডর্ফ। এদিকে কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম দেশ ছেড়ে হল্যান্ড পালিয়ে গেলে সিংহাসনে বসেন প্রিন্স ম্যাক্স। এ অবস্থায় ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর কম্পেইনের বনাঞ্চলে একটি রেলওয়ের বগিতে স্বাক্ষরিত হয় জার্মান-মিত্রবাহিনী অস্ত্রবিরতি চুক্তি। বলতে গেলে এর মধ্যে দিয়েই অবসান হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের।

পাঠ- ৩.৫ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের সীমানা ছাড়িয়ে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এসে আছড়ে পড়েছিল উত্তাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও হত্যাযজ্ঞের ঢেউ। ১৯১৪-১৯১৮ মাত্র চারটি বছরের যুদ্ধ, কেড়ে নেয় প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষের প্রাণ। নেভাল অপারেশন ইন দার্দানেলিস, ব্যাটেল অব ভার্দুন, নিভেলি অফেন্সিব, ব্যাটল অব সোমে, ব্যাটল অব ভিমি রিজ, ব্যাটল অব জুটল্যান্ড, ব্যাটল অব ককেশাস, আর্মেনিয়ার হত্যাকাণ্ড, ফিলিস্তিন ও সিনাই উপত্যকা অভিযান, কুত অবরোধ, জেরুজালেম ও ম্যাগিদোর যুদ্ধ শেষে মিত্রবাহিনীর বিজয় সম্ভব হয়। জার্মানিকে বাধ্যতামূলক অস্ত্রবিরতিতে পাঠানোর পর বসে প্যারিস শান্তি সম্মেলন। এরপর ট্রায়ানন, সেভার্স, লাউসেন, কিংবা অপমানজনক ভার্সাই চুক্তির মধ্য দিয়ে অনেক পেছন থেকে 'ছুরিকাঘাত' করা হয় জার্মানিকে। যুদ্ধের প্রধান কিছু ফলাফল হিসেবে বলা যেতে পারে–

১. **সীমাহীন প্রাণহানি :** বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে হওয়া যুদ্ধে নিহত সৈন্যসংখ্যা ছিল ৯০ লাখের কাছাকাছি। তেমনি একে বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছিল ৭০ লাখের উপর। তবে এখানে সামরিক বলতে যেসব মানুষের হিসেব দেয়া হয়েছে তাদের অনেকেই ছিল বেসামরিক মানুষ। যুদ্ধ শুরু হলে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের ঠেলে দেয়া হয়েছে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। বিশেষ করে পশ্চিম রণাঙ্গনে লড়তে গিয়ে এমনিভাবে জীবন দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এ যুদ্ধে রাশিয়ার ৩৭,০০,০০০; জার্মানি ২৫,৩৩,৭০০; অটোমান সাম্রাজ্য ২৪,৭৫,০০০; অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ১৫,০০,০০০; ফ্রান্স ১৪,১৫,৮০০; ব্রিটেন ৭,৩৩,৬৩৩; রুমানিয়া ৬,১০,৭০৬; ইতালি ৬,৫০,০০০; এবং যুক্তরাষ্ট্রের ১,২৬,০০০ সৈন্য হতাহত হয় বলে অনুমান করা যায়।

২. **মনোদৈহিক প্রতিবন্ধকতা :** বিশ্বযুদ্ধের ফলে লক্ষ লক্ষ যুবকের প্রাণহানির পাশাপাশি আহত হয়েছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক। এ আহত জনগোষ্ঠী তাদের উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। বিশেষ করে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে ঘুরে দাঁড়াতে গেলে যতটা সুস্থ জনগোষ্ঠী থাকা প্রয়োজন ইউরোপের বেশিরভাগ দেশের সে সক্ষমতা ছিল না। কারণ বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদান ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ তাদের হয়ত নিহত নয়ত আহত করেছিল। শেষ পর্যন্ত এ অবস্থান রাষ্ট্রগুলোর জন্য মহাবিপর্যয় ডেকে আনে।

৩. **রাজতন্ত্রের পতন :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। উদাহরণ হিসেবে রাশিয়ার রোমানভ বংশীয় জার, জার্মানির হোহেনজোলার্ন বংশীয় কাইজার, তুরস্কের উসমানীয় খিলাফত এবং অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ রাজবংশের পতন ঘটে। রাশিয়ার শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাস পদত্যাগ করেন। জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করতে চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে নতুন করে গড়ে উঠতে দেখা যায় প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো।

৪. **উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বিশ্বের নানা দেশে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মানুষকে এতোদিন বিশ্বযুদ্ধের ভয় দেখিয়ে চুপ রাখা গিয়েছিল। এবার বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতেই তারা ইউরোপের নানা দেশের ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলোয় আন্দোলন শুরু করে। এভাবে অনেকগুলো উপনিবেশ স্বাধীনও হয়ে গেছে।

৫. **জাতীয় রাষ্ট্র গঠন :** পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে রাষ্ট্রচিন্তার যে বিকাশ ঘটেছিল এটা তার বিস্তৃত রূপ। প্রথম দিকের রাষ্ট্র ছিল ধারনাগত, আর এবারের রাষ্ট্র একটি বাহ্যিক কাঠামো লাভ করে। তবে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্ব হিসেবে পিছিয়ে যেতে হয় আরো কয়েকশ বছর। এক্ষেত্রে জাতীয় রাষ্ট্র বিকাশের চূড়ান্ত স্তর হিসেব গণ্য করা যেতে পারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালকে।

৬. **ব্রিটিশ-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল তারই ফলাফল হিসেবে শুরু হয় ভারতের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এরপর থেকে দীর্ঘ আন্দোলন চালিয়ে স্বাধীন করে উপমহাদেশকে।

৭. **সামাজিক পরিবর্তন :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ রাজনৈতিক কাঠামোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। এসময় রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

৮. **জাতিপুঞ্জের উদ্ভব :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অগণিত মানুষের প্রাণহানি অনেককে বিচলিত করে। এসময় যুদ্ধের ভয়াবহতা এড়াতে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন পেশ করেছিলেন ১৪ দফা ঘোষণা। এর ওপর ভিত্তি করে পরে গড়ে ওঠে লীগ অব নেশন তথা জাতিপুঞ্জ।

৯. **একনায়কতন্ত্রের উত্থান :** অপমানজনক ভার্সাই চুক্তি মেনে নেয়া কোনো বোধশক্তিসম্পন্ন জার্মান নাগরিকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বলতে গেলে এ চুক্তিই পরবর্তীকালে একনায়কনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিশ্বকে আরেকটি মহাযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়।

১০. **জার্মানির অবরোধ :** যুদ্ধে বিজয়ী শক্তিগুলো নানাদিক থেকে জার্মানির ওপর অবরোধ আরোপ করে তাকে কোণঠাসা করে রাখতে চাইছিল। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকেই মিত্রবাহিনীর দেশগুলো এ চেষ্টায় লিপ্ত হয়।

১১. **প্রতিশোধ গ্রহণ :** ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্স জার্মানির সাথে বহু বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে এমন অনেকগুলো চুক্তি জার্মানির ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় যা অনেকটাই বিদ্বেষমূলক ও অনৈতিক।

১২. **মহামারী :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য বিভিন্ন স্থানে গ্যাসবোমা হামলা করে মিত্রবাহিনীর পাশাপাশি জার্মানরাও। বিষাক্ত গ্যাস নানা স্থানে ছড়িয়ে পরে সৃষ্টি করে নানা রোগের উপসর্গ। অনেক এলাকায় এসময় ক্লোরিনের বিষক্রিয়া নানা রোগের পাশাপাশি মহামারী আকারে ইনফ্লুয়েঞ্জা ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

১৩. **খাদ্যসংকট :** যুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন স্থানে পরিখা খনন থেকে শুরু করে সৈন্য বাহিনী এগিয়ে নিতে গিয়ে বিনষ্ট করা হয় মাইলের পর মাইল শস্যক্ষেত। অন্যদিকে নানা স্থানের কৃষক কৃষিকাজ বাদ দিয়ে বাধ্যতামূলক যুদ্ধে যোগদান করে। তাদের বাদ পড়ায় কৃষি উৎপাদন অনেকাংশে কমে যায়। এর প্রভাবে যুদ্ধশেষে চরম খাদ্য সংকট দেখা দেয় বিশ্বের নানা দেশে।

পাঠ- ৩.৬ ভার্সাই সন্ধিচুক্তি

প্যারিসের অদূরে অবস্থিত ভার্সাই নগরীতে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন জার্মানির ওপর কিছু অনৈতিক শর্ত চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে শেষ হয় ভার্সাই চুক্তি। ফ্রান্সের কম্পেইনের বনাঞ্চলে ট্রেনের বগিতে বসে করা অস্ত্রবিরতি চুক্তির পরবর্তী ধাপ হিসেবে করা হয় এই চুক্তি। এর মাধ্যমে মিত্রবাহিনীর সাথে দীর্ঘ চার বছর ভয়াবহ যুদ্ধের কড়ায় গণ্ডায় জার্মানির কাছ থেকে উসুল করা হয়। অনেকগুলো ধারার এ চুক্তিতে উল্লিখিত ২৩১-২৪৭ ধারার আওতায় জার্মানিকে যুদ্ধ শুরু থেকে আনুষঙ্গিক সব দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। তারা ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে তাদের বিশাল ভূখণ্ড থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ মিত্রবাহিনীর অনুকূলে ছেড়ে দেয়। বিশেষ করে পশ্চিম রণাঙ্গনে নিজেদের ক্ষতি মিটিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন ফরাসি মন্ত্রী ক্লিমেনশঁ। তাঁর দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে ভার্সাই চুক্তির শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হয় অনেকগুলো অবাস্তব ধারা। যার মধ্যে ছিল–

১. জার্মানির সব ধরনের সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা।
২. ফরাসি সার্বভৌমত্ব ও আধিপত্য পুরোপুরি স্বীকার করে নেয়া।
৩. জার্মান নিয়ন্ত্রিত টনডার্ন শহরের পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলীয় স্লেসউইগ ডেনমার্কের অধীনে ছেড়ে দেয়া।
৪. পোজেন ও পশ্চিম প্রুশিয়ার পোমেরানিয়া নবগঠিত পোল্যান্ডের কাছে ছেড়ে দিতে হবে।
৫. উচ্চ সাইলেশিয়ার হাল্টশিন হালসিজিন এলাকা চেকশ্লোভাকিয়ার কাছে হস্তান্তর।
৬. গণভোট সাপেক্ষে সাইলেশিয়ার পূর্বাংশকেও পোলান্ডের অনুকূলে ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকা।
৭. ইউপেন ও মালমেডির মত সমৃদ্ধ জার্মান শহরকে বেলজিয়ামের কাছে হস্তান্তর করা।
৮. পূর্ব প্রুশিয়ার সোলডাউ এলাকা পোল্যান্ডকে ছেড়ে দেয়া।
৯. পূর্ব প্রুশিয়ার মামেলল্যান্ডকে লিথুয়ানিয়ার আনুকূল্যে ত্যাগ করা।
১০. ওয়ার্মিয়াও মাসুরিয়ার নিয়ন্ত্রণ পোল্যান্ডকে ফিরিয়ে দেয়া।
১১. ডানজিগ বন্দরকে উন্মুক্ত নগরী ঘোষণা করা যা জাতিপুঞ্জের অধীনে থাকবে।
১২. চীনের শানদং (Shandong) থেকে জার্মানির নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেয়া।

ফ্রান্সের দীর্ঘদিনের জমিয়ে রাখা ক্ষোভ প্রশমনে জার্মানিকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। পাশাপাশি রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, ঔপনিবেশিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, প্রতিটি ক্ষেত্রে এ চুক্তি জার্মানিকে হেয়প্রতিপন্ন করে। বিশেষ করে সম্পূর্ণভাবে চাপিয়ে দেয়া এ চুক্তির কিছু শর্ত এমন ছিল যা জার্মানির মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হতে প্রণোদিত করেছিল। সন্ধি বলতে দু'পক্ষে মতামতের যে প্রতিফলন ঘটার কথা তার বিন্দু-বিসর্গও এখানে উপস্থিত ছিল না। উপরন্তু মিত্র শক্তির নানা দেশ থেকে জার্মানির ওপর তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার একটি প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। চুক্তির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে–

১. **রাজনৈতিক হেয়করন :** ভার্সাই চুক্তি রাজনৈতিক দিক থেকে জার্মানিকে ছত্রখান করে দেয়। এ চুক্তির পর নতুন করে তৈরি খণ্ড-বিখণ্ড মানচিত্রে একত্রীভূত জার্মানির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দায়। তাদের পশ্চিম সীমান্তে ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা প্রাচীন নির্মাণে দখল করা হয়েছে বেশ খানিকটা ভূখণ্ড। উত্তর সীমান্ত থেকে অনেকটাই চলে গেছে ড্যানিশদের দখলে। পূর্ব সীমান্তের ভেতরে ঢুকে পড়েছে নবগঠিত পোল্যান্ড। ইউপেন, মরিসনেট ও ম্যালমেডি অঞ্চলের ওপর জার্মানির বদলে বেলজিয়ামের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। চুক্তির প্রথম দিকের শর্ত অনুযায়িই আলসেস ও লোরেনের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে ফরাসিরা। সবমিলিয়ে রাতারাতি বদলে দেয়া হয় ইউরোপের মানচিত্র।

২. **সামরিক অপদস্তকরণ :** পরাজিত জার্মানির সামরিক শক্তিকেও মিত্রবাহিনী কতটা ভয় করত ভার্সাই চুক্তির শর্ত থেকে তা বোঝা যায়। এ চুক্তির আওতায় জার্মানির স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। জার্মান বাহিনীর উচ্চপদস্থ ও গুরুত্বপূর্ণ সেনা কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়। ভবিষ্যতে জার্মানির ভূখণ্ডে সব ধরনের অস্ত্র কারখানা নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। জার্মানির সবগুলো উন্নত যুদ্ধজাহাজকে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর হাতে তুলে দিতে হয়।

৩. **বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অবরোধ :** রাজনৈতিকভাবে জার্মানিকে হেয় প্রতিপন্ন করার সাথে সাথে মিত্রবাহিনী তাদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য খাতে ধ্বস নামাতে চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত জোরপূর্বক তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া

হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতির ব্যয়ভার বহন করতে জার্মানিকে বাধ্য করা হয়। বিশেষ কমিশন গঠন করে ক্ষতিপূরণ আদায়ের পাশাপাশি জার্মানির রাইন নদীপথকে আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জার্মানির বাজার উন্মুক্ত করে সেখানে মিত্রবাহিনীর দেশগুলোর পণ্যের অবাধ বিক্রি নিশ্চিত করা হয়। মিত্রবাহিনীর দেশগুলো জার্মানি থেকে জ্বালানি রপ্তানি শুরু করে। পরিকল্পিতভাবে জার্মানির সব ধরনের শিল্প ধ্বংস করা হয়। সেখানে উৎপাদিত কাঁচামাল দিয়ে সেখানে কারখানা প্রতিষ্ঠা না করে অন্য দেশে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে জার্মানির অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়ার ষড়যন্ত্র বাস্তবে রূপ দেয় মিত্রবাহিনী যা অনেক আগে থেকে পরিকল্পিত ছিল।

৪. **মিত্রবাহিনীর অধীনে জার্মানির উপনিবেশ :** ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মত বিশ্বের নানা এলাকায় জার্মানিরও উপনিবেশ ছিল। এবারে চুক্তি করে মিত্রবাহিনীর দেশগুলো সেসব উপনিবেশ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বটোয়ারা করে নেয়া। পাশাপাশি তারা নিয়ম বেঁধে দেয় এরপর আফ্রিকা, এশিয়া কিংবা আমেরিকার কোনো স্থানে জার্মান উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ নেই।

৫. **যাতায়াত ও পরিবহন :** জার্মানির রেল ইঞ্জিন থেকে শুরু করে উন্নত ধরনের সব যানবাহনের ওপর ভাগ বসায় মিত্রবাহিনী। তারা শক্তিশালী ট্রাকের ইঞ্জিনগুলো পর্যন্ত জার্মান থেকে নিয়ে যায় নিজেদের দেশে। বিভিন্ন স্থানে নতুন করে রাস্তা নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। অনেকগুলো ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতু মেরামতের ওপর পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এক্ষেত্রে।

৬. **বিচার আচার :** মিত্রবাহিনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য পুরোপুরি দায়ী করে জার্মানিকে। এজন্য তারা জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ও তার সেনাপতিদের দোষী সাব্যস্ত করে বিচারের দাবি জানায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধরত শক্তিমান জেনারেলদের নামও বেশ ক্ষোভের সাথে উচ্চারণ করা হয়।

৭. **জাতিপুঞ্জ :** বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের ঘোষণার অনুরূপ শর্তসাপেক্ষে একটি জাতিপুঞ্জ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধবাজ নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কথা জানানো হলেও মূলত জার্মানিতে আরো বড় রকমের চাপে রাখার কৌশল ছিল এটি।

৮. **আন্তর্জাতিক আদালত :** ভার্সাই সন্ধির মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। এ আদালতের মাধ্যমে গণহত্যার মত অপরাধের বিচার হওয়ার কথা দাবি করে মিত্রবাহিনীর বিভিন্ন দেশ। বলতে গেলে সবদিক থেকে জার্মানিকে চেপে ধরার অন্যতম চেষ্টা এটিও।

৯. **ঐতিহাসিক প্রতিশোধ :** ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মিরর হলে। এখানেই পরাজিত জার্মানদের ওপর জোরপূর্বক চুক্তির শর্ত চাপিয়ে দিয়ে ১৮৭০ সালের প্রতিশোধ নেয় ফরাসিরা। এই হলেই জার্মান নেতা বিসমার্ক বন্দি ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেছিলেন। অন্যদিকে হিংস্রতার সাথে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জার্মানির জনগণ বলছে তারা সই করবে না, তাদের পত্রিকাগুলোও বলছে সই না করতে, তাদের রাজনীতিবিদদের কণ্ঠেও একই সুর। তবে আমরা বলছি যদি ভদ্রলোকের সন্তান হয়ে থাকেন আসুন এবং সই করে যান, নাহলে আপনাদের ঘাড় ধরে সই করিয়ে নিতে আমাদেরই বার্লিন আসতে হবে।'

১০. **প্রতিবাদের শুরু :** জার্মান জাতীয়তাবাদী লেখকগণ শুরু থেকেই ভার্সাই চুক্তিকে ঘৃণ্য, বর্বর ও জবরদস্তিমূলক অনাচার হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে ভুল করেননি। এ চুক্তিই হয়ত ভবিষ্যতে ক্ষুব্ধ জার্মানিকে তাদের অপমানের প্রতিশোধ নিতে প্রণোদিত করে আরেকটি যুদ্ধে জড়াতে।

পাঠ- ৩.৭ লিগ অব নেশনস ও তার ব্যর্থতা

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালে (১৯১৮-১৯৩৯) প্রতিষ্ঠা পায় জাতিপুঞ্জ তথা লীগ অব নেশনস। আজকের জাতিসংঘ যেমন বিশ্বের কোনো একটি স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নির্লজ্জভাবে ব্যর্থ তখনকার দিনে গড়ে ওঠা জাতিপুঞ্জও তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহারণ থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে পারেনি। কার্যক্ষেত্রে এর কোনো গুরুত্ব থাক আর নাই থাক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে এর গুরুত্ব উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। বলতে গেলে এর প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্যদের সিংহভাগ ইউরোপীয় হওয়ায় অন্য দেশের সেখানে সহজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ ছিল না। তবে শেষ পর্যন্ত ইউরোপেরই বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বে ভেঙে যায় লীগ অব নেশনস। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের ঔপনিবেশিক স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব অনেক বড় হয়ে উঠতে দেখা গেলে শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায় এই জাতিপুঞ্জ তথা লীগ অব নেশনস। লীগ অব নেশনসের ব্যর্থতার কারণগুলো হচ্ছে–

১. **ভার্সাই চুক্তি :** ফ্রান্সের জাতিগত জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য জার্মানির ওপর অনেকগুলো শর্ত আরোপ করে সম্পাদিত হয় ভার্সাই চুক্তি। অসম ও অনৈতিক এই চুক্তি লীগ অব নেশনস তথা জাতিপুঞ্জের ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ।

২. **অলীক আন্তর্জাতিকতা :** একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও সেখানে চারটি বৃহৎ রাষ্ট্রের বাইরে অন্যদের কথা বলার কোনো সুযোগ ছিল না বললেই চলে। বলতে গেলে এই অবস্থানগত অসঙ্গতিও লীগ অব নেশনসের ভেঙে পড়ার মূল কারণ।

৩. **দ্বিমুখী নীতি :** বিশ্বের নানা স্থানে নিষ্পেষণকারী ঔপনিবেশিক দেশগুলো যখন শান্তির কথা প্রচার করেছিল তা শুরু থেকেই গণমানুষের আস্থা হারায়। তাই প্রথম দিক থেকেই রাষ্ট্রনেতাদের অংশগ্রহণে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ সংগঠন যতটুকু টিকে ছিল তাও ভেঙে পড়ে।

৪. **সহযোগিতার অভাব :** নামমাত্র লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠা পেলেও মিত্র শক্তির বিজয়ী দেশগুলোর মধ্যে একধরনের থমথমে পরিবেশ বিরাজ করে। তারা নামমাত্র একে অন্যের সাথে সংযুক্ত থাকার কথা বললেও সহযোগিতামূলক মনোবৃত্তির ঘাটতি ছিল চোখে পড়ার মত।

৫. **আঞ্চলিকতা ও অখণ্ডতা :** লীগ অব নেশনস বিভিন্ন জাতির অখণ্ডতা বজায় রাখতে কাজ করার কথা। কিন্তু ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানিকে যেভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয় লীগ অব নেশনস সেক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকায় থেকে নিজের অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ করে।

৬. **রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা :** জাতিপুঞ্জ বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি নিয়ে কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু জার্মানির ওপর অবৈধ অবরোধকে নির্লজ্জের মত সমর্থন দিয়ে গেছে এ প্রতিষ্ঠানটিই। এক্ষেত্রের ব্যর্থতাও লীগ অব নেশনস এর পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

৭. **চীন জাপান দ্বন্দ্ব :** চীন ও জাপানের দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা দ্বন্দ্ব নিরসনেও পুরোপুরি ব্যর্থ হয় এই সংগঠনটি। ফলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিরোধিতা করতে থাকা দেশগুলোর অন্যতম হিসেবে চীন ও জাপান যে দীর্ঘ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল তা থেকে মুক্ত করতে পারেনি এই লীগ অব নেশনস তথা জাতিপুঞ্জ। তাই শেষ পর্যন্ত এর ভেঙে পড়াটা হয়ে যায় সময়ের ব্যাপার।

৮. **ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের শক্তিমত্তা :** ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের অহেতুক শক্তিবৃদ্ধি বিশ্বের অন্য দেশের শান্তির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে তারা ক্রমবর্ধমান শক্তি কাজে লাগিয়ে বিশ্বের নানা স্থানে তাদের উপনিবেশ বিস্তৃতির চেষ্টা চালালে সেখানে নীরব ভূমিকা পালন করে লীগ অব নেশনস। এতে সংস্থাটির ওপর থেকে আস্থা উঠে যায় অন্য দেশগুলোর।

৯. **হিটলারের ও মুসোলিনির আত্মপ্রকাশ :** একনায়ক হিসেবে জার্মানির নেতা অ্যাডলফ হিটলার ও ইতালিতে বেনিতো মুসোলিনির আত্মপ্রকাশ লীগ অব নেশনসকে শুরুতেই অগ্রাহ্য করে। বিশেষ করে হিটলার ভার্সাই চুক্তির শর্তগুলো এক এক করে বদলের শপথ নিয়ে অনেকটা বন্ধ করে দেন জাতিপুঞ্জের কার্যক্রমকে।

১০. **মহামন্দা :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরোক্ষ কারণ হিসেবে মহামন্দা দেখা দেয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে তেমন কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করতে না পারায় সংস্থা হিসেবে উপযোগিতা হারায় এ জাতিপুঞ্জ। বলতে গেলে সবাই তখন থেকেই একে ফ্রান্স-ব্রিটিশ অনুগত ও আজ্ঞাবহ একটি অকর্মণ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করে।

১১. **ইউরোপকেন্দ্রিকতা :** জাতিপুঞ্জ ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ এর ইউরোপকেন্দ্রিকতা। এখানে ইউরোপীয়রা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের জন্য সুবিধাজনক নানা শর্ত যুক্ত করে দেয়। আর সেগুলো বিশ্বের অন্যদেশের মনঃপূত না হওয়াতে তারা এর বিরোধিতা করে।

১২. **সাংবিধানিক দুর্বলতা :** ইউরোপের শক্তিশালী দেশ হিসেবে ইংরেজ ও ফরাসিদের নানা স্বার্থ পূরণ করতে গিয়ে সাংবিধানিকভাবে দুর্বল একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় জাতিপুঞ্জ। এ দুর্বলতা এর ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ।

সারাংশ

ফ্রাঞ্জ ফার্দিনান্দের হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে ইংরেজ গোলন্দাজ বেন ক্লাইটিং-এর প্রথম গুলি আর সবশেষে ভার্সাই চুক্তি পর্যন্ত চার বছর ধরে চলে মহাযুদ্ধে। যুদ্ধের শেষ দিকে মিত্রবাহিনীর ওপর মরণকামড় দিতে জার্মানরা স্প্রিং অফেন্সিভ শুরু করলে তার পাল্টা জবাব আসে হান্ড্রেড ডেজ অফেন্সিভে। জানমালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি, নানা আবেগ-উৎকণ্ঠা আর ধ্বংসযজ্ঞ শেষ পর্যন্ত মিত্রবাহিনীর বিজয় নিয়ে আসে। সবমিলিয়ে বিশ্ব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয় এই বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলোকে। বস্তুত এতবড় সংঘাত ও যুদ্ধের প্রথম অভিজ্ঞতা পায় মানবজাতি।

বলশেভিক বিপ্লব

ইউনিট ৪

ভূমিকা

রেনেসাঁর প্রভাবে ১৫ শতকে ইউরোপের সমাজ ও অর্থনীতিতে বিশেষ পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়। তখন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের শহরগুলোকে কেন্দ্র করে ইতালির ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশ লাভ করে। এ নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ও সম্পর্কের বিকাশ ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত সামন্তবাদী আর্থসামাজিক কাঠামোকে ভেঙে দেয়। ১৫ শতকের শেষ এবং ১৬ শতকের প্রথমার্ধের এসময় ইউরোপের ইতিহাসে প্রাথমিক পুঁজি বিস্তৃতির যুগ হিসেবে চিহ্নিত। তবে ইউরোপে সামন্তবাদ পতনের পটভূমিতে যে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ ঘটে তার পরিণতিও শুভ হয়নি। তবে ১৬ শতকের মধ্যভাগ থেকে পশ্চিম ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে থাকা দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। তবে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল অটোমান তুর্কিদের দখলে থাকায় এশিয়ার সাথে বাণিজ্য টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে যায়। এ সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বজনীন রাজনৈতিক ঘটনা বলশেভিক বিপ্লব।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

- ✓ **পাঠ-৪.১** **সাম্রাজ্যবাদের উত্থান, বিকাশ ও ফলাফল**
- ✓ **পাঠ-৪.২** **সাম্রাজ্যবাদের যুগে রাশিয়া**
- ✓ **পাঠ-৪.৩** **হবসন ও লেনিনের তত্ত্ব**
- ✓ **পাঠ-৪.৪** **বলশেভিক বিপ্লবের কারণ**
- ✓ **পাঠ-৪.৪** **বলশেভিক বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ ও ফলাফল**

পাঠ-৪.১ সাম্রাজ্যবাদের উত্থান, বিকাশ ও ফলাফল

১৮ শতকের শিল্প বিপ্লব ইউরোপের সমাজ ও অর্থনীতিতে এক গুণগত পরিবর্তন সাধন করে। কায়িক-শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। বস্তুত এই সময় থেকে পুঁজিবাদের ব্যাপক উত্থান প্রক্রিয়া লক্ষ করা হয়। এর ফলে বাণিজ্য পুঁজির স্থান ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে আসতে থাকে এবং শিল্প পুঁজির প্রসার প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯ শতকের প্রথমার্ধ কাল হলো বাণিজ্য পুঁজি এবং শিল্প পুঁজির মধ্যে সংঘাতের সময়। এই সময়ে বাণিজ্য পুঁজির প্রবক্তারা একচেটিয়া বাণিজ্য এবং অন্যদিকে শিল্প পুঁজির মালিকেরা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে সারা পৃথিবীর ইউরোপীয় উপনিবেশগুলিতে এই দুই ধারার সংঘাত চলতে থাকে।

১৯ শতকের প্রথমদিকে এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। সেখানে ইউরোপের ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ এবং সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুরু হয় স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই। ১৮১৫ সালের মধ্যে আমেরিকায় অবস্থিত ফরাসি উপনিবেশগুলো হাতছাড়া হতে থাকে। পরিস্থিতির দায় মেনে নিয়ে ১৮২২ সালে লাতিন আমেরিকার ব্রাজিল থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে পর্তুগাল। এরপর ১৮৫২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলি ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণা করেন। ১৮৬১ সালে এসে ফরাসি সরকারও ঘোষণা দিয়ে তাদের উপনিবেশে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে। তারা এ সব অঞ্চলে অবাধ বাণিজ্য নিশ্চিত করে। সে হিসেবে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ পশ্চিম ইউরোপের উপনিবেশগুলোর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারানোর যুগ শুরু হয়।

নানা স্থানে অবস্থিত উপনিবেশগুলোতে প্রশাসনিক শিথিলতা ছিল সাময়িক ব্যাপার। তখন পুরো ইউরোপে বাণিজ্য পুঁজির স্থান দখল করে নেয় শিল্প পুঁজি। ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে শিল্প পুঁজির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাজার তৈরি ও কাঁচামাল সংগ্রহের প্রয়োজনে নতুন দেশ দখল করাটা ইউরোপীয়দের স্বভাবে পরিণত হয়। তাদের নতুনভাবে সাম্রাজ্য গড়ে তোলার এ পর্বকে ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী যুগ বলে ইতিহাসে চিহ্নিত করা হয়। তাদের হিসেবে ১৮৭০ সাল থেকে শুরু করে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের যুগ হিসেবে চিহ্নিত। আর পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তবে সাম্রাজ্যবাদী এ চেতনা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার রূপ পাল্টে আবার নতুন করে ফিরে আসতে চেয়েছে। নতুন করে সাম্রাজ্যবাদ ঘুরে দাঁড়ানোর এ চেষ্টা বিশ্ব শান্তিকে ঠেলে দিয়েছে হুমকির মুখে। বিশেষ করে একের পর এক নতুন ভূখণ্ড দখলের চেষ্টা সহজে কোনো জাতি মেনে নিতে রাজি হয়নি। তারা যখনি এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছে তখনি বেঁধেছে দীর্ঘস্থায়ী বিপত্তি। আর দুর্বল দেশগুলো যাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত ক্ষমতা ছিল না তাদেরকে নির্বিচারে গ্রাস করেছে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো।

সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনেকটা কাছাকাছি সময়ে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার লাভ করলেও তার কারণ, ফলাফল ও প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন ছিল। বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশ, চীন কিংবা আফ্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার লাভ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ-পূর্ব সময়কালে মোগল শাসিত ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক প্রাধান্য বিস্তার এবং সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে দুটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স। স্থায়ী বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রবল লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় দখলদার দেশ দুটি। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায়। এদিকে চীনে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটে ১৭ শতকে। সেখানে বাণিজ্য বিস্তারে এগিয়ে ছিল পর্তুগিজরা। তারা দক্ষিণ চীনের ম্যাকাও বন্দর দখল করে বাণিজ্য পরিচালনা করে।

ধীরে ধীরে ইংরেজ, ফরাসি ও ডাচ কোম্পানি চীনের সমুদ্র উপকূল ধরে বসতি স্থাপন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ক্যান্টন, হংকং, তাইওয়ান প্রভৃতি এলাকায় ইঙ্গ-ফরাসি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৯ সালে চীন সরকার ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নানকিংয়ের সন্ধিতে স্বাক্ষর করে। তার শর্তানুযায়ী সমুদ্র উপকূলের পাঁচটি বন্দর ইংরেজ কোম্পানির দখলে চলে যায়। এই সময়ে চীনে ইংরেজদের আফিম ব্যবসা ও আফিম বাণিজ্যের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের সংগ্রামের ফলে ঘটে যায় প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ ও নানকিং সন্ধি। পরিস্থিতি সংঘাতময় হয়ে ওঠে ১৮৫৬ সালের দিকে।

ইংরেজ ও ফরাসি কোম্পানির তাবেদার জনৈক ফরাসি ধর্মযাজককে কৃত অপরাধের জন্য চীন সরকার মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। এর প্রতিবাদে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স যৌথভাবে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইতিহাসে এটাকে দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ হিসেবে

উল্লেখ করা হয়। তিয়েন্তসিন সন্ধির মাধ্যমে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলেও সন্ধির শর্তানুসারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় চীন। উপকূলবর্তী এগারোটি চীনা বন্দরে ইংরেজ ও ফরাসি শক্তির কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয় এ সন্ধির মাধ্যমে। ১৯ শতকের শেষাংশে চীন দখলের জন্য ইউরোপীয় শক্তিগুলোর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এর অখণ্ডতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। ঠিক তখনি নতুন করে চীনে বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের এশীয় বাণিজ্যেসমূহ ক্ষতির আশঙ্কা আঁচ করে তাদের সরকার ও ব্যবসায়ীরা বিশাল চীন সাম্রাজ্যের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া মেনে নিতে পারেন নি। পরিস্থিতি মোকাবেলায় মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন হে চীনের অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং চীন অঞ্চলে পশ্চিমা দেশগুলোর বাণিজ্য সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে ফ্রান্স, ব্রিটেন, স্পেন, ইতালি, পর্তুগালসহ অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশ একাত্ম হয়। 'মুক্ত বাণিজ্য দ্বার' নীতি হিসেবে পরিচিত এ চুক্তি বলতে গেলে চীনের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়।

আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই মুক্তদ্বার নীতির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে ১৯০১ সালে গৃহীত এ নীতির মূল লক্ষ্যগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় বিশ্ব রাজনীতিতে এর প্রভাব কেমন ছিল। প্রথমত, এ নীতির মাধ্যমে প্রত্যেকটি পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশ চীনের অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতা মেনে নেয়। দ্বিতীয়ত, চীনে বাণিজ্য পরিচালনায় আগ্রহী কিংবা বাণিজ্যরত দেশ ও কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বাণিজ্য শুল্ক আদায় করার সুযোগ পায় চীন সরকার। তৃতীয়ত, চীনে সব পশ্চিমা দেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করে তবে বাণিজ্য ক্ষেত্রে একই নীতি অনুসরণে বাধ্য থাকে তারা। চতুর্থত, চীন সরকার সব দেশ ও বাণিজ্যিক কোম্পানির জন্য সমানুপাতিক হারে শুল্ক ধার্য করে। এ শুল্ক আদায়ে সবার প্রতি একই নীতি অনুসৃত হয়। পঞ্চমত, বাণিজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি চীনের অভ্যন্তরে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তর করণের অবৈধ তৎপরতাকেও প্রবলভাবে বাধা প্রদান করা হয় এ নীতির মাধ্যমে। আর যাই হোক এ মুক্তদ্বার নীতি চীনের অখণ্ডতা বজায় রাখতে পেরেছিল। তবে দেশটি সাম্রাজ্যবাদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে সব ধরনের শিল্প বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় পুঁজিবাদী দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণে। এতে করে নাম মাত্র অখণ্ড স্বাধীন দেশ হলেও বাস্তবে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি।

দক্ষিণ এশিয়া ও চীনের পর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া তথা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর আগ্রাসন নীতি। পশ্চিমে এ অঞ্চলের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে মাঝারি থেকে শুরু করে ভারী শিল্পের কাঁচামাল সমৃদ্ধ এ অঞ্চলের অবস্থান সাগর তীরে। সুয়েজ খাল খননের পরে এই অঞ্চলের সাথে ইউরোপের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত হয়। এদিকে দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা প্রথমে পতুর্গিজ ও ওলন্দাজদের দখলে ছিল। তবে সাম্রাজ্যবাদী যুগের সূচনাপর্বেই শ্রীলঙ্কা দখল করে ইংরেজরা। তারা এখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা উৎপাদন শুরু করলে ক্রমে শ্রীলঙ্কা পৃথিবীতে চা শিল্পে শীর্ষস্থান অর্জন করে। ১৮ শতকের মালয়েশিয়ায় পর্তুগিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পেলেও প্রতিযোগিতায় তারা ইংরেজদের কাছে টিকতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদী যুগে এসে মালয়েশিয়াও ইংরেজদের দখলে চলে গেলে দূরপ্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের আধিপত্য নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে।

১৮৭০ সালে ওলন্দাজদের জাভা দ্বীপপুঞ্জ অধিকার ও তার ১৬ বছর ব্যবধানে ১৮৮৬ সালে ইংরেজদের বার্মা দখল পরিস্থিতি পুরো পাল্টে দেয়। তারা বার্মাকে ভারতের সাথে সংযুক্ত করলেও থাইল্যান্ড ও আশেপাশের অঞ্চলে কর্তৃত্ব ধরে রেখেছিল ফ্রান্স। তবে ঠিক এই সময়েই যুক্তরাষ্ট্র স্পেনকে তাড়িয়ে ফিলিপাইন দখল করে। এভাবে একের পর এক দখলবাজির মধ্য দিয়েই এগিয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদী যুগের ইতিহাস। প্রথম দিকে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ইংরেজদের একাধিপত্য লক্ষ করা গেলেও শেষ পর্যন্ত মার্কিনরা শক্তিমত্তায় এগিয়ে যায়। বলতে গেলে দুটি মহাযুদ্ধের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রায় পুরো পৃথিবীকেই গ্রাস করে নেয়। তবে উনিশ শতকে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তৃত হওয়ার পেছনে কয়েকটি বিশেষ কারণ চিহ্নিত করা যায়। তা হচ্ছে–

১. **শিল্প সংরক্ষণ নীতি :** উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লব ইউরোপের আর্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পুরো পাল্টে দিয়েছিল। বিশেষ করে এর ফলেই ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশে পুঁজিস্ফীতি ঘটে। তারা পরিস্থিতির দায় ভেবে কঠিন শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেছিল এ সময়ে। তারা বাইরের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কম গুরুত্ব দিয়ে নিজেদের শিল্প প্রতিষ্ঠান রক্ষার প্রয়াস নেয়। তাদের গৃহীত এ শিল্প সংরক্ষণ নীতি আন্তঃইউরোপীয় বাণিজ্যে সৃষ্টি করে এক অচলাবস্থা। ইউরোপের নানা দেশে পণ্য চলাচল প্রায় বন্ধ হয়। নানা অযুহাতে সুযোগ বুঝে সব ধরনের পণ্যে পুঁজিপতিদের মূল্যবৃদ্ধির প্রয়াস সবাইকে বিরক্তির শেষ সীমায় নিয়ে যায়। রাজক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় অবাধ ও নির্মম শ্রমিক শোষণ পণ্যের অভ্যন্তরীণ বাজারকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করায়। পক্ষান্তরে ১৯ শতকের শেষাংশ পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো অন্তত শিল্পের দিক থেকে তেমন উন্নতি অর্জন করতে পারেনি। তবে জনবহুল এ অঞ্চল ইউরোপের

শিল্প পণ্যের জন্য এক সম্ভাবনাময় বাজার হিসেবে দেখা দেয়। বিশেষ করে নিজেদের শিল্পজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্যই তারা এসব দেশ দখলে আগ্রহী হয়েছিল। কারণ তারা জানতো কোনোভাবে এদেশগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা গেলে আর যাই হোক জোরপূর্বক সেখানে তাদের পণ্য বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি হবে। বলতে গেলে অধিক জনসংখ্যার এসব দেশে মুক্ত বাজার সৃষ্টিতেই ইউরোপীয়রা নিজেদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। আর তার গৌণ প্রভাবে হলেও ধীরে ধীরে সূচনা ও বিস্তার ঘটে সাম্রাজ্যবাদী যুগের।

২. **কাঁচামালের যোগান নিশ্চিতকরণ :** শিল্প বিপ্লব ঘটে যাওয়ার পর ইউরোপের নানা দেশে বিভিন্ন রকমের কলকারখানা প্রতিষ্ঠা পেলেও তার সিংহভাগ কাঁচামাল ইউরোপে পাওয়া সম্ভব হত না। তারা কাঁচামালের জন্য পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল আমেরিকার নানা দেশ, এশিয়া ও আফ্রিকার উপর। ইন্দো-মালয় ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপগুলো ছিল তাদের রাবার সরবরাহ কেন্দ্র। অন্যদিকে বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল তুলা উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে ভারতবর্ষ এবং মিশরের উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুর এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করা যায়। অন্যদিকে আফ্রিকা অঞ্চলের কয়লা, লৌহ, স্বর্ণ, তাম্র এবং মধ্যপ্রাচ্যের তেল ভাণ্ডারও ছিল তাদের শিল্পের বিকাশে অনেক জরুরি। এজন্যও তারা অনেক দেশ দখল করে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটিয়েছিল।

৩. **খাদ্যশস্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা :** ইউরোপে জনসংখ্যা বেড়ে গেলে সে অনুপাতে খাদ্য উৎপাদন সক্ষমতা বাড়েনি তাদের। ফলে খাদ্যশস্য বিশেষ করে চা, চিনি, তামাক প্রভৃতির জন্য নির্ভরশীলতা বেড়ে যায় তাদের। তারা এশিয়া ও মধ্য আমেরিকা অঞ্চলের উপর এক্ষেত্রে পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল একথা বলা যেতেই পারে। অন্যদিকে ইউরোপের মসলা সরবরাহের জন্য ভারতবর্ষ, বার্মা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলঙ্কার গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে গেছে ততদিনে। বলতে গেলে খাদ্যশস্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্যও শিল্পোন্নত ইউরোপের দেশগুলো এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ দখল করে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটায়।

৪. **সস্তা শ্রমবাজার :** ১৯ শতকে এশিয়া ও আফ্রিকার জনসংখ্যা ছিল বেশি। স্বাভাবিকভাবে এই সুবিধা ইউরোপের চেয়ে এ অঞ্চলের শ্রম বাজার সস্তা ও সহজলভ্য করে দেয়। ইউরোপের শিল্প সংরক্ষণ নীতি এক দেশ থেকে অন্য দেশে শ্রমিক চলাচল সীমিত করে দেয়। ফলে প্রয়োজনীয় বাড়তি শ্রমিকের জন্যই এশিয়া ও আফ্রিকার সস্তা শ্রমবাজারের দিকে আকৃষ্ট হতে হয়েছিল ইউরোপয়ীয় শিল্পপতিদের। এ অবস্থায় শিল্পোন্নত ইউরোপীয় দেশগুলো বেশি মুনাফা লাভের আশায় এশিয়া ও আফ্রিকার নানা অঞ্চলে কয়েকটি শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। এর থেকে অর্জিত সাফল্য তাদের অনুপ্রাণিত করে। পরবর্তীকালে তারা এই সস্তা শ্রম বাজার দখলের জন্য মরিয়া হয়ে সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করে। অনেক ক্ষেত্রেই সহজ ও সস্তা শ্রমবাজারের দখল নিতে গিয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তাদের আগ্রাসী নীতি দেশ বিশেষে ভিন্ন ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্যগত দিক থেকে তাদের তেমন কোনো পার্থক্য করার সুযোগ ছিল না।

৫. **উগ্র জাতীয়তাবাদ :** জার্মানি ও ইতালির উগ্র জাতীয়তাবাদী আচরণ ১৯ শতকে এসে ভয়াবহ রূপ লাভ করে। তারা অর্থ, বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শিক্ষায় নিজেদের আফ্রিকা, এশিয়া ও এর বাইরের জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে থাকে। তাই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বৃদ্ধি এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয় তারা। এক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে নানা অঞ্চল দখলের মনোবৃত্তি তাদের মাঝে প্রবল হয়ে উঠে। জার্মান ও ইতালির এই উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করেছিল নিঃসন্দেহে। তবে দেশ ও অঞ্চল দখলের পৈশাচিকতায় বদলে যায় সবার রাজনৈতিক ধারা। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরাজিত শক্তি হিসেবে জার্মানিকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়, আগ্রাসী নীতির ক্ষেত্রে ইউরোপের অন্যদেশগুলোও কোনো অংশে পিছিয়ে ছিল না।

৬. **সামরিক দিক :** আধুনিক যুগের শুরু থেকেই ইউরোপের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সংঘাতপূর্ণ হয়ে ওঠে। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা না গেলে এই সময়ের ইউরোপে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়তো যেকোনো দেশের জন্যই। এ জন্য তারা নিজ সামরিক শক্তি বৃদ্ধিকল্পে বহুমুখী চেষ্টা চালায়। এরফলেই জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ও ব্রিটেন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। তবে এ দেশগুলোর জনসংখ্যা কম বলে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশ থেকে সামরিক বাহিনীর সদস্য সংগ্রহেরও প্রয়োজন পড়ে অনেক ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ এবং সামরিক বাহিনীর সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো এশিয়া আফ্রিকার অনেক দেশ দখল করে নেয়। একই সঙ্গে সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে গড়ে

তোলে স্ব স্ব সামরিক কমাণ্ড। তবে সাম্রাজ্যবাদী যুগের চূড়ান্ত বিকাশ বলা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এরপর এ সংঘাতের রেশ টিকে থাকে পুরো বিশ শতকজুড়েই।

সাম্রাজ্যবাদের ফলাফল

ঔপনিবেশিক আধিপত্য শেষ হলে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা ইউরোপের মানচিত্র বদলে দিতে সহায়তা করে। উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব পৃথিবীর ইতিহাস নতুন করে লিখতে বাধ্য করেছে। শোষণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলেও কার্যত সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা এবং এর বিকাশ ঘটে বিভিন্ন ধরনের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। এর ফলাফল ছিল তাই বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে–

১. **শিল্পের বিকাশ :** ইউরোপের পুঁজিপতিরা অধিক মুনাফার জন্য দখলকৃত বা সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলসমূহে কিছু নতুন ধরনের শিল্প কারখানা স্থাপন করেছিল। তারা এগুলো নিজেদের মুনাফার জন্য করলেও এর মধ্য দিয়ে আফ্রিকা ও এশিয়ার ইতিহাসে শিল্পের নবজাগরণ ঘটে। বিশেষ করে উপনিবেশ যেমন তাদের কোম্পানি স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে গিয়ে মসলিনের মত ঐতিহ্যবাহী শিল্প ধ্বংস করেছে সে হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী যুগে কিছু কিছু নতুন অর্জন লক্ষ করা গিয়েছে। পরিস্থিতি বিশেষে সেটা ছিল উপনিবেশ যুগের থেকে পুরোপুরিই ভিন্ন। বিশেষত, ভারতে পাট ও বস্ত্রশিল্পের বিকাশ অনেকাংশে সাম্রাজ্যবাদী যুগের অবদান বলা যেতেই পারে।

২. **যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন :** সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের প্রয়োজনীয় শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠা করে উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা। তাদের প্রয়োজনে কাঁচামাল সরবরাহের গতিকে দ্রুততর করার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটালেও তা টিকে যায় বছরের পর বছর। বিশেষ করে অনুন্নত দেশেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে বন্দরগুলোকে সম্পৃক্ত করা হয়। বিভিন্ন স্থানজুড়ে শক্তিশালী রেললাইন স্থাপন করা হয়। বলতে গেলে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে এ সময়টাতেই। বিশেষত, ভারতবর্ষ, চীন, বার্মা, জাভা, মালয়েশিয়া ও চীনের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নে সাম্রাজ্যবাদী যুগের ভূমিকা রয়েছে।

৩. **শিক্ষার উন্নয়ন :** প্রশাসন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে তাদেরকে নির্ভর করতে হয় দখলকৃত অঞ্চলের বিশাল অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপর। এক্ষেত্রে দখলকৃত অঞ্চল থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টির জন্য পশ্চিমা দেশগুলো প্রবর্তন করে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এশিয়ার ইতিহাসে এভাবেই শুরু হয় তাদের ভাষায় আধুনিক শিক্ষার অভিযাত্রা। বাস্তবে এর মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি হয় সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর ইংরেজি ও ইউরোপীয় ভাবধারার পোষ্য শিক্ষিত শ্রেণি। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে শিক্ষা নিয়ে এরাই কালক্রমে হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক।

৪. **কৃষির বিকাশ :** শিল্পের অনেক কাঁচামাল ছিল কৃষিনির্ভর। তাই সাম্রাজ্যবাদীরা শিল্পের কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে গিয়ে অনেকটা তাদের প্রয়োজনেই এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কৃষির বিকাশ ঘটায়। এক্ষেত্রে তাদের পাশাপাশি উপকৃত হয় স্থানীয়রাও। বিশেষ করে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তুলা, রাবার, মসলা, চা, পাট উৎপাদন এবং আধুনিক বনায়ন তাদের কৃষি নীতির অবদান। অনেক ক্ষেত্রে জবরদস্তিমূলক কৃষি উৎপাদন করতে গিয়ে স্থানীয় কৃষির অনেক ক্ষতিসাধনও করেছে। তারা এসব দেশে সেই ধরনের পণ্য উৎপাদনেই বেশি আগ্রহ দেখাতো যেগুলো তাদের প্রয়োজন ছিল। এতে করে প্রচলিত সনাতন পদ্ধতির চাষবাস ও শস্যগুলো হারিয়ে যেতে থাকে কৃষি থেকে।

৫. **সাংস্কৃতিক পরিবর্তন :** সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন একটি দেশের সংস্কৃতিকে নানা দিক থেকে পাল্টে দেয়। মানুষের আচার আচরণ, পোশাক আশাক এমনকি খাদ্যাভাসের উপর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তবে পরিস্থিতির দায় হিসেবে এটা মেনে নিতেই হবে যে এশিয়া অঞ্চল ইউরোপীয় শক্তির সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পটভূমিতে ইউরোপের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।

৬. **বিচার ও প্রশাসন :** নিজেদের প্রয়োজনেই বিচার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে তাদের মত করে ঢেলে সাজায় সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী। বিশেষ করে শিক্ষিত শ্রেণির একাংশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুগত হলেও অন্য অংশ বিদেশি শাসনের অবসান কল্পে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল তখন। এ পটভূমিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সারা এশিয়া অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উত্তাল আকার ধারণ

করে। বিপ্লবীদের দমন করার জন্য বিশেষ আইনের প্রয়োজন ছিল। এই আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই তারা বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামোতে নানা ধরনের সংস্কার ঘটায়।

পাঠ-৪.২ সাম্রাজ্যবাদের যুগে রাশিয়া

১৯ শতকে রুশ সাম্রাজ্যের বিশাল ভূখণ্ডে ছিল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, সংস্কৃতি ও ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস। মধ্য এশিয়া থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূভাগের অধিবাসীরা যেমন ছিল মোঙ্গলীয় জাতির। তেমনি তাদের বেশিরভাগই বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের অনুসারী বলে জানা যায়। দক্ষিণে ক্রিমিয়া ও মধ্য এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডে ছিল তাতার জাতির আবাস। এরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও মুখ্যত রুশ জনগোষ্ঠী ছিল শ্লাভ জাতির অন্তর্ভুক্ত। ধর্মের দিক থেকে শ্লাভদের সিংহভাগ গ্রিক চার্চের অনুসারী। পক্ষান্তরে লিথুনিয়া ও ইউক্রেন অঞ্চলে পোলিশদের আবাসস্থল। আদি নিবাস পোল্যান্ড হলেও এরা রুশদের সমগোত্রীয় এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের অনুগত ছিল। তাদের সাথে বাল্টিক অঞ্চলের প্রোটেস্ট্যান্টদের সম্পর্ক তেমন ভালো ছিল না।

সামাজিক স্তরবিন্যাস বিচার করতে গেলে ১৯ শতকের রাশিয়ায় দুটি শ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়; অভিজাত শ্রেণি এবং ভূমিদাস। রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং সমুদয় সম্পদের মালিক অভিজাত শ্রেণি ভোগ করত বেশিরভাগ সুযোগ-সুবিধা। এদিকে ভূমিদাস নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠন করা হয় বিশেষ সংস্থা 'মির'। দাসদের বসবাস করতে হতো বহুমুখী বিধিনিষেধ এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। বস্তুত রাশিয়ায় ভূমিদাসরা ছিল জামিদার তথা মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেখানে শাসন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব জার নিয়ন্ত্রণ করতেন নিজ ক্ষমতাবলে। প্রদেশের শাসন পরিচালনার জন্য একজন গভর্নর এবং একটি কাউন্সিল থাকলেও জারের স্বৈরতন্ত্র ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন। প্রাদেশিক শাসক নিয়োগ করতেন স্বয়ং জার এবং প্রতিটি স্থানীয় প্রশাসনের পদে বসতো অভিজাত পরিবারের সদস্যরাই। জারের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে ছিল প্রোটিরিয়ান গার্ড বা জারের পুলিশ বাহিনী যারা যে কোনো বিদ্রোহ দমনের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকত।

ইউরোপের যেকোনো দেশের তুলনায় রাশিয়ার সাধারণ মানুষ ছিল অনেক বেশি অত্যাচারিত। সরাসরি জলপথ সংলগ্ন উত্তর মহাসাগর বাদ দিলে বিশাল ভৌগোলিক সীমানায় রাশিয়া একটি স্থলবেষ্টিত দেশ। উত্তর মহাসাগরের জলপথ প্রায় সারা বছর বরফাচ্ছাদিত থাকায় নৌ চলাচলের অযোগ্য। তাই পরিস্থিতির দায় অনেকটা মেনে নিয়েই ১৮ শতকের মাঝামাঝি থেকে রাশিয়ার নেতৃত্ব দুটি জলপথ কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। তারা এক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রথমে কৃষ্ণসাগর থেকে দার্দানালিস প্রণালির ভেতর দিয়ে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের চেষ্টা করে। তবে দার্দানেলিস প্রণালি তুরস্কের দখলে থাকায় সেদিক দিয়ে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের কোনো সুযোগ রাশিয়ার ছিল না। অন্যদিকে মধ্য এশিয়া অঞ্চল দখল করে ইরানের ভেতর দিয়ে পারস্য উপসাগরে প্রবেশ করার চেষ্টা চালায় তারা। এতে করে ভারত মহাসাগরের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের সুযোগ ছিল। দক্ষিণে সাগর পথে যে কোনো মূল্যে অগ্রসর হয়ে রাশিয়া তাদের জন্য বাণিজ্য পথ তৈরির চেষ্টা চালায়। ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষকগণ তাদের এ প্রয়াসকে 'উষ্ণ পানির নীতি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উসমানীয় তুর্কি সাম্রাজ্যের উপর রাশিয়ার জোরপূর্বক এ দখল নীতিই সৃষ্টি করে উনিশ শতকের কুখ্যাত 'প্রাচ্য সমস্যা'। এসময়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝার পাশাপাশি ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য জার প্রথম ও দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এবং জার প্রথম নিকোলাসের শাসনামল মূল্যায়ন করাটা জরুরি।

পাঠ-৪.৩ হবসন ও লেনিনের তত্ত্ব

ইউরোপে বিদ্যমান রাজতান্ত্রিক কাঠামো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ার পর তাদের আগ্রাসী নীতি সাম্রাজ্যবাদের আকারে নতুন করে ফিরে আসে। পরপর কয়েকটি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পাশাপাশি রাজতান্ত্রিক কাঠামোর ভেঙে পড়া ইউরোপীয় রাজনীতিতে একটি বদল আসন্ন করে তোলে। এ সময়টিকে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী যুগ বলে চিহ্নিত করে থাকেন বিভিন্ন ইতিহাসবিদ। প্রখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জে এ হবসন এবং সোভিয়েত বলশেভিক বিপ্লবের নেতা ভি আই লেনিন এ সময়কাল সম্পর্কে দুটি বিশেষ তত্ত্ব প্রদান করেছেন। একসাথে তাদের এই বিশ্লেষণমূলক আলোচনা তাদের নামানুসারে হবসন এবং লেনিনের তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত।

হবসন মনে করেন ইউরোপে শিল্প পুঁজি বিকাশের এই পর্বে এসে মূলধন স্ফীতি ঘটে যায়। যা পুরো ইউরোপের অর্থনীতির পরিকাঠামো পাল্টে দিতে যথেষ্ট হয়েছিল। উদ্বৃত্ত মূলধনের বিনিয়োগে বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলো এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করতে থাকে। তারা এসব দেশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে ব্যাপক দখল ও লুটতরাজ চালায়। মূলধন বিনিয়োগের স্থান হিসেবেও এসব দেশকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো। বিশেষ করে সেখানে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে স্বল্প খরচে অধিক শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ ছিল। এতে করে কম খরচে অধিক উৎপাদন সম্ভব হত তাদের পক্ষে। তারা খুব সহজেই অল্প পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে বিশাল অঙ্কের লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই অর্থ তারা পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহার করে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে। সাম্রাজ্য নিয়ে হবসনের এ তত্ত্বকে সাম্রাজ্যবাদী যুগের বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

পুরোপুরি অর্থনীতি নির্ভর না হলেও লেনিনের তত্ত্বেও অর্থনীতির একটি কার্যকর ভূমিকা ছিল। তিনি এ তত্ত্ব উপস্থাপন করার জন্য আশ্রয় করেছেন 'Imperialism is the Highest Stage of Capitalism' নামক গ্রন্থের। তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারকে পুঁজি বিস্তারের সর্বোচ্চ স্তর বলে দাবি করেছেন। পাশাপাশি পুঁজি ও সাম্রাজ্য একে অন্যের পরিপূরক বলেও মনে করেন লেনিন। এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে তিনি বলতে চেয়েছেন যে পুঁজির স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে দখল আর লুণ্ঠনে তা ব্যাপৃত হয়। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদ তার চূড়ান্ত পর্বে নতুন নতুন বাজার খুঁজতে চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে নতুন স্থান সন্ধানের বদলে বিভিন্ন এলাকা দখল ও প্রভুত্ব কায়েম মুখ্য হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ এক কথায় পুঁজিবাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট অর্থনীতি বিকাশের ধারাবাহিকতা মাত্র। সেদিক থেকে বিচার করলে লেনিনের তত্ত্বটিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুটি দিক গুরুত্ব পেয়েছে। পরিস্থিতির সাথে সমন্বয় করে ইতিহাসের কার্যকারণ নির্ভর বিশ্লেষণ করতে গেলে লেনিনের তত্ত্বটিই অধিক বস্তুনিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে।

পাঠ-৪.৪ বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

জারদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের যুগের নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে রাশিয়ার ইতিহাস। সেদিক থেকে দেখলে এ বিপ্লবের সামাজিক পটভূমি তৈরি হয়েছিল ১৯ শতকে এসে। তখনকার ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ও বিকাশ পরিস্থিতি বদলে দেয়। পাশাপাশি ফ্রান্সে বুর্জোয়াদের সফল বিপ্লব নতুন করে ভাবতে শেখায় রাশিয়ানদের। তাদের অনেক তাত্ত্বিক ও সমালোচকের পাশাপাশি বলশেভিক বিপ্লবের নেতারাও ফরাসি বিপ্লবের নানা ত্রুটি শনাক্ত করে তাদের বিপ্লবকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়। তারা পরিস্থিতির দায় মেনে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হওয়ায় বিপ্লব সফল করতে তেমন বেগ পায়নি। তবে ঐতিহাসিক এ বিপ্লবের কারণগুলোকে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন এর গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো হচ্ছে–

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ : ইউরোপের নানা স্থানে পুঁজিপতিদের শোষণ অতিক্রম করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সংগ্রাম, শ্রমিক কল্যাণ, বেকার সমস্যা দূরীকরণ ও দ্রুত নগরায়নের সমস্যা মোকাবেলা করা হয়ে ওঠে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। শিল্প বিপ্লবোত্তর ইউরোপের সমাজ ও রাজনীতিতে দেখা যায় বহুমুখী উত্থান পতন। তখনকার সমাজ পরিবর্তনের মুখে মানুষের অধিকার রক্ষা, শ্রমিক শ্রেণির কাজের সময়, বেতন ভাতা, ছুটি এবং সর্বোপরি পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে দানা বেঁধে ওঠে তীব্র সামাজিক আন্দোলন যা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার পথ করে দেয়। বিশেষ করে ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী চার্লস ওয়েন, ফরাসি সমাজতন্ত্রী সেন্ট সাইমন, চার্লস ফুরিয়্যর, লুই ব্লাঙ্ক, প্রুধোঁ প্রমুখের পাশাপাশি রাশিয়ার সমাজতন্ত্রীরা হয়ে ওঠেন সর্বেসর্বা। তখনকার রাশিয়ায় মিখাইল বাকুনিন কিংবা ক্রুপোৎকিন প্রবর্তিত মতাদর্শ রাজনৈতিক পরিসরে অনেক গুরুত্ব লাভ করে।

তত্ত্ব ও কাজের সমন্বয় : বিভিন্ন তাত্ত্বিকের সফল উদ্যোগে তখনকার রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র সহজেই রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিণত হয়। তবে ইউরোপের সমাজ ও রাজনীতিতে সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করার পাশাপাশি এর প্রয়োগ করাটা ছিল অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে পরিসর ও রাজনীতির মতাদর্শের দিক থেকে এর প্রয়োগ, লক্ষ্য নির্ধারণ ও উপযোগিতা নিশ্চিত করাটা সফল বিপ্লবের জন্য জরুরি হয়ে দেখা যায়। বিশেষ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা এসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তত্ত্ব ও কাজের সমন্বয় করে দিয়েছিলেন যা বলশেভিক বিপ্লবকে সফল করতে পথ দেখায়।

তাত্ত্বিক উন্নয়ন : অনেক সীমাবদ্ধতা হেতু তাত্ত্বিকদের পক্ষে বিপ্লবের পদ্ধতিগত দিক ও পরিসীমা নির্ধারণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে প্রাথমিক দিকের সমাজতন্ত্রীদের কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী বলা হয়। তাদের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের নানা ক্ষেত্রে বাস্তব ও পরিপূর্ণ রূপরেখা, যৌক্তিক প্রয়োগ পদ্ধতি এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সফলতা অর্জনের পথ পরিক্রমা নিশ্চিত করেন কার্ল মার্কস। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক খ্যাত কার্ল মার্কসের নির্দেশিত পথকে সামনে রেখেই ১৯ শতকের শেষদিকে ইউরোপের নানা দেশে গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের সমাজতান্ত্রিক দল। বলতে গেলে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি তেমনিভাবেই গড়ে ওঠা একটি রাজনৈতিক দল। এক্ষেত্রে লেনিন মার্কসের নির্দেশিত পথে কাজ করেন বলেই সফলতার মুখ দেখে বলশেভিক আন্দোলন।

রাশিয়ার ভঙ্গুর সমাজ কাঠামো : ১৮ শতক থেকে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোয় আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নানা পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, উন্নত জীবনধারা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় এ এলাকা। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে রাশিয়ায় জারদের নানা দমননীতি তাদের উন্নয়ন ব্যহত করে। নানা দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে তাদের সমাজ কাঠামো একটি ভঙ্গুর অবস্থানে চলে যায়। তারা ইউরোপের সামাজিক বাস্তবতায় একেবারে তলানিতে পড়ে থাকে। উদারনৈতিক চিন্তাধারা, গণতান্ত্রিক রাজনীতি, কল্যাণমুখী প্রশাসন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো ছাপ ছিল না তখনকার রাশিয়ায়। জারের একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, শোষণ আর অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে সব মানুষের মনে তখন কাজ করে বিশেষ তাড়না। তারা চলমান সামন্ত সমাজ কাঠামো এবং জারের স্বৈরতান্ত্রিক নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতেই সংগ্রাম করেছে। সেদিক থেকে ধরলে রাশিয়ার ভঙ্গুর সমাজ কাঠামো বলশেভিক বিপ্লবের পথকে সুগম করেছিল।

জারতন্ত্রের অযোগ্য শাসন : জারতন্ত্রের অযোগ্যতাই রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পথ সুগম করেছিল। দেশাভ্যন্তরে অত্যাচারী শাসনের বিপরীতে ১৮৫৪-৫৬ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ে জারতন্ত্র জনগণের আস্থা হারায়। মানুষ তখন থেকে মনেপ্রাণে জারদের ঘৃণা করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে ১৯০৫ সালে জাপানের সাথে যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় জারদের অবস্থান

ভুলুণ্ঠিত করে। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক বিপর্যয় আর অনেক সৈনিকের প্রাণহানিও বিচলিত করে সবাইকে। এসব ঘটনাপ্রবাহ ধারাবাহিকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে জারতন্ত্রের অযোগ্যতাকে প্রকট করেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার মানুষ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও অত্যাচারী ও অযোগ্য জারতন্ত্রের অবসানকল্পে বিপ্লবী বলশেভিকদের স্বাগত জানাতে সময় নেয়নি।

শ্রমিক অসন্তোষ : রাশিয়ায় দ্রুত শিল্পায়ন ঘটতে থাকে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে এসে। সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের শিল্পনীতি এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। রাশিয়ার ভূমিদাস শ্রেণি শিল্পায়নের সাথে সাথে শ্রমিকে রূপান্তরিত হলেও তাদের জীবন ছিল খুবই নিম্নমানের। বেতন ভাতা এবং কাজের সময় নিয়ে কোনো সরকারি নীতিমালা ছিল না। পক্ষান্তরে রাশিয়াতে শ্রমিক ধর্মঘট এবং ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ থাকার ফলে এরা ছিল চরমভাবে শোষিত এবং নির্যাতিত। ঠিক এমনি পটভূমিতে সমাজতান্ত্রিকরা তাদের সাম্যবাদী মতাদর্শ নিয়ে শ্রমিক শ্রেণিকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখায়। তারা সরাসরি প্রলেতারিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা, ভূমির উপর সামাজিক মালিকানা আরোপ, কলকারখানা জাতীয়করণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে খুব সহজেই নির্যাতিত শ্রমিকের মনকে দোলা দিতে সক্ষম হয়। বাগ্মী নেতা লেনিনের উপযুক্ত উপস্থাপনা ও নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণিকে সহজেই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়। ফলে অসন্তুষ্ট শ্রমিকরাই বিপ্লবী শ্রেণিতে পরিণত হয়ে বলশেভিক বিপ্লবে মূল ভূমিকা পালন করে। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে শ্রমিক অসন্তোষই বলশেভিক বিপ্লবের পথ করে দেয়।

সার্ফদের পুনর্বাসন জটিলতা : ভূমিদাসদের দুর্গতি লক্ষ করে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এ প্রথার বিলোপ সাধনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তা শেষ অবধি ফলপ্রসূ হয়নি। এদিকে ভূমিদাস শ্রেণির দুর্দশা, তাদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন প্রভৃতি বেড়ে যায় নানা দিক থেকে। রাশিয়ায় বিদ্যমান সুদীর্ঘ সামাজিক অস্থিরতার এটাও অন্যতম কারণ হয়েছিল। ভূমিদাসরা সামন্ত প্রভুর হাত থেকে গ্রামীণ সংস্থা মীর এর অধীনে ন্যস্ত হলেও তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে সামন্তবাদ পতনের পটভূমিতে ভূমিদাসরা স্বাধীন কৃষকে পরিণত হয়। তবে রাশিয়ার সমাজে ভূমিদাসরা কৃষকে পরিণত না হয়ে পত্তন করে ভূমিহীন শ্রেণির। আর এজন্যই ১৯ শতকের শেষ এবং ২০ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়ায় শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি আত্মপ্রকাশে ব্যর্থ হয়। রাশিয়ার সমাজে একটি অভিজাত, অপরটি ভূমিহীন বরাবরই এ দুটি শ্রেণি বিদ্যমান ছিল। এক্ষেত্রে ১৯ শতকের শেষদিকে একটি সামাজিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় রাশিয়ার প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র সতেরো জন অভিজাত শ্রেণির, আর বাকি সবাই ভূমিহীন। সেক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রায় পুরো জমিই ছিল রাজপরিবার এবং সামন্ত অভিজাতদের দখলে। এক্ষেত্রে ভূমিহীন শ্রেণির সামাজিক অসন্তোষ, বিদ্রোহ ইত্যাদি বলশেভিক বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুত করে।

লেখক দার্শনিকদের ভূমিকা : বলশেভিক বিপ্লবের বেলায় ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মতই কিছু বিষয় মিলে যায়। সেক্ষেত্রে ফরাসি কবি, লেখক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও অধ্যাপকগণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তেমনি বিষয় লক্ষ করা যায় রাশিয়ার ক্ষেত্রে। জার্মান লেখক কার্ল মার্কসের লেখা বলশেভিক বিপ্লবে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে রুশ সাহিত্যিক পুসকিন, লিও টলস্টয়, দস্তয়ভস্কি, ইভান তুর্গনেভও জারদের প্রতিবাদ জানাতে থেমে থাকেননি। তাঁদের ক্ষুরধার লেখনীতে জার শাসনের অক্ষমতা, স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব, রাষ্ট্রযন্ত্রের আগ্রাসী রূপ, গণমানুষের উপর শোষণ-নির্যাতন আর নানা অন্যায়ের চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায়। এতে সহজেই সাধারণ মানুষের মাঝে জারবিরোধী মনোভাব বিস্তার লাভ করে। সমকালীন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কবি, দার্শনিক ও সাহিত্যিক রাশিয়ার উদারপন্থী অভিজাত সম্প্রদায়কে সমাজ পরিবর্তনে অনুপ্রাণিত করে। তারাও বলশেভিক বিপ্লব সংগঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিলেন।

নিহিলিজম ও নারোদনিক আন্দোলন : ১৯ শতকের রাশিয়ায় গড়ে ওঠা বেশ কয়েকটি গুপ্ত সংগঠনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিহিলিজম এবং নারোনিক। এরা জার শাসনের অত্যাচার, শোষণ ও স্বৈরতান্ত্রিকতা থেকে দেশকে মুক্ত করার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মাঠে নামে। তারা নানা দিক থেকে জার বিরোধী অবস্থান নিয়ে সাধারণ মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। অনেক নির্যাতিত মানুষ তাদের দলে গিয়ে যোগদান করে। তারা আর্থসামাজিক মুক্তির আশায় একের পর এক জার বিরোধী কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করে। জার শাসনের চরম দমননীতির মুখে এ দুটি আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী চরিত্র নিলে পরিস্থিতি হয়ে যায় আরো ভয়াবহ। তবে জারদের নিষ্ঠুর দমননীতির মুখে এ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও মুক্তির সংগ্রামে তাদের প্রয়াস ও আত্মদান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলে। নির্যাতিত রুশ জনগণ মুক্তির দিশারী হিসেবে গ্রহণ করে বলশেভিকদের।

অর্থনৈতিক সংকট : জারদের অপশাসনের মুখে রাশিয়ার অর্থনৈতিক দৈন্য চরমে ওঠে। বলশেভিক বিপ্লবের কারণ হিসেবে তাই এ সংকটকে চিহ্নিত করা যেতেই পারে। জার ও অভিজাত শ্রেণির ভোগবিলাসী জীবন, অর্থনীতিতে পরিকল্পনার অভাব, কৃষিক্ষেত্রে অনুর্বরতা, শিল্পক্ষেত্রে গতিহীন অবস্থান, শ্রমিকদের আন্দোলন ও অসহযোগিতামূলক আচরণ খাদের কিনারে এনে দাঁড় করায় তখনকার রাশিয়াকে। রাষ্ট্রযন্ত্র ক্রমশ জনদলনের হাতিয়ার হিসেবে জনমনে সৃষ্টি করে ত্রাস ও প্রাণভীতি। মানুষ উন্নয়নের স্বপ্নে নতুন করে কাজ করার উদ্যম হারিয়ে ফেলে। মানুষের কর্মহীন অবস্থার পাশাপাশি অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি অকার্যকর করে তোলে অর্থনীতিকে। দেশের অর্থনৈতিক সংকট সাধারণ মানুষ বিশেষ করে শ্রমিক ও ভূমিদাসদের জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই রাশিয়ার মানুষ স্বাগত জানায় বলশেভিক বিপ্লবকে ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয় : জারের দুঃশাসন আর চরম দমন নীতির বিপরীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক বিপর্যয় ঘটে। যুদ্ধে জারের প্রতি জনগণের কোনো সমর্থন না থাকলেও সামরিক বিপর্যয়ের মুখে জার সরকার গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদেরকে জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করে। তাদের জন্য সামরিক-বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। নানা স্থানের যুদ্ধে রাশিয়ান বাহিনীর বিপর্যয়, সেনাবাহিনীতে অনিয়মিত সরবরাহ, খাদ্য ঘাটতি, কয়লার অভাবে নিষ্ক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা রুশ সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যায়। সেনাবাহিনীর এবং দেশের এই দুরবস্থার জন্য সাধারণ মানুষ জারকেই দায়ী করে। হাতে অর্থকড়ি না থাকলেও তখন অনেক মানুষের হাতে অস্ত্র চলে যায়। বিশ্বযুদ্ধে সফল না হলেও তারা এসব অস্ত্র এবং অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণকে কাজে লাগায় জারের বিরুদ্ধেই। এ ধরনের অস্ত্রধারী যুদ্ধের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকরা যখন জারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করাকেই প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে তখন সহজেই বিদায় ঘণ্টা বেজে যায় জারতন্ত্রের। পক্ষান্তরে দেশের এমন বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে রাশিয়ার জনগণের পাশাপাশি তারাও লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টিকেই ত্রাণকর্তা জ্ঞান করে। তারা বলশেভিকদের একমাত্র মুক্তিদাতা হিসেবে বিবেচনা করেই লিপ্ত হয় জারবিরোধী বিপ্লবে।

পাঠ-৪.৫ বলশেভিক বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ ও ফলাফল

আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকগুলো কারণ সামনে রেখেই সংঘটিত হয়েছিল বলশেভিক বিপ্লব। বিশেষ করে ২০ শতকের শুরুতে রাশিয়ায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে। তারা পশ্চিম ইউরোপের আদলে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনতন্ত্র তথা প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় পরিষদ, দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা, নাগরিক স্বাধীনতা, সমাজে সমাধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি দাবি করে বসে। এদিকে গণমানুষের ধর্মের স্বাধীনতা, শিক্ষার সুযোগ, দায়িত্বশীল প্রশাসনিক কাঠামোর বিকাশ প্রভৃতি নিয়ে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। যারা সমাজ সংস্কার ও গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি আধুনিক রাশিয়া নির্মাণ করতে চেয়েছিল খড়গহস্তে তাদের উপর উন্মত্ত হয় রুশ সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস এবং তাঁর অত্যাচারী মন্ত্রী প্লিভি। তারা প্রগতিশীলদের দাবির বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করে আন্দোলনের উত্তাপ আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে তোলে।

বিপ্লবের নেতৃত্বে লেনিন

১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় রাশিয়া। এ পরাজয় জার শাসনের বিরুদ্ধে দেশকে উত্তাল করে তোলে। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষক সমাজের এ সময় তুমুল আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয় দেশব্যাপী। তাদের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তখন জার দ্বিতীয় নিকোলাস রাশিয়ার জাতীয় পরিষদ ডুমার অধিবেশন আহ্বান করেন। এখানে পরিস্থিতির দায় বুঝে জারের পক্ষ থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বেশ কয়েকটি দাবি মেনে নিতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি কিছুটা সামাজিক সুবিধা অর্জন করলেও শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষ তাদের ভাগ্যবদল করতে পারেনি। বাস্তবে তাদের মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য অপূরণীয় থেকে যায়।

পোল্যান্ড থেকে রাশিয়ার সেনা বিতাড়ন জার্মানির কাছে কচুকাটা হয়ে লেজ গুটিয়ে পালানো রাশিয়ার জনমনে ধিক্কার ও ঘৃণার প্রহর আরো প্রলম্বিত করে। সাধারণ মানুষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার এ সামরিক বিপর্যয়ের জন্য পুরোপুরি জারকে দায়ি করে তাঁর প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এদিকে রাশিয়াজুড়ে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও খাদ্যের অভাব মানুষকে এনে দাঁড় করায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। তারা জীবন বাঁচানোর দায় এবং গণমুক্তির আশায় দেশজুড়ে গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে ব্রতী হয়। এসময় নানাস্থানে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয় এবং কৃষক বিদ্রোহ চারদিকে ছড়িয়ে যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে খাবারের কষ্ট ও মানবেতর জীবনযাপনকারী সৈনিকরাও এবার বেঁকে বসে। তারা সংকটের মুখে কমান্ডারদের আদেশ অমান্য করে। অভাবি নির্যাতিত যেসব কৃষককে জোরপূর্বক দলে দলে সেনাসদস্যে পরিণত করা হয়েছে তারা রণাঙ্গন ছেড়ে এসে এবার শ্রমিক, কৃষকের সাথে যোগ দেয়। এতদিনে জারতন্ত্র ও অভিজাতদের অত্যাচার-নিপীড়নের সব শোধ তোলার জন্য অস্ত্র হাতে উন্মুখ হয় তারা। তাদের উপস্থিতিতে সাহসে বলীয়ান হয়ে আমজনতা পুরো রাশিয়ায় ঘটিয়ে দেয় এক ব্যাপক অভ্যুত্থান। ১৯১৭ সালের ৮ মার্চে শ্রমিক, আমজনতা আর কৃষকেরা রাস্তায় নেমে এসে দখল নেয় পেত্রোগ্রাদ।

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের সেনাপতি ইভানভ অনেক কষ্টে পেত্রোগ্রাদ দখল করতে সক্ষম হন। তবে জনগণের দাবির মুখে জার সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এভাবেই প্রাচীন রোমানভ রাজবংশের অবসানে রুশ বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

১৯১৭ সালের মার্চে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মুখে জারের সিংহাসন ত্যাগ ক্ষমতার রদবদল ঘটায়। তখন একটি বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির সরকার গঠিত হয়। দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন প্রগতিশীল মানুষ ও নরমপন্থীদের প্রতিনিধিরাই ছিলেন মন্ত্রিসভার সদস্য। এ মন্ত্রিসভা ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই তাদের কর্মসূচি ঘোষণা করে। তারা নির্বাচিত গণপরিষদ, রাশিয়ার জন্য সাংবিধানিক সংস্কার প্রবর্তন, গণপরিষদে দেশের ভূমি সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ, দেশে গণতান্ত্রিক সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি হস্তক্ষেপ বন্ধ, ধর্ম ও বাকস্বাধীনতা প্রদান প্রভৃতি বিষয়কে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরে। মার্চ বিপ্লব পরবর্তী এ কর্মসূচি অনেকটাই পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর অনুকরণে গৃহীত একটি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ। তবে রাশিয়ায় বিদ্যমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে এ জাতীয় সংস্কার সময়োপযোগী ছিল না। বিশেষ করে এর সাথে রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনে এর সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। এর জন্য আরো দীর্ঘ সংগ্রাম প্রয়োজন তা অন্তত একটু দেরিতে হলেও বুঝতে সক্ষম হয় রাশিয়ার কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি।

মার্চ বিপ্লবে কৃষক ও শ্রমিক এ দুই শক্তি মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়নি। তবে মার্চ বিপ্লবের এই সাফল্যে বলীয়ান হয়ে নতুন করে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলার পথ পায় তারা। বিশেষ করে কৃষকরা জমি বিতরণের দাবি আরো জোরালো করে। শ্রমিকরা পুঁজিবাদ ধ্বংসের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে শুরু করে। অধিকার আদায়ে প্রায় মরিয়া শ্রমিক ও কৃষকদের দাবি পূরণে বুর্জোয়া সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে বিপ্লবের কৌশলগত কারণে বলশেভিক পার্টি বুর্জোয়া শ্রেণিকে সমর্থন দিয়ে বিরাট ভুল করেছিল। তারা ক্ষমতা দখলের জন্যই যে এটা করেছিল এতদিনে প্রমাণ হয়ে যায়।

লেনিন দেখলেন বলশেভিক পার্টির লক্ষ্য যেখানে প্রলেতারিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা তারা কিভাবে মধ্যবিত্ত আকুতিতে নিজেকে জড়াতে গেলেন? বিষয়টি যখন খুব উদ্বিগ্ন করছে সবাইকে তখন বলশেভিক নেতা লেনিন অবস্থান করছিলেন সুইজারল্যান্ডে। তিনি ১৯১৭ সালের এপ্রিলে দেশে ফিরে বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এই মর্মে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি স্পষ্ট করে দেন রাশিয়ার সরকার পরিচালিত হবে শ্রমিক ও কৃষকের দ্বারা। এক্ষেত্রে মার্চ মাসের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বলশেভিক বিপ্লবের প্রথম পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করতেও ভুল হয়নি তাঁর। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন বিপ্লবের চূড়ান্ত স্তর হলো জমিদার ও পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করে আমজনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। শুধু এর মাধ্যমেই প্রলেতারিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা এবং কৃষক-শ্রমিকের অধিকার পূরণ সম্ভব হবে বলে মনে করতেন তিনি।

রাশিয়ান সমাজে দীর্ঘকাল ধরে ভারি শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা নিয়ে সরকার ও অভিজাতদের মধ্যে টানাপড়েন চলে। পাশাপাশি চাষযোগ্য জমি কৃষকদের কাছে হস্তান্তরের বিষয়টিও ছিল অমীমাংসিত। অন্যদিকে লেনিন চলমান এককেন্দ্রিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে স্থানীয় ক্ষমতা আঞ্চলিক সোভিয়েতের হাতে দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। তবে ১৯১৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে রাশিয়ায় ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিলে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তখনকার বুর্জোয়া সরকার প্রায় যুদ্ধকালীন এহেন পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। দেশের অভ্যন্তরে সব পণ্যের অভাবের পাশাপাশি খাদ্য সংকট তীব্র রূপ নেয়।

পণ্য ও খাদ্যসংকটের মধ্যে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘার মত হাজির হয় জার্মান বাহিনী। তারা রাশিয়ার অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চল একের পর দখল করতে থাকে। তাদের আক্রমণে পেত্রোগ্রাদের নিরাপত্তা পর্যন্ত বিপন্ন হয়। এমন সামরিক সংকটের মুখে দেখা দেয় ভয়াবহ সেনাবিদ্রোহ। ফলে একদিকে জার্মান আক্রমণ অন্যদিকে দেশের সেনাবাহিনীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এর সবই মোকাবিলা করতে হয়েছিল তখনকার বলশেভিক সরকারকে। তবে উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে এমন পরিস্থিতিতেও বলশেভিকরা বিভিন্ন অঞ্চলের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এ সময়ে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির দুই নেতা ট্রটস্কি ও স্টালিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাদের যোগ্য নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির হাজার হাজার সদস্য পুরো রাশিয়ায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তারপর একটি কনভয় পেত্রোগ্রাদের দিকে অগ্রসর হয়। জনগণের সমর্থন লাভ করায় ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর বলশেভিকরা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনাগুলোতে হানা দেয়। তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ভবন, ব্যাংক,

টেলিফোন এক্সচেঞ্জসহ প্রায় সব ধরনের স্থাপনা দখল করে নেয়। তারা পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এরপর লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা দেয়।

সারাংশ

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হিসেবে বলশেভিকদের কৃতিত্ব অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তবে তখনকার রাশিয়ান বাস্তবতায় এটা যতটা কার্যকর ছিল বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় এর যৌক্তিকতা ও কার্যকর অবস্থান নিয়ে নানা তর্ক উঠেছে। তখন যেভাবে বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা এখনকার হিসেবে অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। দীর্ঘদিনের সামন্ত ভূস্বামীদের শোষণ, অত্যাচার এবং পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণের অবসানে রাশিয়ায় একটি বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। আর বিপ্লবের সবগুলো চলককে কার্যকর দেখে উপযুক্ত সময়ে উত্থান ঘটেছিল লেনিনের মত যোগ্য নেতার। তিনি সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন, আর প্রয়োজনের সময় ব্যাটেবলে সুন্দর সংযোগও ঘটে যায় তার, তারপর ছক্কা। এতে করে বদলে যায় রাশিয়ার সনাতনী সামাজিক সম্পর্ক, প্রশাসনিক কাঠামো, অর্থনৈতিক অবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রনীতি থেকে শুরু করে আরো কতকিছু। বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর চরম আঘাত করে এই বলশেভিক বিপ্লব। প্রকারান্তরে এ বিপ্লবের সফলতা শ্রমিক ও কৃষক সমাজকে শোষণ বঞ্চনার হাত থেকে উদ্ধার করে বিশ্ব জুড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আরো অনুপ্রাণিত করে। বলতে গেলে বলশেভিক বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৯ সালে সংঘটিত হয় চৈনিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

হিটলার ও মুসোলিনির উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

ইউনিট ৫

ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিস শান্তি সম্মেলন প্রকৃত অর্থে ইউরোপের শান্তি আনতে পারেনি। জার্মানির ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া ভার্সাই চুক্তির অপমানজনক শর্তগুলোকে সামনে রেখে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে তারা। ইতিহাস জয়ীর পক্ষে, পরাজিত শক্তির ক্ষেত্রে সবকিছু হয় নেতিবাচক এ কথাটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মহাসত্য। বিশেষ করে প্রচলিত ইতিহাসে জার্মান নেতা হিটলার এবং তার মিত্র ইতালি ও জার্মানির ভূমিকাকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয় সেখানে মূল ঘটনা অনেকটাই বাদ পড়ে যায়। পরস্পর আক্রমণ প্রতি আক্রমণের প্রচলিত রীতি বাদ দিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিছক একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এক্ষেত্রে প্রচলিত ঐতিহাসিক কাহিনীগুলোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলতে অক্ষশক্তি ও জার্মান নেতা হিটলারের পৈশাচিক রুদ্রমূর্তি নানা ঘটনার ঘনঘটায় বার বার উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব ঘটনার প্রায় প্রতিটিই পরিস্থিতি বিচারে অর্ধসত্য এবং অনেক ক্ষেত্রে অসত্যও বটে। তাই প্রচলিত ইতিহাসের এ বর্ণনাগুলোকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনায় পুনঃপাঠ ও তার কার্যকারণ সম্পর্কভিত্তিক আলোচনা করা জরুরি। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বিশ্বজুড়ে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা নতুন করে আরেকটি যুদ্ধে জড়াতে প্রণোদিত করে বিশ্বনেতাদের। বিশেষ করে জার্মানির জন্য অপমানজনক ভার্সাই চুক্তির পাশাপাশি প্যারিস শান্তি সম্মেলনের ব্যর্থতা আরেকটি যুদ্ধের পথ করে দেয়। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে গ্রেট ডিপ্রেশন তথা মহামন্দাকেও। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি ও কারণ বোঝার ক্ষেত্রে দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীর ইউরোপের ইতিহাসও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

- ✓ **পাঠ- ৫.১ মহামন্দা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি**
- ✓ **পাঠ- ৫.২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ**
- ✓ **পাঠ- ৫.৩ হিটলার ও মুসোলিনির উত্থান**
- ✓ **পাঠ- ৫.৪ ঘটন-অঘটনের বিশ্বযুদ্ধ**
- ✓ **পাঠ- ৫.৫ জার্মানির পরাজয় ও হিটলারের শেষ জীবন**

পাঠ-৫.১ মহামন্দা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ১৯২৯ সালের অক্টোবর থেকে বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি ছন্দপতন লক্ষ করা গেছে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বড় আকারের এই ছন্দপতনকে মহামন্দা তথা দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে জার্মানির ধ্বংসস্তূপের বিপরীতে বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিমান রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্র। তারা সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে অন্যদের ওপর দাপট দেখাতে শুরু করে। একইসাথে রেনেসাঁ-পরবর্তীকালে পশ্চিমা বিশ্বে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে পুঁজিবাদ। আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়মই হচ্ছে এখানে মাঝে মাঝে মন্দাভাব দেখা দেয়। তবে ঝড়ের বেগে এসে এই মন্দাভাব ও পুরো বিশ্ব অর্থনীতিকে গ্রাস করবে, তা ছিল কল্পনাতীত।

হঠাৎ করে সংকট উপনীত হওয়ার অনেকগুলো শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে বেড়ে যায় বেকার ও চাকরি প্রত্যাশী মানুষের সংখ্যা। ১৯২৯ সালের এই মন্দা অতীতে ঘটে যাওয়া সব ধরনের রেকর্ড ভঙ্গ করে। আর সেদিক থেকে ধরতে গেলে এর মহামন্দা নামকরণ স্বার্থক। এর প্রমাণ হিসেবে এক যুক্তরাষ্ট্রেই ১৯২৯-৩৫ সালের মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ব্যাংক বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান জেনারেল মোটরস প্রতিবছর পাঁচ মিলিয়ন গাড়ি তৈরি করত। তবে ১৯৩২-এ দেখা যায় এর গাড়ি নির্মাণের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। বিশ্ব বাজারে গাড়ির চাহিদা না থাকায় এমনটি হয়েছিল। আর তা থেকেই ধরে নেয়া যায় মহামন্দার প্রভাব পুরো বিশ্বে পড়েছিল।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নানা কারণে মহামন্দা সৃষ্টি হয়েছিল। শিল্পখাতের প্রসার ও এর সাথে পাল্লা দিয়ে পুঁজিবাদের সংকট চোখে পড়ার মত। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শিল্পখাতের গুরুত্ব অনেক ছিল। যুক্তরাষ্ট্র এসময় শিল্পখাতে উন্নয়নকাজ অনেক বিস্তৃত পরিসরে শুরু করে। এদেশের নীতিনির্ধারকগণ শিল্পখাতের বিপর্যয় চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে আরো নানা বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। অন্যদিকে কৃষিজাত পণ্যের অনর্থক দাম কমানোও মহামন্দার মত ঘটনাকে প্রণোদিত করতে পারে। তবে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রভাবে বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুই দশক না পেরোতেই ধরা পড়ে ভার্সাই চুক্তির সারশূন্যতা আর লীগ অব নেশনসের অকর্মণ্য অবস্থান। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব নতুন করে কেঁপে ওঠে আরেক দফা আক্রমণ আর হত্যাযজ্ঞের মর্মন্তুদ ঘটনায়। এরপর ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫, দেখতে দেখতে পার হয়ে গেছে ৬ বছর ১ দিন। তারপর আবার শান্ত হয়ে আসে ইউরোপের বিভিন্ন রণাঙ্গন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা কিংবা আটলান্টিক অঞ্চলের পাশাপাশি আফ্রিকার নানা স্থান। সেই অক্ষশক্তি জার্মানের পক্ষে এবার যোগ দিয়েছে ভিন্ন মিত্র ইতালি, জাপান, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া আর বুলগেরিয়া। আর যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের মিত্রবাহিনীতে এবারের বড় আকর্ষণ রাশিয়া। রুশপন্থী ইতিহাসবিদদের ক্রমাগত পুঁজিবাদ ভর্ৎসনা আর অতিরঞ্জিত বিবরণ থেকে বোঝা কঠিন হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসলে অক্ষশক্তি-মিত্রশক্তির মধ্যে হয়েছে, নাকি রুশ বনাম পুরো বিশ্ব হয়েছে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও অনুষ্ঠিত হয় অক্ষশক্তি আর মিত্রশক্তির মধ্যে। আর এবারে মিত্রশক্তির পুরোভাগে ছিল রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স চীন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রাজিল। ফলাফলটা শেষ পর্যন্ত এবারও বিপক্ষে গেছে অক্ষশক্তির।

মিত্রশক্তির ক্ষেত্রে দেখা গেছে রাশিয়ার নেতৃত্বে জোসেফ স্ট্যালিন, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও ট্রুম্যান, যুক্তরাজ্যের উইনস্টন চার্চিল, চীনের চিয়াং কাইশেক, ফ্রি ফ্রান্স আন্দোলনের নেতা দ্য গল ফরাসিদের নেতৃত্বে রয়েছেন। থার্ড রাইখ সরকারের প্রধান, নাৎসি বাহিনীর পুরোধা, এসএস এবং এসএ ফোর্সের উদ্ভাবক, জার্মানির বহুল আলোচিত-সমালোচিত নেতা অ্যাডলফ হিটলার ছিলেন অক্ষশক্তি তরফে নেতৃত্বের পুরোভাগে। ইতালির ফ্যাসিস্ট পার্টি নেতা বেনিতো মুসোলিনি এবং জাপানের সম্রাট হিরোহিতো ও প্রধানমন্ত্রী তোজো ছিলেন স্ব স্ব বাহিনীর নেতৃত্বে। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্যে দিয়ে বলতে গেলে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের উত্তাপ ছড়িয়ে বিশ্বজনীন রূপ লাভ করে যখন জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে বসে। এরপর হিরোশিমা নাগাসাকিতে বর্বর আক্রোশে যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক বোমা নিক্ষেপ ১৯৪৫ সালে জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। এরই মাঝে জার্মানি আত্মসমর্পণ করলে একটি গোপন বাংকারে আত্মহননের মাধ্যমে জীবনের সব গ্লানি মুছতে চেষ্টা করেন অ্যাডলফ হিটলার। ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ক্যালেন্ডারের পাতায় দুই দশকের বেশি সময় পার হয়নি; ঠিক ১৯৩৯ সালেই শুরু হয়ে যায় আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ। আর ফলাফল হিসেবে বিভিন্ন রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনীর প্রায় ১৬ লক্ষ সৈন্য নিহত হয়। এর বাইরে ৪৫ লাখের বেশি বেসামরিক মানুষ নিহত হয়।

পাঠ- ৫.২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ

অনেকগুলো পরস্পরবিরোধী কারণ সামনে রেখেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু। এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কারণকে এক এবং একমাত্র বলে দায়ী করা যায় না। এর পেছনে দীর্ঘমেয়াদে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তার মধ্যে তিনটি ঘটনা সবার আগে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২০ সালের দিকে ইতালির ফ্যাসিজম, ১৯২০ সালের দিকে জাপানি সামরিকবাদের বিকাশ এবং ঠিক তার এক দশকের মাথায় ১৯৩০ সালে চীন আক্রমণকে এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে। পাশাপাশি ১৯৩৩ সালে এসে জার্মানিতে উদ্ভব ঘটে কুশলী রাষ্ট্রনায়ক হিটলারের। যাকে বিশ্বের বেশিরভাগ ইতিহাসবিদ ঘৃণ্যতম স্বৈরতান্ত্রিক শাসক হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। তবে ইতিহাসের বাস্তবতায় হিটলার ছিলেন একটি উপলক্ষ মাত্র, যিনি ১৯৩৩ সালের দিকে নাৎসি পার্টির নেতা হিসেবে জার্মানির শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ভার্সাই চুক্তির অপমানজনক শর্তগুলোকে পায়ে মাড়িয়ে জার্মানিকে নতুন উদ্যমে মাথা তুলে দাঁড়াতে প্রণোদিত করেন।

১৯৩৯ সালে জার্মান বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করে বসলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিলিতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানির বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান কারণগুলোকে দার্শনিক, অর্থনীতি সম্পর্কিত ও বিশেষ কয়েকটি দিক বিচারে আলাদা করা যেতে পারে। যেমন মতাদর্শ, শাসনকাঠামো কিংবা দার্শনিক দিক থেকে চারটি কারণকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তা হচ্ছে সমাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদ (Anti-communism), সম্প্রসারণবাদ (Expansionism), সামরিকবাদ (Militarism) ও বর্ণবাদ (Racism)। অন্যদিকে ভার্সাই চুক্তি একটি ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। ভার্সাই চুক্তির প্রতি পরবর্তীকালে জার্মানির দৃষ্টিভঙ্গি, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাজার দখলের লড়াই, লীগ অব নেশন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা, ম্যাসন-ওভেরি তত্ত্ব (The Mason-Overy Debate) যা যুদ্ধের প্রতি ইউরোপীয় দেশগুলোকে প্রণোদিত করে। এর পাশাপাশি আরো কিছু সরাসরি কারণ ছিল যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে প্রণোদিত করে।

সরাসরি বলতে গেলে জার্মানিতে নাৎসি বাহিনীর নেতা হিটলারের ক্ষমতায় আরোহণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ, রাইনল্যান্ডে সেনা সমাবেশ, ইথিওপিয়ায় ইতালির আক্রমণ এর সবকিছুই আরেকদফা মহাযুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য করে বিশ্বকে। পাশাপাশি প্যান জার্মানিজমকে সামনে রেখে তৈরি মতবাদ (Anschluss), মিউনিখ চুক্তি, সোভিয়েত-জাপান সীমান্ত বিরোধ, ডানজিগ সংকট, মিত্র পক্ষের সাথে পোল্যান্ডের সংযুক্তি উত্তেজনার আগুনে ঘি ঢালে। অন্যদিকে মলটোভ-রিবেনট্রপ সংকট আরো তীব্রতা পেয়েছে ততদিনে। ধীরে ধীরে ক্ষমতা ও প্রভাববলয় বাড়িয়ে তোলা জার্মানি এবার আক্রমণ করে বসে পোল্যান্ডে। শক্তিশালী সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূমিকা এতদিনে আগ্রাসী রূপ লাভ করে। ঠিক তেমনি মুহূর্তে জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণ আরেকদফা যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য করে বিশ্বকে।

সমাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদ (Anti-communism)

১৯১৭ সালে রাশিয়ার শাসন ক্ষমতায় আসে বলশেভিক দল। এই দলের নেতারা সমাজতন্ত্রকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে চেষ্টা করেন। যে বিপ্লব রাশিয়ায় সফল হয়ে জার ক্ষমতার পতন ঘটিয়ে শ্রমিক দলকে ক্ষমতায় বসাতে পেরেছিল। তারা চেয়েছিলেন পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে যাক এই মতবাদ। বিশ্বের অন্যদেশ তাদের এই মনোভাব ভালোভাবে নিতে পারেনি। অন্যদিকে বিশ্বের যে দেশেই অনেকটা বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছে রাশিয়া সেখানে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেছে। তারা বিপ্লবী জনগোষ্ঠীকে অস্ত্র থেকে শুরু করে আর্থিক সহায়তা দিতে কার্পণ্য করেনি। এ কারণে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাশিয়াবিরোধী অবস্থান তুঙ্গে ওঠে। রাষ্ট্রগুলো চেয়েছিল যেভাবেই হোক রাশিয়াকে শায়েস্তা করতে, অন্তত সেটা করা সম্ভব না হলে রাশিয়ার দেখাদেখি তাদের দেশেও জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে রাশিয়া যদি বিদ্রোহী জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, তাদের পক্ষে ক্ষমতা ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে দেখা দেবে। বিষয়গুলোকে সামনে রেখে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করে সমাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদ। এ মতবাদ অনেকগুলো সাম্রাজ্যবাদী দেশকে একই পতাকার নিচে একত্রিত হওয়ার পথ করে দেয় যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ।

সম্প্রসারণবাদ (Expansionism) : একটি নির্দিষ্ট স্থানভিত্তিক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টাকে সম্প্রসারণবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ইতালির শাসন ক্ষমতায় এসে বেনিতো মুসোলিনি চেষ্টা করেছিলেন নতুন করে রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। এক্ষেত্রে পূর্বে রোমানদের অধীন দেশগুলোতে ইতালির আগ্রাসন সম্ভাব্য হয়ে দেখা দেয়। এ লক্ষ্য সামনে রেখে তারা ১৯৩৯ সালে আলবেনিয়া আক্রমণ করে, গ্রিসের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের চেষ্টা চালানোর পাশাপাশি ১৯৩৫ সালে ইথিওপিয়া আক্রমণ করে বসে। এ বিষয়গুলো লীগ অব নেশনসের নীতিমালাবহির্ভূত কাজ। এমনি আগ্রাসী চিন্তা দ্রুতই একটি বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে যা জার্মানির সরাসরি ভূমিকায় বাস্তব রূপ লাভ করে।

সামরিকবাদ (Militarism) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যুদ্ধ শুরুর বেশ আগে থেকেই সশস্ত্র শান্তির যুগে একের পর এক বিস্তৃত হতে থাকে সামরিকবাদ। প্রতিটি দেশ আর্থিক দৈন্য উপেক্ষা করে ধীরে ধীরে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ করে তোলে সামরিক বাহিনীর আকার। এক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের সেনাবাহিনীর ট্রেনিং নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর এক দশক আগে থেকে অনেকগুলো দেশে সামরিক বাহিনীর আকার বৃদ্ধি থেকে শুরু করে সমরসজ্জা বাড়িয়ে তুলতে দেখা যায়। সেনাবাহিনীর এই আকৃতিগত সম্প্রসারণ তাদের নতুন করে আরেকটি যুদ্ধে জড়িত হতে প্রণোদনা দেয়।

বর্ণবাদ (Racism)

জার্মানি ও ইতালির একত্রীকরণ ইউরোপে রাজনীতির প্রেক্ষাপট পাল্টে দেয়। তারা প্রথমে নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হয়, পরে আত্মপ্রকাশ করে উগ্র জাতীয়তাবাদী হিসেবে। শেষ পর্যন্ত প্যান জার্মানিজম মতবাদের আওতায় তারা প্রকাশ ঘটাতে থাকে নানা ন্যক্কারজনক চিন্তা চেতনার। এদিকে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ইতালির মত দেশগুলোও বর্ণবাদী চিন্তায় পিছিয়ে থাকেনি। পাশাপাশি সোশ্যাল ডারউইনিজমের চিন্তা একবার বিস্তৃতির সুযোগ হলে তা ছড়িয়ে পড়ে বেশ দ্রুত। এর প্রভাবে প্যান শ্লাভিজম, প্যান ইতালিজম, প্যান জার্মানিজম প্রভৃতি চিন্তাকে উসকে দেয়। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের মত বিষয়গুলো এ মতবাদকে প্রণোদিত করে। ধীরে ধীরে অভিবাসন অঞ্চল ধরে রাজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা পেয়ে বসলে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ে।

ভার্সাই চুক্তির দুর্বলতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে ভার্সাই চুক্তির দুর্বলতা ও জার্মানির ওপর চাপিয়ে দেয়া ফ্রান্সের প্রতিশোধপরায়ন শর্তগুলো। এ চুক্তি এমনভাবে দাঁড় করানো হয় যে যেকোনোভাবে জার্মানি যাতে ঘুড়ে দাঁড়াতে না পারে। শেষ পর্যন্ত জার্মানি নিজেদের দুরবস্থার কথা বুঝতে পারে এবং সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিশেষ করে উড্রো উইলসনের ১৪ দফাকে সামনে রেখে এমন কিছু শর্ত এখানে চাপিয়ে দেয়া হয় যা ক্রমাগত জার্মানির দারিদ্র্য ও মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে তোলে। এদিকে বিশ্বের নানা স্থানে থাকা জার্মান উপনিবেশগুলোও তাদের থেকে কেড়ে নেয়া হয়। এতে আর্থিক দিক থেকে ক্রমশ নাজুক অবস্থানে চলে যেতে থাকে তারা।

ফ্রান্সের নিরাপত্তানীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ফ্রান্স তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অদ্ভুত কিছু দাবি উত্থাপন করে। আপাত দৃষ্টিতে পুরোপুরি অবাস্তব মনে হলেও শক্তিবলে মিত্রশক্তি এ দাবিগুলো জার্মানির ওপর চাপিয়ে দেয়। এতে করে ফ্রান্সের নিরাপত্তা যতটুকু নিশ্চিত হোক আর নাই হোক অন্তত জার্মানি ধীরে ধীরে পঙ্গু হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে সামরিক বাহিনী সংকোচনের পাশাপাশি নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী বিলুপ্তির দাবি জাতি হিসেবে জার্মানির অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে। এর জন্য তাদের মধ্যে একটি প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করেছে শুরু থেকেই। এদিক থেকে ধরলে ফ্রান্সের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নামে জার্মানিকে শায়েস্তা করার যে পথ মিত্রবাহিনী অবলম্বন করে তা থেকেও যুদ্ধ অনেকটা আসন্ন হয়ে পড়েছিল।

প্যারিস শান্তি সম্মেলন

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে এর পরের বছর ১৯১৯ সালে বসানো হয় প্যারিস শান্তি সম্মেলন। নামের দিক থেকে একে প্যারিস শান্তি সম্মেলন বলা হলেও এতে আদৌ কোনো শান্তি আসেনি। উপরন্তু এতে নতুন অশান্তির বীজ উপ্ত হয়েছে ইউরোপে। এক্ষেত্রে মিত্রবাহিনীর তরফ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে দেয়া হয় জার্মানির ওপর। আর তারা এজন্য দোষী সাব্যস্ত করে নানা দিক থেকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করে। একটি শান্তি প্রস্তাবনার কথা বলা হলেও সেখানে পরাজিত শক্তিকে উপস্থিতই থাকতে দেয়া হয়নি। এর থেকে তাদের মধ্যে প্রতিশোধপ্রবণতা তৈরি হতে পারে। এক্ষেত্রে রাইনল্যান্ডের কয়লাখনির ওপর ভাগ বসিয়ে মিত্রবাহিনী জ্বালানি শক্তি এবং অর্থনীতি দুদিক থেকেই জার্মানিকে পঙ্গু করে তোলার চেষ্টা চালায়। এ ধরনের বিষয়গুলো পরবর্তীকালে তাদের প্রতিশোধস্পৃহা বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। আর তা থেকে আরেকটি যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়া ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

জার্মানির প্রতিক্রিয়া

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে অনেকগুলো চুক্তির পাশাপাশি এমন কয়েকটি শর্ত তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় যা জার্মানির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভাগ্যলিপিতে কালিমা লেপন করে। একের পর এক সরকার পরিবর্তন হলেও জার্মানির মানুষের ভাগ্য

পরিবর্তন হয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। এসময় বিভিন্ন ধরনের দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আপসকামী সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে হিটলারের নেতৃত্বাধীন নাৎসি পার্টি। নাৎসি নেতারা জার্মানির মানুষকে বুঝিয়ে বৈপ্লবিক অবস্থানে নিয়ে যায়। তারা পুরো জার্মানিকে বোঝাতে সক্ষম হয় তাদের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য লেজ গুটিয়ে থেকে অপমানজনক শান্তির পথ বেছে নেয়ার চেয়ে সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। জনগণ তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শ্রদ্ধা দেখায়। নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতায় আসে হিটলার নেতৃত্বাধীন নাৎসি পার্টি। গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় এলেও অল্পদিনের মধ্যে পুরোপুরি স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোয় জার্মানির শাসনব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে কালবিলম্ব করেননি হিটলার। তার ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে সব ধরনের অন্যায় চুক্তির প্রতি জার্মানির বিরোধী অবস্থান লক্ষ করা যায়। নানা ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে হিটলার সরকারের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আসন্ন করে তোলে।

প্রতিযোগিতামূলক বাজার

ইউরোপের দেশগুলো বিশ্বের নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করার পাশাপাশি বাণিজ্য বিস্তার শুরু করে। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির বিভিন্ন স্থানের খনিজ সম্পদের উপরেও ভাগ বসায় তারা। এতে করে ইউরোপে এক ধরনের অর্থনৈতিক অসাম্য তৈরি হয়। জার্মানি নিজেদের দেশে অবস্থিত খনি থেকে উত্তোলন করা জ্বালানি তাদের কাজে ব্যবহার করতে পারেনি। পক্ষান্তরে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড এ থেকে সুবিধা নিয়ে অর্জিত শক্তি জার্মানির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকে। এদিকে সাখালিন দ্বীপের তেলের খনির দখল নিয়ে জাপানের সাথে সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ান সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণকে সে দফায় ঠেকিয়ে দিয়ে পূর্ব এশিয়ায় তাদের অগ্রগতি রোধ করতে সক্ষম হয় জাপান। এরপর ১৯৩১ সালের পর থেকে জাপান এশিয়ার একাধিপতি হিসেবে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করে তুলতে প্রয়াসী হয়। ১৯৩৭ সালের দিকে বৃহত্তর এশিয়া বাণিজ্যিক অঞ্চল নিশ্চিত করতে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে বসে জাপান। এসময় ঘটে যায় কুখ্যাত 'নানকিং ম্যাসাকার' নামে গণহত্যার ঘটনা। এভাবে নানা সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধকে বৈশ্বিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার আভাস লক্ষ করা যায়।

জাতিপুঞ্জের সমস্যা

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে লীগ অব নেশনস তথা জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নানা দিক থেকে সমস্যায় জর্জরিত ছিল। অর্থনীতি, রাষ্ট্র, রাজনীতি, নিরাপত্তা, কূটনৈতিক পরিসর কিংবা সমরনীতি সব দিক থেকেই অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে তোপ দাগার প্রবণতায় মনোযোগী ছিল এ সংগঠনটি। জার্মানি ও তার মিত্ররা এই নীতির অসারতা শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু প্রথমে তারা দুর্বল থাকায় সরাসরি এর বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেনি। পরে ধীরে ধীরে তারা শক্তি সঞ্চয় করে বিরুদ্ধ অবস্থান নেয়। একের পর এক চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে জাতিপুঞ্জকে একটি পঙ্গু সংগঠন হিসেবে প্রমাণ করে তারা। ফলে অলীক শান্তির বাণী শুনিয়ে যে কাল্পনিক প্রতিষ্ঠান মিত্রবাহিনী দাঁড় করিয়েছিল তা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। এতে আরেকটি ভয়াবহ যুদ্ধ আসন্ন হয় যা বুঝতে কারো বাকি থাকেনি।

ম্যাসন-ওভেরি বিতর্ক (The Flight into War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ নিয়ে ম্যাসন ওভেরি বিতর্ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র। এক্ষেত্রে ১৯৮০ সালের দিকে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ রিচার্ড ওভেরি (Richard Overy) ও টিমোথি ম্যাসনের (Timothy Mason) মধ্যে যে তর্ক হয় সেখানে ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ লাগার নানা কারণ স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে ম্যাসন মনে করে একটি কাঠামোগত আর্থিক সংকটই হিটলারকে এই প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল। তবে ওভ্যারি তার থিসিসে এ বিষয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি মনে করেন যদিও জার্মানিতে আর্থিক সংকট চলছিল তা পোল্যান্ডে আক্রমণ চালানোর মত ঘটনাকে সমর্থন দেয় না। এক্ষেত্রে ঘরে বাইরে একনায়কের দাপট প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টার জন্য তিনি জার্মানিতে গড়ে ওঠা নাৎসি স্বৈরতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেন। সব মিলিয়ে তাঁদের গবেষণা ও বিতর্কিত অবস্থান থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর কারণগুলো সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছে।

বেনিতো মুসোলিনি

উদারপন্থী শাসনের নামে পুরো ইতালিতে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ইতালির জন্য এমনি এক আপত্তিকর মুহূর্তে এগিয়ে আসেন বেনিতো মুসোলিনি। প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করতে গিয়ে জীবনের ঘানি টানতে ব্যর্থ মুসোলিনি চলে যান

সুইজারল্যান্ড। তারপর দেশে ফিরে তিনি গঠন করেন আধাসামরিক এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যার নাম ফ্যাসিস্ট পার্টি। এ বাহিনী তাদের নেতা মুসোলিনির বক্তব্যকেই নীতি ও আদর্শ হিসেবে মেনে প্রাচীন ইতালির সম্ভ্রম পুনরুদ্ধারে ব্যাপৃত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই মুসোলিনি একটি শক্তিশালী সামারিক দল গঠন করেন। ১৯২২ সালের দিকে হাজার হাজার ফ্যাসিস্ট স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে রাজধানী রোমের পথে রওনা হন মুসোলিনি। তখনকার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলস বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেও তারা তার নির্দেশ মানেনি। এরপর ক্ষমতায় চলে আসেন ফ্যাসিস্ট পার্টির নেতা মুসোলিনি। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসলেও সময়ের আবর্তে তিনি এক প্রভাবশালী স্বৈরশাসক বনে যান। তার নেতৃত্বেই ইতালি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির স্বপক্ষে যুদ্ধ করে। প্রথম দিকে জার্মানি একের পর এক অঞ্চল দখল করে নিলেও তিনি নীরব থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সময়টাকে কাজে লাগিয়ে তিনি চেষ্টা করেন নতুন করে ইতালির সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানো যায় কি না সে বিষয়ে।

রাইনল্যান্ডে সেনা সমাবেশ

অপমানজনক ভার্সাই চুক্তিকে ঘোষণা দিয়ে অস্বীকার করে থার্ড রাইখ তথা হিটলার নেতৃত্বাধীন নাৎসি সরকার। ১৯৩৬ সালের মার্চের ৭ তারিখে রাইনল্যান্ডে সেনা সমাবেশ করে জার্মানি। এখানকার স্ট্রেসা ফ্রন্ট তার ভূ-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে ছিল। পশ্চিম জার্মানির ঠিক সে স্থানে জার্মান সৈন্যরা অবস্থান গ্রহণ করে যা ভার্সাই চুক্তি লঙ্ঘনের শামিল। তখনকার ফ্রান্সে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দ্রুত এর প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেনি। রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের তাঁর জীবনীতে লিখে গেছেন এখানে সেনা সমাবেশ শুধু ভার্সাই চুক্তির লঙ্ঘনই না, পাশাপাশি নতুন এক জার্মানির উত্থানবার্তা সবার কাছে জানান দেয়া।

ইতালির ইথিওপিয়া আক্রমণ

স্ট্রেসা সম্মেলন শেষ হলে ইতালি তার প্রভাববলয় বিস্তৃতির চেষ্টা চালায়। অ্যাংলো-জার্মান নেভাল এগ্রিমেন্ট ইতালির শাসক বেনিতো মুসোলিনিকে আফ্রিকা অভিমুখে তার সাম্রাজ্য বিস্তৃতির পথ দেখায়। এ পরিস্থিতিতে লীগ অব নেশনস ইতালিকে একটি আগ্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে দেশটির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বলে সবাইকে। ইতালি কোনো নিষেধাজ্ঞার ধার না ধেরে আক্রমণ পরিচালনা করে একের পর এক ভূখণ্ড দখল করতে থাকে। তারপর ৭ মে ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া ও সোমালিয়া দখল করে তিনটি দেশ একত্রিত করে ইতালিয়ান ইস্ট আফ্রিকা নামে একটি উপনিবেশ পত্তন করে। এরপর ১৯৩৬ সালের ৩০ জুন সম্রাট হাইলে সেলাসি ইতালির কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করে লীগ অব নেশনসে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে মুসোলিনি লীগ অব নেশনস থেকে তার দেশের সদস্যপদ প্রত্যাহারের কথা সাফ জানিয়ে দিতে একটুও সময় নেননি। এর ফলে নতুন করে উত্তপ্ত হয় ইউরোপ।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ

নন্দিত শিল্পী পাবলো পিকাসো তার বিখ্যাত জার্মেনিকা চিত্রকর্মটি অঙ্কন করেন ১৯৩৭ সালের দিকে। এখানে নাৎসি বাহিনীর নানা আক্রমণের দৃশ্য তুলির আঁচড়ে তুলে আনার একটি প্রচেষ্টা ছিল। তবে এ চিত্রকর্মটির থিম এতটাই বিচিত্র সেখান থেকে সারবস্তু খুঁজে বের করা বেশ কষ্টকর। স্পেনের দুটি পক্ষের দ্বন্দ্ব থেকে গৃহযুদ্ধের উপক্রম হলে জাতীয়তাবাদী সামরিক নেতা জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোকে অ্যাডলফ হিটলার ও বেনিতো মুসোলিনির পক্ষ থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়া হয়। অন্যদিকে স্প্যানিশ রিপাবলিকের পক্ষে লড়তে থাকা পক্ষকে সমর্থন দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৩৬ থেকে শুরু করে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এমনি নানা টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে স্পেনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ধীরে ধীরে স্পেনের অভ্যন্তরীণ সংঘাত ইতালি-জার্মান পক্ষে বিপরীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বন্দ্বে রূপ নেয়। এ ঘটনাও তখনকার রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে প্রণোদিত করেছিল।

দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ

আগ্রাসী জাপানি রাজতন্ত্র চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়ার শাসনকাজে একজন পুতুল শাসককে বসায়। এরপর ১৯৩৭ সালের দিকে মার্কোপলো সেতু দুর্ঘটনা নিয়ে দ্বিতীয় চীন জাপান যুদ্ধ শুরু হয়। জাপান চীনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একের পর এক বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। ১৯৩৭ সালের ২২-২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জাপান চীনের সাংহাই, নানকিং, গুয়াংঝাউ ও বেজিংয়ের নানাস্থানে বোমাবর্ষণ করে। এসময়েই জাপানের রাজকীয় বাহিনী (Imperial Japanese Army)

নানকিংয়ের কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধ ঘটিয়েছিলো। তারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যার পাশাপাশি তাদের লালসার শিকার হয় কয়েক লক্ষ নারী। এঘটনা এশিয়ার শান্তি বিনষ্ট করে।

আনস্কুলস (Anschluss)

১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়ার বাহিনী জার্মানির একটি বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে নেয় যাকে আনস্কুলস (Anschluss) নামে অভিহিত করা হয়। প্যান জার্মানিজম মতবাদ জার্মান জাতিসত্তার অন্তর্গত বিভিন্ন মানুষকে একই ভৌগোলিক পরিসরে একটি স্বাধীন রাজনৈতিক মানচিত্রের অধীনে নিয়ে আসার স্বপ্ন দেখায়। এ উপলক্ষেই হিটলারের নাৎসি বাহিনী কাজ শুরু করে। তারা সবার আগে স্ট্রেসা ফ্রন্ট থেকে ১৯৩৫ এর দিকে যে অস্ট্রিয়া আত্মপ্রকাশ করে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসে। পাশাপাশি তাদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে রোম-বার্লিন সমঝোতা বৃদ্ধি করে। পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হলে জার্মানি বাহিনী অগ্রসর হয়ে অস্ট্রিয়ার বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করে। এরপর ধীরে ধীরে অস্ট্রিয়ার পক্ষের শক্তিগুলো নিজেদের অবস্থান জানান দিতে বাধ্য হলে জার্মান-ইতালি ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে যায়; যা আরেকটি যুদ্ধেরও প্রস্তুতিও বটে।

মিউনিখ চুক্তি

চেক প্রজাতন্ত্রের সীমান্তঘেঁষে অবস্থিত সুডেটারল্যান্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ জার্মান অঞ্চল। ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে মিত্রবাহিনী এ অঞ্চলকে জার্মানির থেকে কেড়ে নিয়ে নবগঠিত চেকোস্লোভাকিয়া তথা বর্তমান চেক প্রজাতন্ত্রকে দান করে। জার্মান নেতা হিটলার এটা মেনে নিতে না পেরে ১৯৩৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিনের সাথে একটি বৈঠকে মিলিত হন। তিনি যেকোনো মূল্যে সুডেটার জার্মানির দখলে নেয়ার হুমকি দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তার পাশাপাশি চেকোস্লোভাকিয়ারও একটি শক্তিশালী সেনাদল ছিল। তারা এগুলো কাজে লাগিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ অবস্থায় ১৯৩৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষর করা হয় মিউনিখ চুক্তি। ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারেননি হিটলার কতবড় দাবি জানাতে পারেন। তখন চেকোস্লোভাকিয়ার শান্তি নিশ্চিতকল্পে জার্মান বাহিনীর অবস্থান আরেকটি বিস্তৃত বিপদের ইঙ্গিত বয়ে আনে। ধীরে ধীরে এ মিউনিখ চুক্তিই জার্মান সমরবাদকে আরো আগ্রাসী করে তোলে।

শ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা

জার্মানি সামরিক শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। তারা ১৯৩৯ সালে মিউনিখ চুক্তি ভঙ্গ করে প্রাগ আক্রমণ করে। এসময় স্বাধীন শ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিলুপ্তি ঘটে। এক্ষেত্রে ওই অঞ্চল নিয়ে ব্রিটিশ ও ফরাসিদের রাজনীতি করার আর কিছুই থাকেনি। ফলে ধীরে ধীরে তারাও যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যায়।

ইতালির আলবেনিয়া আক্রমণ

বেনিতো মুসোলিনির নেতৃত্বাধীন ইতালি একের পর এক বিশ্বের নানা দেশে আক্রমণ করতে থাকে। তাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী নীতির অংশ হিসেবে ১৯৩৯ সালের ২৫ মার্চ তিরানায় গিয়ে ইতালির বশ্যতা স্বীকার করার আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হয় মুসোলিনি বাহিনী। তারপর ৭ এপ্রিল ১৯৩৯ আলবেনিয়া আক্রমণ করে ইতালির বাহিনী। মাত্র তিনদিনের লড়াইয়ে আলবেনিয়ার পতন ঘটে।

খালখিন গলের যুদ্ধ

রাশিয়া ও জাপানের সীমান্ত বিরোধ নিয়ে খালখিন গলের যুদ্ধ বাধে। এর আগে ১৯৩৮ সালে খাসান লেক অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে জাপান রাশিয়া একদফা লড়াই হয়েছিল। কিন্তু এবারের সীমান্ত বিরোধ নিয়ে যে লড়াই তা পূর্বের সব ধরনের যুদ্ধের রেকর্ড ভঙ্গ করেছিল। জর্জ ঝুকভের নেতৃত্বাধীন রুশ বাহিনী এগিয়ে যায় জাপানিদের প্রতিরোধ করতে। এ যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলার পর ১৯৪৫ সালে সন্ধির মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছিল এ যুদ্ধের।

ডানজিগ সংকট

চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রভাব বিস্তারের পর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অন্যরা বুঝে যায় এবারের থার্ড রাইখ জার্মানির ফুরার হিটলার কারো সাথে আপস করতে আসেনি। হিটলার যেকোনো মূল্যে জার্মান দখলদারিত্বকে আরো বিস্তৃত করতে চাইবেন সেটা বুঝতেও আর কারো দেরি ছিলো না। কিন্তু ততদিনের জার্মানি অনেক শক্তিমত্তা অর্জন করেছে। বলতে গেলে বিভিন্ন সেক্টরে সেই অজেয় জার্মান বাহিনীকে নতুন করে ফিরে পেয়েছেন ফুরার হিটলার। বাল্টিক অঞ্চলের দিকে ধীরে ধীরে থার্ড রেখ সরকারের দৃষ্টি আবদ্ধ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা দেয় ডানজিগ সংকট। মূলত ডানজিগ শহর মুক্ত করা নিয়ে যুদ্ধ বাধে

এবার। ক্ষমতায় আসার পর নাৎসি সরকার পোল্যান্ডের সাথে যে বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করেছিল তা এ যুদ্ধে মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায়।

মিত্রবাহিনীর সাথে পোল্যান্ডের সখ্য

ক্ষমতায় আরোহণের পর হিটলারের নাৎসি সরকার পোল্যান্ডের সাথে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা জার্মানির শত্রুদের সাথে হাত মিলালে হিটলারের বাহিনী থেমে থাকেনি। ১৯৩৯ সালের মার্চে ব্রিটিশ ও ফরাসিরা মিলিতভাবে পোল্যান্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। এক্ষেত্রে দেশটির ওপর হিটলার দাবি জানালে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে যায়।

রাশিয়ার পোল্যান্ড অভিযান

মলোটোভ-রিবেনট্রপ প্যাক্টের জন্য রাশিয়ার পোল্যান্ড অভিযান ইতিহাস বিখ্যাত। এক্ষেত্রে লড়াই বেশিদূর এগোনোর আগেই দুপক্ষ সতর্ক হয়ে যায়। এসময় স্বাক্ষর করা হয় বিখ্যাত একটি চুক্তি। ২৩ আগস্ট ১৯৩৯, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভায়েশ্লেভ মলোটোভ (Vyacheslav Molotov) এবং জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোয়াকিম ফন রিবেনট্রপ (Joachim von Ribbentrop)-এর মধ্যে সম্পাদিত এ চুক্তিতে নির্ধারণ করা হয় আপাতত রাশিয়া কিংবা জার্মানি কেউ কারো ওপর আক্রমণ করবে না। অন্যদিকে সেনা সমাবেশ থেকে শুরু করে আনুষঙ্গিক তৎপরতা বেড়ে যায় বিশেষ কারণে। আর এই তিক্ততা শেষ পর্যন্ত রূপ নেয় বিশ্বযুদ্ধে।

পাঠ-৫.৩ হিটলার ও মুসোলিনির উত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে চারদিক থেকে ধেয়ে আসা নিষেধাজ্ঞার বাণ আর অবরোধের পর অবরোধ জার্মানিকে কোণঠাসা করে রাখে। আশৈশব উন্নত ও শক্তিশালী জার্মানির স্বপ্ন দেখা যুবক অ্যাডলফ হিটলারের উত্থান একটি পর্যায়ে এসে পুরো বিশ্বকে

আবার উত্তপ্ত করবে এমন আশঙ্কা করেছিলেন অনেক তাত্ত্বিক। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে নিষ্পেষিত, নিগৃহীত, নির্যাতিত হওয়া জার্মান যুবকের প্রতিচ্ছবি হিটলার শৈশব থেকেই বেড়ে ওঠেন তীব্র ইহুদি বিদ্বেষ নিয়ে। জার্মান পরিবারগুলোর হতশ্রী দশার পাশাপাশি তাদের সম্পদেই ইহুদিদের আয়েশ তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। তিনি পুঁজিপতি ইহুদি আর তাদের তোষণকারীদের জব্দ করার জন্য উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদী আদর্শে গড়ে তোলেন নাৎসি দল। পরে এ দলটির ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে নতুন দিনের পথে পা বাড়ায় জার্মানি। যে নতুন নিয়ে ভালো-মন্দ যত তর্কই থাকুক না কোন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর কারণ হিসেবে হিটলারের উত্থান ইতিহাসানুক্রমে অনেক গুরুত্বের দাবিদার।

হিটলার নাৎসি বাহিনীর প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় আসেন। ১৯৩৩-৩৪ সালের মধ্যে নাৎসিরা পুরো জার্মানির উপর তাদের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে তারা পরিস্থিতির দায় মেনে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করে। পাশাপাশি তারা শুরু থেকেই ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে একের পর এক তার শর্ত ভঙ্গ করতে থাকে। ইহুদি পুঁজিপতিদের সম্পদ সরকারি হুকুমে বাজেয়াপ্ত করা শুরু করে নাৎসি সরকার। এদিকে নতুন উদ্যোমে পুনর্গঠন শুরু হয় জার্মান সামরিক বাহিনীর। হিটলার ঘোষণা করেন কোনো মনেই নাৎসিরা দুর্বল জার্মানিকে দেখতে চায় না। তাদের দলের মূলমন্ত্র হচ্ছে এমন এক জার্মানি প্রতিষ্ঠা করা যার সামনে সবাই সম্মানে মাথা নোয়াবে। দেশের অভ্যন্তরে নাৎসিদের সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়ায় সব কথার শেষ কথা। জার্মানির বিরুদ্ধে অবস্থানরত দেশগুলোকে শায়েস্তা করার নানা আয়োজন চলতে থাকে পুরোদমে। শক্তিশালী সেনা ও নৌবাহিনী তৈরির পাশাপাশি ঢেলে সাজানো হয় বিমান বাহিনীকেও। নতুন প্রযুক্তির বিভিন্ন বিমান সংযুক্ত করে পুরো আধুনিক একটি বাহিনীতে রূপ দেয়া হয় তাদের। ধীরে ধীরে সমরসজ্জা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠার এক পর্যায়ে যুদ্ধের হুঙ্কার দিয়ে বসে জার্মানি।

প্রথম জীবনের একজন স্কুল শিক্ষক নাকি সেনাবাহিনীতে যোগদানের ভয়ে সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে সেই লোকটি যে কিনা আবার সাংবাদিকতাও করেছে। পরবর্তী জীবনের সাথে শুরুর দিকের মুসোলিনির সাথে অন্য কারো তুলনা করা কঠিন। ১৯০২ সালে যে মুসোলিনি সুইজারল্যান্ডে চলে যান আবার ২ বছরের মাথায় ১৯০৪ সালেই ফিরে আসেন দেশে। প্রায় ১০ বছর সাংবাদিকতা করে সম্পাদক বনে যান অ্যাভান্তির নামে একটি পত্রিকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হটকারীভাবে মিত্র বাহিনীর পক্ষাবলম্বন তাঁকে হতাশ করে, তিনি সমাজতান্ত্রিক থেকে পুরোদস্তুর ডানপন্থী হয়ে যান। এরপর ১৯১৫ সালে তিনি ত্যাগ করেন সমাজতান্ত্রিক দল। সে সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দক্ষতা দেখিয়ে একজন কর্পোরাল পদে পদোন্নতি হয় তাঁর। জার্মান নেতা হিটলারের মত তিনিও যুদ্ধ চলাকালীন আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেন মিলানে। তারপর বিভিন্ন ডানপন্থী দলের সদস্যদের একত্রিত করে গঠন করেন ফ্যাসিস্ট পার্টি।

১৯২২ সালে ইতালিতে সমাজতান্ত্রিকদের দাপট কমাতে রাজা তৃতীয় ইমানুয়েল ফ্যাসিস্ট পার্টিকে সরকার গঠনের সুযোগ করে দেয়। ক্ষমতায় গিয়ে দোর্দণ্ডদাপটের সাথে মুসোলিনি বামপন্থীদের ওপর চড়াও হন। এ সময় ১৯২৪ সালে হত্যা করা হয় গিয়াকমো মিত্তিওতিকে। তার ঠিক পাঁচ বছরের মাথায় ১৯২৯ সালে একদলীয় সরকার হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় ফ্যাসিস্ট পার্টি। মুসোলিনির প্রত্যক্ষ প্রভাবে ১৯৩৬ সালের দিকে জার্মানির সাথে ইতালি একটি মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বলতে গেলে এর পরবর্তী ৫ বছর না যেতে ১৯৪১ সাল নাগাদ ইতালি পুরোপুরি জার্মানির ওপর নির্ভরশীল একটি বন্ধুরাষ্ট্রে পরিণত হয়। তবে একজন শক্তিশালী নেতা হিসেবে মুসোলিনির উত্থান নিশ্চিত হয়ে যায় ১৯৪০ এর মধ্যেই। ১০ জুন পরলোকগত পোপ দ্বিতীয় পলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রোমে যে ফলক নির্মাণ করা হয় তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল। সেদিন ইতালি ইঙ্গ-ফরাসি জোটের বিরুদ্ধে ইতালির সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার তীব্র আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জনতা মুসোলিনির এ ঘোষণাকে হর্ষধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানালে অনেকটাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন তিনি।

ইঙ্গ-ফরাসি জোটের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির সাথে কোনো ধরনের আপস না করে উপরন্তু তাদের দাঁতভাঙা জবাব দিতে শুরু করেন জার্মান নেতা হিটলার। এর ফলে শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তবে যুদ্ধ শুরুর প্রথম ১০ মাস তেমন কোনো উচ্চবাচ্য করেনি ইতালি। তারা এককথায় বলতে গেলে নীরব থেকে যায়। তবে পরিস্থিতি হঠাৎ করে বদলে যাওয়ায় জার্মানির সমর্থনে রণাঙ্গনে আবির্ভূত হয় ইতালি। ইতালি যুদ্ধ ঘোষণা করলে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সামনে অনেক সমস্যা এসে হাজির হয়। তারা নিরাপত্তা প্রশ্নে অনেকটা ভূমধ্যসাগর, আফ্রিকা ও নিকটপ্রাচ্যে সৈন্য মোতায়েন করে যা ইতালির যুদ্ধে যোগদানকে অনেক দিক থেকে বৈধতা দিতে পারে। ইতালির রণতরী থেকে শুরু করে ডেস্ট্রয়ার ও ক্রুজারগুলো নৌপথে তাণ্ডব তুলে। তাদের যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক পরদিন ব্রিটিশ বোমারু বিমান থেকে আসমারা ও মাসোয়াতে বেপরোয়া বোমাবর্ষণ শুরু করে। যুদ্ধ চলে সিসিলিসহ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে। তবে যুদ্ধে মার্কিনিদের অংশগ্রহণ একে একে

সিরাকিউস, পালাজ্জলো, অগাস্টা এবং ভিজনির পতন নিশ্চিত করে। শেষ পর্যন্ত ফিল্ড মার্শাল মন্টেগোমারির বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে জার্মান ও ইতালির বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করে। জার্মান বাহিনী দ্রুত ভেঙে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২৭ এপ্রিল পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন মুসোলিনি ও তার বান্ধবী ক্লারা প্যাত্তাসি। ক্যাস্ট্রোয় জেনারেল কার্ল উলফ আত্মসমর্পণ করার পর তাদের হত্যা করে চৌরাস্তায় টাঙিয়ে রাখা হয় ক্ষতবিক্ষত লাশ।

পাঠ- ৫.৪ ঘটন-অঘটনের বিশ্বযুদ্ধ

ব্যাটল অব আল আমিন

দুই ফিল্ড মার্শালের দ্বৈরথ নাকি ব্রিটিশ-জার্মান সংঘাত কি বলে বিবরণ দিলে সবচেয়ে উপযুক্ত উপমার ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে তা বলা কঠিন। মিসরের এখনকার রাজধানী কায়রো থেকে প্রায় দেড়শ মাইল পশ্চিমে আল আমিন রণাঙ্গনে প্রথমে ব্রিটিশ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ফিল্ড মার্শাল অচিনলেক। দুর্ধর্ষ জার্মান সেনানায়ক মরু শেয়ালখ্যাত ফিল্ড মার্শাল রোমেলের সামনে একের পর এক নাকানিচুবানি খেতে থাকা অচিনলেককে সরিয়ে নেয় ব্রিটিশরা। এরপর কুশলী সমরনায়ক মন্টেগোমারি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। এবার দুর্দিন দেখতে শুরু করে জার্মানরাও। ১৯৪৩ সালের মে মাসে আল আমিন রণাঙ্গনের লড়াইয়ে মিত্রবাহিনীর বিজয় ঘটলে জার্মানরা তাদের আফ্রিকা কোর সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৪২ সালের দিকে অনেকগুলো রণাঙ্গনে জার্মানির সাফল্য মিত্র বাহিনীকে হতাশ করে। বিশেষ করে ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় শক্তি নৌবাহিনী বলতে গেলে জার্মান ইউবোটের আক্রমণে নাকাল হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় মরুভূমিতে চলতে থাকা ব্যাটল অব আল আমিন তাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে ফিল্ড মার্শাল রোমেল যেভাবে আফ্রিকা কোরকে সাজিয়ে নিয়ে যুদ্ধ জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাহলে পুরো সুয়েজ খাল জার্মানদের দখলে চলে যেত। অন্যদিকে এ লড়াইয়ে জিততে পারলে জার্মানরা নজর দিত তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে যা আস্তে আস্তে পুরো বিশ্বের মানচিত্রই বদলে দিতে পারতো। আর এসব কারণেই ব্যাটল অব আল আমিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এতটা গুরুত্ব পেয়েছে।

ফ্রান্স দখলের ৪৪ দিন

জার্মানির জাতশত্রু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে স্থানীয় পরিসরে তাদের ক্ষোভটা ফ্রান্সের উপরেই বেশি ছিল। অ্যাডলফ হিটলার ক্ষমতায় বসার সাথে সাথে ভার্সাই চুক্তির ন্যক্কারজনক শর্তগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যেকোনো মূল্যে ফ্রান্সকে শায়েস্তা করা হবে। এদিকে ফরাসিরা তখনকার দিনে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলে ম্যাজিনো লাইন। তারা মনে করত আর যাই হোক বিশ্বের কোনো সেনা বাহিনীর পক্ষে এই ম্যাজিনো লাইন অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। এদিকে সে অসম্ভবকে সম্ভব করে বসে জার্মানির দুর্জয় পাঞ্জার ডিভিশন। তারা সুকৌশলে এই ম্যাজিনো লাইন অতিক্রম করে সরাসরি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে গিয়ে উপস্থিত হলে মাত্র চুয়াল্লিশ দিনের মাথায় পতন ঘটে ফ্রান্সের। নরওয়ে অভিযানের ব্যর্থতায় নেভিল চেম্বারলিনকে তুলোধুনো করে ছাড়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আর সে সুযোগটাই নিয়েছিলো হিটলারের বাহিনী। জার্মানরা যে বিদ্যুৎগতির ব্লিৎসক্রিগ অপারেশন চালিয়ে একের পর এক পোল্যান্ড, নরওয়ে ও ডেনমার্ক দখল করেছিল ফ্রান্সের ক্ষেত্রে সে অভিযানে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছিল শক্তিশালী ম্যাজিনো লাইন। এক্ষেত্রে জার্মান পাঞ্জার ডিভিশনগুলো ম্যাজিনো লাইন এড়িয়ে বেলজিয়ামের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্স আক্রমণ করে প্যারিস দখলের চেষ্টা করে সফলতার মুখ দেখে। এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিলো বিখ্যাত 'ম্যানস্টেইন পরিকল্পনা'।

ফ্রান্সের ত্রাণকর্তা শার্লে দ্য গল

ম্যাজিনো লাইন অতিক্রম করে জার্মান পাঞ্জার ডিভিশনের অবিশ্বাস্য সফলতা দুর্ভাগ্যের দিন ডেকে আনে ফরাসিদের। এ সময় ত্রাণকর্তার ভূমিকায় আবির্ভূত হন শার্লে দ্য গল। তিনি ১৯৪১ সালের দিকে সুয়েজ খাল অঞ্চলে প্রথম জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। এরপর যখন যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তখন পুরো জাতির হাল ধরেন তিনিই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক চিন্তার অধিকারী জার্মান বাহিনীর সামনে যত শক্তিশালীই হোক না কেন সব ধরনের পদাতিক বাহিনী ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে। তিনি যখন ফরাসিদের উদ্ধার অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন অনেকগুলো ফরাসি উপনিবেশ থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দ্য গলের চরম বৈরি হলেও ১৯৪২ সালের ২২ জুলাই তিনি সাক্ষাৎ করেন জেনারেল আইসেনহাওয়ারের সাথে। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গ পতনের দিনে গল ফ্রান্সবাসীকে মাঠে না নামার অনুপ্রেরণা যোগাতে মার্কিন সহায়তা প্রার্থনা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হন। এর ফলে ফ্রান্স একেবারে খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নতুন ভাবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে জার্মানির পরাজয়ের মাধ্যমে স্বাধীন ফ্রান্স গড়ে তোলার জন্য।

ম্যাজিনো লাইনের লড়াই

ফ্রান্স বুঝতে পেরেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ সম্পাদিত জার্মানির জন্য অপমানজনক ভার্সাই চুক্তি কোনো যুদ্ধবিরতি নয়, বরং আরেকটি ভয়াবহ যুদ্ধ শুরুর অপেক্ষামাত্র। তারা প্রথম মহাযুদ্ধে প্রায় ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু চোখের সামনে প্রত্যক্ষ

করেছিল। ১৯১৯ সালে সম্পাদিত ভার্সাই চুক্তি তাই জার্মানিকে সামরিক-রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিলেও ফরাসিদের স্বস্তি আনতে পারেনি। পল রেনোঁ এবং শার্লে দ্য গলের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে তখন তৈরি করা দুর্ভেদ্য ম্যাজিনো লাইন। মার্শাল জোফরের পরামর্শে নির্মিত এই লাইন বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা লাইন হিসেবে খ্যাত। এক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আঁদ্রে ম্যাজিনো সরকারকে এ প্রকল্পে রাজি করিয়ে নিজ নামে লাইনটি নির্মাণ করেছিলেন। ম্যাজিনো লাইনে যুদ্ধ শুরু হলে জার্মানি পদে পদে বাধা সম্মুখীন হয়। কিন্তু তাদের দুর্ধর্ষ পাঞ্জার ডিভিশন এক্ষেত্রে তাদের লড়াইয়ের দক্ষতা প্রমাণ করে। তারা ম্যাজিনো লাইন তছনছ করে উপস্থিত হয় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। এর মাধ্যমে পুরো বিশ্ব জেনে যায় ময়দানের লড়াইয়ে কতটা শক্তিশালী এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থানে গিয়ে উপনীত হয়েছে জার্মানি।

ব্যাটল অব ব্রিটেন

প্রচণ্ড রকমের জাতীয়তাবাদী নেতা হিটলার শুরু থেকেই অপমানজনক ভার্সাই চুক্তির সবগুলো নীতিকে ভেঙে ফেলার জন্য উঠেপড়ে লেগে যান। ভার্সাই চুক্তি জার্মানির বিমান বাহিনী ধ্বংস করে তাদের ট্যাংক মোতায়েনের ক্ষমতা পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল। জার্মানি গোপনে তাদের বাহিনী শক্তিশালী করে তোলে। তারা কোনো দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগে স্পেনের গৃহযুদ্ধে তাদের বিমান বাহিনীকে প্রথম কাজে লাগায়। তারা এর থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা পরে ব্যবহার করে। ১৯৩৯ সালে জার্মান বাহিনী পোল্যান্ডে তাদের বিদ্যুৎগতির ব্লিৎসক্লিগ চালানোর থেকে ব্রিটেনের সাথে যাদের যুদ্ধ আসন্ন মনে করা হয়। ব্রিটিশ সরকার জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে মানুষজন তাদের বিমান বাহিনীর সক্ষমতা সম্পর্কে আঁচ করতে পারে। বহু নারী-পুরুষ শিশু লন্ডন শহর ছেড়ে গ্রামে পালিয়ে যায়। অনেক মানুষ জীবন রক্ষার্থে তাদের বাগানে বাংকার তৈরি করে। এ অবস্থায় ১৯৪০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ঝাঁকে ঝাঁকে জার্মান বিমান এসে হাজির হয়। এগুলো বিভিন্ন বিমান বাহিনীর ঘাঁটি থেকে শুরু করে শিল্পাঞ্চলে হামলা করতে থাকে। প্রথম কয়েক সপ্তাহ দিন রাত সমানে হামলা চলে। এতে ব্রিটেনের সড়ক, রেলপথ, ডকইয়ার্ড থেকে শুরু করে পয়ঃনিষ্কাশন, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। এভাবে হামলা চলে প্রায় ৫৭ দিন ধরে। যে হামলায় অংশ নেয় ৩৪৮টি জার্মান বোমারু বিমানের পাশাপাশি ৬১৭টি জঙ্গি বিমান। হামলায় বার্মিংহাম প্যালেস থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট হাউজ, ওয়েস্ট মিনস্টার হল, সেন্ট জেমস প্রাসাদ, ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট এক মূর্তিমান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

অপারেশন ড্রামবিট

ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ মনে করা হলেও জার্মান পাঞ্জার ডিভিশন স্থলপথে তাদের নামের প্রতি সুবিচার করে। এদিকে জার্মানির সুগঠিত বিমান বাহিনীও অন্য সব দেশের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়। এ অবস্থায় জার্মানরা ঘাতক ইউবোটের মাধ্যমে নৌপথেও তাদের শক্তিশালী অবস্থান জানান দেয়। ১২ ডিসেম্বরের দিকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলসীমায় ঢুকে পড়ে জার্মান ইউবোটগুলো। অ্যাডমিরাল ডেয়েনিটস মনে করতেন এই ইউবোটগুলো নির্বিঘ্নে নিউইয়র্ক গিয়ে পুরো ডকইয়ার্ডকে তছনছ করে আসতে পারবে। এ সময় সাহসে বলীয়ান হয়ে ইউ-১২৩-এর ক্যাপ্টেন হার্ডেগানের ক্রুরা হামলা করে নোভা স্কটিয়ায় সলিল সমাধি ঘটায় 'সফোক্লেস'-এর। এরপর ১৮ ডিসেম্বর তারা লং আইল্যান্ডের মোন্টাউক পয়েন্ট থেকে মাত্র ৬০ মাইলের মধ্যে আঘাত হানে। এবার ডুবিয়ে দেয় 'নোরনেস'কে। প্রথম দিকে কোনো সুনির্দিষ্ট মানচিত্র না থাকলেও ক্যাপ্টেন হার্ডেগান এভাবে হামলা করতে করতে একেবারে ৩৩০ ডিগ্রি কৌণিক দূরত্ব থেকে নিউইয়র্কের কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। অবাক করার বিষয় হচ্ছে জ্যাকব রিস সৈকতের পাহারায় থাকা মার্কিন রক্ষীরা শুরু থেকে শেষ অবধি অপারেশন ড্রামবিট চালাতে অগ্রসর হার্ডেগানের ইউ-১২৩কে দেখতেই পায়নি।

জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণ

যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বিমান ও নৌঘাঁটি হিসেবে বিখ্যাত পার্ল হারবার। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত সামরিক অভিযান হিসেবে বলা পেতে পারে জাপান সাম্রাজ্যের বাহিনীর পার্ল হারবার আক্রমণ। একইসাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ও নৌঘাঁটিতে চালানো আক্রমণের মুহূর্তে ছত্রখান হয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী। জাপান সাম্রাজ্যের জেনারেল হেডকোয়ার্টারের অপারেশন জেড পরিকল্পনায় একে পরিচালনা করা হয়েছিলে হাওয়াই অপারেশন হিসেবে। ওয়াহো দিনে তখন ছুটির দিন। মার্কিন নৌবাহিনীর প্যাসিফিক ফ্লিটকে নিয়ে আসা হয় জাপানের ওপর অবরোধ আরোপের জন্য। প্রতিশোধ নিতে ৬টি বিমানবাহী জাহাজের সহায়তায় ৩৫৩টি জাপানি যুদ্ধবিমান এবং অগণিত টর্পেডো একযোগে আক্রমণ করে বসে। তারা পার্ল হারবারের হিকাম সামরিক ঘাঁটি থেকে শুরু করে এ দ্বীপে নোঙর করা মার্কিন জাহাজগুলোর ওপর বৃষ্টির মত বোমাবর্ষণ করে।

জাপানি হামলায় সেখানে থাকা সবকটি মার্কিন জঙ্গি বিমান ধ্বংস হয়। মাত্র কয়েকটি সেখান থেকে উড়ে পালাতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে তাদের ১২টি যুদ্ধজাহাজের একটিও অক্ষত ছিল না। অসমর্থিত তথ্যে তাদের প্রায় ১৮৮টি জঙ্গিবিমান ধ্বংসের পাশাপাশি প্রাণ যায় ২৪০৩ জন মার্কিনর। বিস্ফোরিত হয়ে মার্কিন রণতরী ইউএসএস অ্যারিজোনা ডুবে গিয়ে প্রাণনাশ হয় ১১০০ মার্কিন নৌসেনার। এখনও স্মৃতি হিসেবে এই ইউএসএস অ্যারিজোনার খোল দর্শনার্থীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। জাপানিরা মূলত প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিনদের দাপট সাময়িকভাবে হলেও কমিয়ে দিতে এ হামলা চালায়। পার্ল হারবারে জাপানি হামলা প্রাথমিকভাবে সফল হলেও শেষ পর্যন্ত এর ফলাফল ছিল অনেক ভয়াবহ। দ্বিতীয়বারের মত মার্কিন ভূখণ্ডে বহিঃশক্তির সরাসরি বিমান হামলা হিসেবে ঘটনাটি অনেক গুরুত্ব পেয়েছে মার্কিন ইতিহাসে।

মার্কিন-জার্মান দ্বৈরথ

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির দ্রুত পরাজয়ের মূল কারণ মার্কিনদের অংশগ্রহণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের নেশায় উন্মাদ হিটলার ইউরোপের কয়েকটি দেশকে হারিয়েই শান্ত হতে পারেননি। তিনি শুরু থেকেই চেয়েছিলেন তাদের পুরনো শত্রু মার্কিনদের শায়েস্তা করতে। তাই ইউরোপের রণাঙ্গন ছাড়িয়ে এবারের যুদ্ধ পা বাড়ায় আটলান্টিকের দিকে। হিটলার প্রস্তুতি সম্পন্ন মনে করে ১৯৪১ সালের ১১ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। একই দিনে এর পাল্টা জবাব দিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বলতে গেলে হাওয়াইয়ের পার্ল হারবারে জাপানি হামলার ঠিক চারদিনের মাথায় শুরু হয় জার্মান-মার্কিন সংঘাত। বাইরের ভূখণ্ডে মরণপণ লড়াই চললেই জার্মান সৈন্যরা মার্কিন ভূখণ্ডে অবতরণ করতে পারেনি। ঐতিহাসিকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হিটলারের অনেকগুলো বড় ভুলের একটি।

রাশিয়া অভিমুখে জার্মান বাহিনী

দুই রণাঙ্গনে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার দুর্বল দিকগুলো বুঝতে পেরে জার্মানরা ১৯৩৯ সালের আগস্টে রাশিয়ার সাথে একটা ১০ বছর মেয়াদি চুক্তি করে। এক্ষেত্রে অন্য রাষ্ট্রের ভূমি জবরদখল থেকে শুরু করে আনুষঙ্গিক আরো নানা কারণ নিয়ে চুক্তি হয় রুশ-জার্মান বাহিনীর মধ্যে। তাদের সমঝোতা অনুযায়ীই ১৯৩৯ সালের দিকে রুশরা আক্রমণ করে দখল করে নেয় পোল্যান্ড। এই বছরের ১ সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যান্ড দখল করলে তাঁর বিরুদ্ধে একইসাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স। ১৯৪১ থেকে শুরু হওয়া পূর্ব রণাঙ্গনের ভয়াবহ লড়াইয়ে রুশরা একইসাথে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেদের শক্ত অবস্থান জানান দেয় যা নিঃসন্দেহে নাৎসি জার্মানির মাথাব্যথার হেতুতে পরিণত হয়। তাদের দমন করতে এবার সরাসরি রাশিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন হিটলার। নির্দেশ পাওয়ামাত্র ১৯৪১ সালের ২২ জুন ভোরে ৪০ লাখের মত জার্মান, ইতালীয় ও রুমানিয়ার সৈন্য রাশিয়ায় প্রবেশ করে। এক্ষেত্রেও জার্মান পাঞ্জার ডিভিশন তাদের অপ্রতিরোধ্য ইমেজ ধরে রাখতে সক্ষম হয়। তারা তিনদিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ করে রুশদের একেবারে বন্দি করে ফেলে। এভাবে একমাস ধরে লড়াই করে জার্মান সৈন্যরা অপ্রতিরোধ্যভাবে লেনিনগ্রাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তবে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত, তুষারঝড় এবং শীতল আবহাওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত জার্মান বাহিনীর এই অগ্রযাত্রা টিকে থাকেনি। আর ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে রুশ প্রকৃতি এবারেও তাদের প্রধান প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে।

অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদ

জার্মান পাঞ্জার ডিভিশনের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের মুখে নেহাত ঠুনকো মনে হয় রুশ বাহিনীকে। প্রকৃতি তাদের সহায় না হলে শেষ পর্যন্ত জার্মান বাহিনী তাদের একেবারে কচুকাটা করে ছাড়তো। তবে তাদের চৌকস নৈপুণ্যে সব ধরনের সমস্যা উত্তরণ করে জার্মানরা। বলতে গেলে ১৯৪১ সালে ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৪ সালের ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৯০০ দিন অবরুদ্ধ ছিল এ অঞ্চল। দীর্ঘদিনের অবরোধে প্রাণ যায় প্রায় ৬ লাখ ৩২ হাজার মানুষের। ১৯৪১ সালের বড়দিনে সেখানে অনাহারেই মারা যায় ৪০০০-এর বেশি মানুষ। এই লেনিনগ্রাদ অবরোধ ছিল রাশিয়ায় জার্মানির সর্বাত্মক অভিযানের অংশ। প্রায় ৪০ লাখ সৈন্য নিয়ে বিশাল এ ফ্রন্টে লড়াই শুরু করে শুধুমাত্র জ্বালানি সংকটের কারণে মস্কো অধিকার করতে পারেনি জার্মানরা। রাশিয়ার ভূখণ্ড জার্মান ট্যাংক চলার উপযোগী না হলেও সেখানে তাদের বিজয় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু বছরের শুরুতে অহেতুক গ্রিসে অভিযান চালিয়ে জার্মানরা তাদের শক্তি অপচয় করে বসে। এক্ষেত্রে তারা যদি জনবল অপচয় না করতো, তাহলে এ সময়ে নিশ্চিত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটত বলে মনে করেন অনেকেই।

স্ট্যালিনগ্রাড অবরোধ

৪০ লক্ষ জার্মান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধে প্রায় ৩০ লক্ষের মত রুশ সৈন্য বিভিন্ন ফ্রন্টে অবস্থান গ্রহণ করে। তারা প্রথম দিকে ভালো রকম মার খেলেও শেষ পর্যন্ত প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে জার্মানদের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে বিরুদ্ধ রাশিয়ার প্রকৃতি যেখানে জার্মানির জন্য বড় বিপদের কারণ সেখানে রুশ বাহিনী নতুন করে সক্রিয় হয়। তাই বেশিরভাগ ইতিহাসবিদ মনে করেন স্ট্যালিনগ্রাড অবরোধ হিটলারের অনেকগুলো ভয়ানক ভুলের একটি। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিজেই নিজের ভয়াবহ পরাজয় ডেকে এনেছিলেন জার্মান নেতা হিটলার। জার্মান বাহিনী একাধারে পশ্চিম রণাঙ্গনে ইউরোপের লড়ছিল অন্যদিকে পূর্ব রণাঙ্গনের লড়াইও থেমে ছিলো না। এ অবস্থায় স্ট্যালিনগ্রাড অবরোধের সিদ্ধান্ত হিটলারের জন্য নিঃসন্দেহে হঠকারী হয়ে দেখা দেয়। অন্তত একসাথে এতোগুলো ফ্রন্টে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মত ক্ষমতা তখন জার্মান বাহিনীর ছিল না।

জার্মান পাঞ্জার ডিভিশন নিঃসন্দেহে দ্রুত আক্রমণ করে যেকোনো অঞ্চলে দখলে নিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করতে পারত। তবে রাশিয়ার বিরুদ্ধ শীতল প্রকৃতিতে টিকে থাকার ক্ষমতা বিশ্বের কোনো বাহিনীরই ছিল না। তা জার্মান বাহিনীর স্ট্যালিনগ্রাড অবরোধের ব্যর্থতায় আরেকবার প্রমাণ হয়ে যায়। স্ট্যালিনগ্রাডে প্রায় ২০০ দিনের অবরোধ চলে প্রথমে জার্মানরা সেখানে অবরোধ করলেও শেষ পর্যন্ত রাশিয়া সেখানে আরো শক্তিশালী অবরোধ গড়ে তোলে। আক্রমণের ভয়াবহতা আঁচ করে সেখানে আক্রমণের দায়িত্বে থাকা পাউলাসকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করেন হিটলার। এর আগে কোনো জার্মান ফিল্ড মার্শাল যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করেননি। তবে পাউলাস তার বিধ্বস্ত হেডকোয়ার্টার্সের কাছে হাত তুলে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ১৯৪৩ সালের ২ জানুয়ারি প্রায় ৯১ হাজার জার্মান সৈন্য আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধের অবরোধকালে মারা যায় লক্ষাধিক জার্মান, তাদের সাথে ছিল প্রায় ৮৭ হাজার ইতালীয় ও লক্ষাধিক রুমানিয়ার সেনা। তবে স্ট্যালিনগ্রাডে রুশ অবরোধের সময় মারা যায় আরো লাখ তিনেক জার্মান সৈন্য। দুর্ধর্ষ ষষ্ঠ জার্মান পাঞ্জার ডিভিশনকে উদ্ধার করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হয় আরো কয়েক হাজার জার্মান সৈন্য। বলতে গেলে স্ট্যালিনগ্রাড অভিযান এক রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয় যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ ঘটনা।

নরম্যান্ডির ডি ডে ল্যান্ডিং

জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের ভূখণ্ডে দুর্দান্ত হামলা চালিয়ে হিটলারের বাহিনীকে অনেকটাই নাজেহাল করে ছাড়ে মিত্রবাহিনী। ১৯৪৪ সালে নরম্যান্ডি উপকূলে হওয়া এ হামলা ধীরে ধীরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশু পরিণতি কি তা জানান দিতে শুরু করে। তুমুল লড়াইয়ে জার্মানরা ফ্রান্সের ওই অঞ্চল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। মিত্রবাহিনী ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে এসে সরাসরি এখানে হামলা চালায় যাকে ইতিহাসে ডি ডে ল্যান্ডিং তথা অপারেশন ওভারলোড নামে স্থান দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রায় ১২টি দেশের ৩০ লাখ সৈন্য গিয়ে হামলা চালায় নরম্যান্ডিতে। অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, গ্রিস, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র এই ১২ দেশের সৈন্যরা একসাথে হামলা চালায় ৬ জুন। সেদিন রাতের বেলা ছত্রীসেনা অবতরণ, গ্লাইডার অবতরণ থেকে শুরু করে জঙ্গি ও বোমারু বিমানের পাশাপাশি যুদ্ধজাহাজ থেকে বোমা ও গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়। মিত্র বাহিনীর ৩৭ হাজার নিহত হওয়ার পাশাপাশি আহত হয় দেড় লক্ষাধিক। অন্যদিকে জার্মানদের ২ লক্ষ সৈন্য নিহত হওয়ার পাশাপাশি ২ লাখ আত্মসমর্পণ করে। তবে ফিল্ড মার্শাল রোমেলের ৩৫২ তম ডিভিশন এখানে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে। প্রচণ্ড প্রতিরোধ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে জার্মানদের পরাজয় আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভাগ্য অনেকটা এখানেই নির্ধারণ করে দেয়।

অপারেশন অগাস্ট স্টর্ম

যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবার নৌঘাঁটিতে হামলার পর মিত্রবাহিনীর তরফ হতে যুক্তরাষ্ট্রকে উপযুক্ত জবাব দেয়াটা জরুরি ছিল। ১৯৪৫ সালে জাপানে রুশ হামলাকে অনেকটা জাপানকে সতর্ক করে দেয়ার চেষ্টাও বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে রুশরা এখনকার মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়ার মেনজিয়াং, শাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জে সামরিক অভিযান চালায়। এখনকার চীনের অংশ মাঞ্চুরিয়া তখন জাপান দখল করে নিয়েছিল আর অক্ষশক্তির অন্যতম অংশীদার হিসেবে জাপানের উপর প্রথম আঘাতটা যেদিক থেকে আসে মাঞ্চুরিয়া এর মধ্যে অন্যতম। অনেকগুলো ফ্রন্টে একের পর এক হারতে থাকা জাপানি রাজকীয় বাহিনী শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করত আর যাই হোক অন্তত হোম গ্রাউন্ডে এসে তাদের হারিয়ে দেয়া মিত্রবাহিনীর পক্ষে অতটা সহজ হবে না যতটা না বাইরের ফ্রন্টগুলোতে জয়লাভ করা তাদের জন্য সহজ হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত চতুর্মুখী হামলার সামনে আর শেষটা সুখকর হয়নি জাপানি রাজকীয় বাহিনীর। সবক্ষেত্রে পর্যুদস্ত হতে হয় তাদের। আর জাপানের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই মূলত আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।

হিরোশিমা ও নাগাসাকির ট্র্যাজেডি

বিভিন্ন ধরনের কূটকৌশল থেকে শুরু করে বিবিধ আক্রমণ চালিয়ে জাপানের সাথে কিছুতেই পেরে ওঠেনি মিত্রবাহিনী। পশ্চিমে জার্মানদের সাথে তাল মিলিয়ে এশিয়ার রণাঙ্গণে একাই লড়ে যাচ্ছিল জাপানি রাজকীয় বাহিনীর দুর্ধর্ষ সৈন্যরা। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবারে হামলার জন্য মিত্রবাহিনীর অন্যতম অংশীদার যুক্তরাষ্ট্রের চরম ক্ষোভ ছিল জাপানের ওপর। কিন্তু যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ যে এতটা নির্মম ও জঘন্য হবে তা কেউ চিন্তা করতে পারেনি। মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনার নজির স্থাপন করে ৬ ও ৯ আগস্ট যথাক্রমে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষেপ করা হয় লিটল বয় ও ফ্যাট ম্যান নামের দুটি ধ্বংসাত্মক আনবিক বোমা। ৬ আগস্ট সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে হিরোশিমায় প্রথম বোমাটি নিক্ষেপ করা হলে তাৎক্ষণিক প্রাণ যায় ১ লাখ বিশ হাজার মানুষের। আর তার দ্বিগুণ মানুষ মারা যায় এর একটু পরে। স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট হেনরি এস ট্রুম্যান আনবিক বোমা নিক্ষেপের এ পাশবিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। এনোলা গে নামের বিমানটি থেকে যখন হিরোশিমায় প্রথম পারমাণবিক বোমাটি নিক্ষেপ করা হয় তখন থমকে গিয়েছে বিশ্ব মানবতা এর ধ্বংসযজ্ঞ দেখে। অন্তত পরপর দুটি আঘাত সইতে না পেরেই জাপানিরা ১৫ আগস্ট এসে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। ১৯৪৫ সালের ৮ মে জার্মানি যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলেও জাপানে সম্রাট হিরোহিতোর বাহিনী ছিল নাছোড়বান্দা। তারা সমান তালে লড়ে যাচ্ছিল মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে, কিন্তু তাদের দুটি সমৃদ্ধ শহরের এমন করুণ পরিণতি তাদের থমকে দেয় সেখানেই; জাপানিরাও বাধ্য হয় আত্মসমর্পণে।

ব্যাটল অব বার্লিন

বার্লিন পতন ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ ঘটনা। এক্ষেত্রে লড়াই হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী জার্মানের। বলতে গেলে ১৯৪৫ সালের শুরুতেই বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে পিছু হটতে শুরু করে জার্মান সৈন্যরা। তাদের দুর্ধর্ষ পাঞ্জার ডিভিশন হামলা করে অনেক এলাকা দখল করে নিলেও সেটাকে দখলে রাখার মত লোকবল কিংবা সামরিক শক্তি দীর্ঘদিনের যুদ্ধে খুইয়ে বসেছে জার্মানরা। এ অবস্থায় রুশরা অনেকটা মরণকামড় দিয়ে বসে জার্মানিকে। বার্লিন দখল করতে এক সোভিয়েত ইউনিয়নেরই প্রায় ২৫ লাখ সৈন্য এসে উপস্থিত হয়। ৪১ হাজার ৬০০ কামানের পাশাপাশি ৬২২৫টি ট্যাংক থেকে সমানে গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে রুশরা। এতেই বলতে গেলে প্রায় ছত্রখান হওয়ার যোগাড় হয় জার্মানদের। তাদের ১০ লক্ষাধিক সৈন্য সেখানে মরণপণ লড়াই করেও শেষরক্ষা করতে পারেনি। অবশেষে পতন ঘটে বার্লিন নগরীর। আর এক যুগের ত্রাস ছড়ানো থার্ড রাইখের পতন ঘটে এসময়েই।

পাঠ-৫.৫ জার্মানির পরাজয় ও হিটলারের শেষ জীবন

লুফটওয়াফ তথা জার্মান বিমান বাহিনী প্রধান মার্শাল গোয়েরিংয়ের চিঠি থেকেই বোঝা যায় জার্মানির ভাগ্য ইতোমধ্যে নির্ধারিত। কিন্তু তাতে দমবার পাত্র ছিলেন না হিটলার। তিনি এ টেলিগ্রামের জবাবে মার্শাল গোয়েরিংকে বরং গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। গোয়েরিং ২৫ এপ্রিল ভোরে গ্রেফতার হলে সেদিন একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয় জার্মান চ্যান্সেলর

হাউসে এসে। জেনারেল রিটার ফন গ্রেইম ও নারী টেস্ট পাইলট হানা রিচ গিয়ে দেখা করেন হিটলারের সাথে। হিটলার গোয়েরিংয়ের পদাধিষ্ঠিত করেন আহত ফন গ্রেইমকে যিনি পরপর তিন দিন বাংকারে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। এর মধ্যেই এসএসের কমান্ডার হেইনরিখ হিমলার একই সাথে মিত্রবাহিনীর সাথে আলোচনা এবং পশ্চিমে জেনারেল আইসেন হাওয়ারের কাছে জার্মান বাহিনী আত্মসমপর্ণের প্রস্তাব দেন। হিটলার হিমলারের প্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হারমেন ফেজেলিয়ানকে সাথে সাথে গুলি করে হত্যা করেন।

হিটলার নিশ্চিত পরাজয় জেনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আর যাই হোক তিনি মিত্রবাহিনীর কাছে অন্তত আত্মসমর্পণ করবেন না। এক্ষেত্রে আত্মহননই হয় তাঁর জীবনের শেষ ইচ্ছা এবং এক গৌরমময় পরিণতি। আর তাই হিটলারকে না পেয়ে মিত্রবাহিনীর কাছে জার্মানির আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর করেন জেনারেল আলফ্রেড জোডল। প্রথমে ৪ মে ব্রিটিশ ফিল্ড মার্শাল মন্টেগোমারি হল্যান্ড, উত্তর-পশ্চিম জার্মানি ডেনমার্কে অবস্থানরত জার্মান সৈন্যদের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৪৫ সালের ৭ মে জেনারেল বোহনি নরওয়েতে সৈন্যদের আত্মসমর্পণের কথা বলেন। এদিকে পূর্ব রণাঙ্গনে জেনারেল ফার্ডিনান্দ শোরনারের নেতৃত্বাধীন জার্মান সৈন্য আত্মসমর্পণে রাজি হয়নি। হিটলার ৩০ এপ্রিল তাকে জার্মান বাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ পদে ভূষিত করেছিলেন। তারপরেও ১৯৪৫ সালের ৮ মে সব রণাঙ্গন থেকে থমকে যেতে হয়ে জার্মান বাহিনীকে। এসময় আত্মসমর্পণ না করে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত শোরনার অস্ট্রিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন।

জীবনের শেষ দিনগুলোতে জার্মান নেতা হিটলার বার্লিনেই ছিলেন। সেখান থেকে তার পালিয়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না। তিনি নিজেই বলেছে অন্তত যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার মত কাপুরুষ অ্যাডলফ হিটলার হয়; তার কাছে যুদ্ধই জীবন, যুদ্ধই সর্বজনীন এবং যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী জার্মান শ্রেষ্ঠত্বের মহান লড়াই। তিনি ভেবেছিলেন কোনোভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পদানত করা গেলে পুরো বিশ্বই অন্তত একবার জার্মানির সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হবে। তবে প্রাকৃতিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে রুশরা জয়লাভ করে যুদ্ধ, জীবনের শেষ দেখতে পান অ্যাডলফ হিটলার। পূর্ব প্রুশিয়ার রাসটেনবুর্গ থেকে একটি ব্যর্থ আক্রমণে কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে যান হিটলার। এরপর তিনি অবস্থান নেন বার্লিনের এক ভূগর্ভস্থ বাংকারে। ১৬ জানুয়ারি বাংকারে প্রবেশ থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একটি বারের জন্যও বাইরে আসার সুযোগ হয়নি হিটলারের। অনেক শক্তিশালী বোমার আঘাতে বাংকারটির কোনো ক্ষতি হয়নি বললেই চলে। পাশাপাশি সেখানে পর্যাপ্ত রসদের যোগানও ছিল। রুশ সৈন্যরা চারদিক থেকে বাংকারটা ঘিরে ফেলছে জানতে পেরে ২২-২৩ এপ্রিল শীর্ষস্থানীয় জার্মান অফিসাররা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তবে হিটলার সেখানে অবিচল থেকে যান সেই বাংকারে। এই বাংকারেই বিয়ে করার পর ৩০ এপ্রিল স্ত্রী ইভা ব্রাউনসহ আত্মহত্যা করেন হিটলার। ফুয়েরার বাংকার নামে পরিচিত এ স্থান মাটির প্রায় ৫৫ ফুট নিচে অবস্থিত। প্রায় ৪ মিটার কংক্রিকেটের আস্তরণযুক্ত এ স্থান প্রায় ৩ হাজার বর্গফুট এলাকাজুড়ে অবস্থিত। জাপানের আত্মসমর্পণকে মনে করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ের ঘটনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কুখ্যাত ভার্সাই চুক্তি যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ করে দেয় তেমনি বিচারের নামে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল ছিল আরেকটি প্রহসনের নামান্তর। বিজয়ী শক্তি সুযোগ পেলে সবদিক থেকে পরাজিত শক্তির ওপর চড়াও হয় এ ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যুদ্ধাপরাধের দায়ে যে ব্রিটিশরা জার্মানদের বিচারের সম্মুখীন করতে থাকে তারাই ভারতবর্ষ ও আফ্রিকায় এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। অন্যদিকে মানবতাবিরোধী অপরাধ বলতে গেলে এক জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে বোমা নিক্ষেপ করে মিত্রবাহিনীর তরফে যুক্তরাষ্ট্র যে অপরাধ করেছিল তার বিচার করে সাধ্য কার। সেদিক থেকে ধরতে গেলে নাজি জাতীয়তাবাদী যোদ্ধাদের বিচার প্রহসন বৈ কিছুই নয়। এক্ষেত্রে অনেক ইতিহাসবিদ সরাসরি বলেই দিয়েছেন এক্ষেত্রে জার্মানি পরাজিত হয়েছে বলে বিচার হয়েছে তাদের, ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের নামে হত্যা করা হয়েছে অগণিত কুশলী জার্মান সেনা নায়ককে। এদিকে মিত্রবাহিনী যদি পরাজিত হত তবে লন্ডন কিংবা মস্কোর রাস্তায় তেমনি তাদের অনেক বীর সেনানীর লাশ বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে ঝুললে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না।

সারাংশ

রণাঙ্গনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে অনেক উন্নত অস্ত্রের ব্যবহার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণহানির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় বহুলাংশে। এই বিশ্বযুদ্ধ দেশ থেকে দেশ ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল মহাদেশ থেকে মহাদেশে। অন্যদিকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সাগরতল, মহাসাগর এমনকি অন্তরীক্ষেও চলেছিল প্রাণঘাতী সংঘাত। ৬১ দেশের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অংশগ্রহণে এ যুদ্ধ চলেছিল প্রায় ৬ বছরের মত। লিটল বয় ও ফ্যাটম্যান পরামানবিক বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা।

১৯৪৫ সালে জার্মানির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

জাতিসংঘ ও বিশ্বশান্তি

ইউনিট ৬

ভূমিকা

জাতিসংঘ বিশ্বের স্বাধীন জাতিসমূহের সংগঠন। ১৯৪৫ সালে ৫১ টি রাষ্ট্র কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ একটি বহুপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এবং এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা এর সনদে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। জাতিসংঘ মূলত একটি রাজনৈতিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং এটি অধি-রাষ্ট্রীক বা কোনো বিশ্ব সরকার নয়। জাতিসংঘ সনদের প্রধান দিকগুলো হলো: আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ এবং এতদুদ্দেশ্যে শান্তিভঙ্গের হুমকি নিবারণ ও দুরীকরণের জন্য, এবং আক্রমণ অথবা অন্যান্য শান্তিভঙ্গকর কার্যকলাপ দমনের জন্য কার্যকর যৌথ কর্মপন্থা গ্রহণ, এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক বিরোধ বা আইনের নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক বিরোধ বা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাপূর্ণ পরিস্থিতির নিষ্পত্তি বা সমাধান; বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমঅধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রসার এবং বিশ্বশান্তি দৃঢ় করার জন্য অন্যান্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ; অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা মানবিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশ সাধন এবং মানবিক অধিকার ও জাতিগোষ্ঠি, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বশেষে সকলের মৌল অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উৎসাহ দান। আর এই বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্বজুড়ে শান্তি ও সম্প্রীতি নিশ্চিতকল্পে কাজ করে যাচ্ছে জাতিসংঘ।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

- ✓ **পাঠ-৬.১ জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি**
- ✓ **পাঠ-৬.২ জাতিসংঘে বাংলাদেশ**
- ✓ **পাঠ-৬.৩ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা**

পাঠ-৬.১ জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থার ইতিহাস রাষ্ট্র কর্তৃক প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে উঠে বিশেষ কিছু বিষয়ে সহযোগিতার লক্ষ্যে। সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান, যুদ্ধ প্রতিরোধ এবং যুদ্ধনীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৮৯৯ সালে হেগে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হেগ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে যে কনভেনশন প্রণীত হয় তার উপর ভিত্তি করে স্থায়ী সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ১৯০২ সাল থেকে কাজ শুরু করে। ১৯০৭ সালে যে হেগ সম্মেলন হয়, সেখানে ২৬ টি ইউরোপীয় রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে এবং এই সম্মেলনেই প্রথমবারের মতো একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠনের আকাঙ্খা রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে অনুভূত হয়। কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলে বিশ্বসংগঠন গঠনের ধারণাটি আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে বিশ্ব সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। ১৯১৯ সালের ২৫ জানুয়ারি প্যারিস সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন তাঁর চৌদ্দ দফা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন, যেখানে মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, যৌথ নিরাপত্তা, সাধারন নিরস্ত্রীকরণের বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয় এবং নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় শান্তি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি বিশ্ব সংগঠন গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ পায়।

জাতিসংঘের পূর্বে লীগ অব নেশন্স নামের আন্তর্জাতিক সংগঠন বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দায়বদ্ধ ছিল। ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি 'আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, শান্তি এবং নিরাপত্তা' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লীগ অব নেশন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। লীগ অব নেশন্স ৫৮ টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়েছিল। শুরুতে লীগ অব নেশন্সের কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হলেও ১৯৩০ সালের পর থেকে জার্মানী, ইতালি এবং জাপানের মতো অক্ষশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলে লীগ অব নেশন্সের কার্যক্রম ভেঙ্গে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, লীগ অব নেশন্স বিশ্বের শান্তি রক্ষার প্রধান লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষণা লীগ অব নেশন্স ব্যর্থ হলেও জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতারা লীগ অব নেশন্সের ধারণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। 'জাতিসংঘ' নামের প্রথম সূচনা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের দ্বারা এবং এর প্রথম ব্যবহার হয় ১৯৪৫ সালের ১ জানুয়ারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সম্পাদিত 'সম্মিলিত জাতিসমূহের ঘোষণার' মাধ্যমে, যেখানে ২৬টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ প্রথমবারের মতো অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমে যুদ্ধে করার ঘোষণা দেয়। ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন সানফ্রানসিস্কোতে আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রশ্নে 'জাতিসমূহের সম্মেলনে' ৫০ টি দেশের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘ সনদ রচনা করেন। ১৯৪৪ সালের আগষ্ট-অক্টোবরে ওয়াশিংটনের ডাম্বার্টন ওকসের বৈঠকে চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের প্রস্তাবগুলির ওপর ভিত্তি করে এই সনদ গড়ে ওঠে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সনদটি অনুমোদন ও স্বাক্ষর করেন। পোল্যান্ড সম্মেলনে উপস্থিত না থাকলেও পরে এতে স্বাক্ষর প্রদান করে প্রথম স্বাক্ষরকারী ৫১টি রাষ্ট্রের একটিতে পরিণত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৫ অক্টোবর চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও স্বাক্ষরকারী অন্যান্য অধিকাংশ দেশের সনদ অনুমোদনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতিসংঘ সংগঠন বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ১৯২ এবং জাতিসংঘের কর্মপরিধি বিশ্বব্যাপি বিস্তৃত। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সনদে উল্লেখিত সমুদয় দায়দায়িত্ব যারা গ্রহণ করবে এবং সংগঠনটির বিচারে যারা এসব দায়দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক সেরূপ অন্য সকল শান্তিপ্রিয় রাষ্টের জন্য জাতিসংঘের সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে (সনদের অনুচ্ছেদ নং ৪)। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ন্যায়বিচার নীতির উপর ভিত্তি করে শান্তি, উন্নয়ন, মানবাধিকার এবং সকল মানুষের কল্যাণের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক সংকট মুহূর্তে এই সংগঠন জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা তৈরি করে ভারসাম্য বজায় রাখে। শান্তিরক্ষা, শান্তি সৃষ্টি, সংকট প্রতিরোধ এবং মানবীয় সাহায্যের জন্য জাতিসংঘ বেশী পরিচিত হলেও এই দিকগুলোর বাইরেও বিভিন্ন উপায়ে জাতিসংঘ এবং এর অঙ্গসংস্থাসমূহ (বিভিন্ন বিশেষায়িত সংস্থা, ফান্ড এবং কর্মসূচি) বিশ্বকে প্রভাবিত করে। এই সংগঠন বৃহত্তর পরিসরে বিভিন্ন মৌলিক ইস্যু, যেমন টেকসই উন্নয়নের ধারণা থেকে শুরু করে পরিবেশ এবং শরণার্থীদের রক্ষণ, দুর্যোগ সহায়তা, সন্ত্রাসবাদ দমন, নিরস্ত্রীকরণ এবং পারমানবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার, শাসন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য, ভূমি মাইন অপসারণ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বিশ্ব গড়ার লক্ষ্য পূরণে কাজ করে থাকে।

পাঠ-৬.২ জাতিসংঘে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘ বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের সম্পর্কের সূচনা হয় ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুধু একটি মুক্তি আন্দোলন নয়, এটি একটি মৌলিক মানবাধিকার দলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘ মূলত যুক্ত হয়েছিল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ; এবং শরণার্থীদের সহায়তা দানের মধ্য দিয়ে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা চেয়ে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব উথান্টের কাছে। সে সময়ে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ঢাকাস্থ প্রতিনিধির সঙ্গে একটি বিশেষ বৈঠকও করেছিলেন তাঁরা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের উপর যে গণহত্যা সংঘঠিত হয়, তা সারা বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অন্যান্য বিশ্বনেতার সঙ্গে সেদিন জাতিসংঘ মহাসচিব উথান্ট এই গণহত্যাকে নিন্দা করে একে 'মানব ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়' বলে অভিহিত করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল সরকার গঠনের পর এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বের জনমত ও রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন ও স্বীকৃতি আদায় করা। এ উদ্দেশ্যে মুজিবনগর সরকারের একটি বিশেষ প্রতিনিধিদলকে ১৯৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬ তম অধিবেশনে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে জাতিসংঘ প্লাজায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বকে জানিয়ে দেয় যে আপোষ সম্ভাবনার পরিস্থিতি থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি। ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের দীর্ঘ বক্তব্য পাঠানো হয় এবং এটি নিরাপত্তা পরিষদের অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রথম জাতিসংঘে বাংলাদেশের মানুষের বক্তব্য বাংলাদেশের প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় যে ক্ষেত্রটিতে জাতিসংঘ সক্রিয় ছিল সেটা হচ্ছে শরণার্থীদের সাহায্য প্রদান। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অমানবিক নির্যাতন ও গণহত্যার কারণে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহত্যাগ করে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। এই শরণার্থীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে ব্যবস্থাপনা ও অর্থবলের প্রয়োজন ছিল, তা কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে এককভাবে মেটানো সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশের ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকালে ভারতে বাংলাদেশী শরণার্থীদের সহায়তার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা চালায়। শরণার্থীদের সহায়তার কাজে জাতিসংঘের এ সম্পৃক্তির ফলে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম কৌশলগতভাবেও লাভবান হয়। পাকিস্তান এবং আরো কিছু দেশ এ সংগ্রামকে পাকিস্তানের 'আভ্যন্তরীণ বিষয়' এবং ভারত পাকিস্তান দ্বন্দ্ব বলে চিত্রিত করার যে অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল, জাতিসংঘের এই সাহায্যের ফলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জাতিসংঘের শরণার্থী সংক্রান্ত হাইকমিশনার সদরুদ্দিন আগা খান সহ উচ্চপদস্থ জাতিসংঘ কর্মকর্তারা বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে ইউএনএইচসিআর ছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী, ইউনিসেফ প্রভৃতি জাতিসংঘ-সংস্থা শরণার্থীদের জন্য কাজ শুরু করে।

অন্যদিকে, তৎকালে অধিকৃত-বাংলাদেশেও জাতিসংঘ ত্রাণ তৎপরতা শুরু করে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে জন আর কেলির নেতৃত্বে ইস্ট পাকিস্তান রিলিফ অপারেশন (ইউএনইপিআরও) ত্রাণ তৎপরতা শুরু করে। পরে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে এই দায়িত্ব নেন আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল পদমর্যাদার পল ম্যাক্কি হেনরি। এ সময়ে মুজিবনগর সরকার অভিযোগ করে যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা এ ত্রাণ কার্যক্রমের অপব্যবহার করছে। ১৬ নভেম্বর এ কার্যক্রমকে 'পাকিস্তানী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত' করে জাতিসংঘ নিজেই এর সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এটি ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রশাসনের উপর একটি নৈতিক আঘাত।

১৯৭১ সালের জুন মাসে বিশ্ব ব্যাংকের উদ্যোগে প্যারিসে পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়ামের যে বৈঠক হয় তাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত নতুন সাহায্য দিতে দাতাগোষ্ঠী অস্বীকার করে। 'পূর্ব পাকিস্তান কার্যত সরকারবিহীন রয়েছে' বিশ্ব ব্যাংকের এ মন্তব্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বেগবান করে। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) আলোচ্যসূচিতেও বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা গুরুত্বপূর্ণভাবে উত্থাপিত হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘ বৃহৎ আকারের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম হাতে নেয়। ১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম জাতিসংঘ রিলিফ অপারেশনস ঢাকা (আনরড) নামে পরিচিত জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন এবং একজন আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেলকে এর দায়িত্বভার দেয়া হয়। স্যার

রবার্ট জ্যাকসনের পরিচালনায় শুরু হয় এই জাতিসংঘ ত্রাণকার্য। এই কার্যক্রমের ব্যাপ্তির মুখে আনরডের নাম কিছুদিনের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হল আনরব-এ, যার পুরো নাম বাংলাদেশে জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রম। ১৯৭৩ সালে ৩১ ডিসেম্বর যখন পরিকল্পনা অনুযায়ী আনরব তার জরুরী ত্রাণ এবং পুনর্বাসন তৎপরতা শেষ করে তখন এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ওই সময় পর্যন্ত জাতিসংঘ পরিচালিত ত্রাণকার্যের মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিল আনরবের ত্রাণকার্য।

বাংলাদেশ-জাতিসংঘ সম্পর্ক আরো জোরদার হয় যখন ১৯৭৩সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সফর দ্বারা জাতিসংঘ বাংলাদেশের জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় সমর্থন দান করে। এ সময়ে জাতিসংঘের সহায়তায় যুদ্ধকালীন সময়ে বিধ্বস্ত চালনা পোর্টে ডুবে যাওয়া জাহাজসমূহও অপসারন করা হয়। এছাড়া ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ফিরিয়ে আনতেও জাতিসংঘ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বাংলাদেশের জাতিসংঘে যোগদান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালায়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদের আদর্শ ও নীতিমালার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের যে সংবিধান গৃহীত হয় তাতে এমন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ও বাক্য রয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে জাতিসংঘের সনদ ও ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধানে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে: 'আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা, এই সকল নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি' (অনুচ্ছেদ-২৫)। বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত এমন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ও বাক্য রয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে জাতিসংঘের ভাবধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধানে মানবাধিকারের বিষয়টি সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার আলোকে প্রণীত হয়েছে, যা আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দেয়।

১৯৭২ সালে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রির নেতৃত্বে একটি পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে তৎপরতা চালায়। কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টোর সময়ে পাকিস্তান সরকারের প্ররোচনায় নিরাপত্তা পরিষদে চীনের ভেটো প্রয়োগের কারণে পর পর দু'বার বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ১৩৬ তম সদস্য হিসেবে জাতিসংঘে যোগদান করে। যোগদানের এক সপ্তাহ পর ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভ করলেও এর পূর্ব থেকেই জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থায় সদস্যপদ লাভ করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশকে প্রথম জাতিসংঘ সংস্থায় সদস্যরূপে স্বাগত জানায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। এর পর পরই বাংলাদেশ জাতিসংঘের বেশিরভাগ বিশেষায়িত অঙ্গ সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির পর থেকেই বাংলাদেশ বিশ্বসভায় তার ভূমিকা রেখে চলেছে এবং জাতিসংঘের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়েছে। জাতীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ পাচঁটি প্রধান ক্ষেত্র যেমন উন্নয়ন, পরিবেশ, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তিরক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভের এক বছরের মধ্যে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় এবং ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৮১ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত দু'বার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক) এর সদস্য হিসেবে কাজ করে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১ তম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হুমায়ুন রশিদ চৌধূরী ১৯৮৬-৮৭ মেয়াদে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ দু'বার নির্বাচিত হয়, প্রথমবার জাপানকে পরাজিত করে ১৯৭৯-৮০ সালে এবং দ্বিতীয়বার ২০০০-২০০১ সালে। বাংলাদেশের প্রথমবারের (১৯৭৯-৮০) নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সে সময়ে বিশ্বে ঠান্ডাযুদ্ধকালীন অবস্থা বিরাজমান ছিল এবং বিভিন্ন সংকটকালীন এজেন্ডা, যেমন: আরব-ইসরাইল উত্তেজনা, কম্বোডিয়ায় ভিয়েতনামীদের আগ্রাসন, আফগানিস্তানে সোভিয়েত অনুপ্রবেশ, ইরানের হোস্টেজ ইস্যু, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, আফ্রিকান রাষ্ট্র রোডেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি নিরাপত্তা পরিষদের এজেন্ডা হিসেবে উত্থাপিত হয়।

বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কম্বোডিয়া এবং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ভেটো প্রদানে বিরত রাখতে ব্যর্থ হলেও অবরুদ্ধ আরবভূমিতে ইহুদি বসতিস্থাপনে বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখে। তেহরানে আমেরিকান কূটনীতিকদের হোস্টেজ ইস্যুতে আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতির স্বীকৃতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেজ্যুলেশনে সমর্থন জ্ঞাপন করে। একই সময়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের প্রতিনিধি হয়ে জিম্বাবুয়ে থেকে রোডেশিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নে যে নির্বাচন হয়, তার তদারকি করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের যে অস্ত্রনিষেধাজ্ঞা কমিটি হয় তার সভাপতি নির্বাচিত হয়।

বিশ্বের পরিবর্তিত কূটনৈতিক পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা পরিষদে দ্বিতীয় মেয়াদে সদস্যপদ লাভের সময়েও (২০০০-২০০১) বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এঙ্গোলা, বসনিয়া হার্জেগোভিনা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (ডিআরসি), ইরাক, কসোভো, সিয়েরা লিয়ন এবং পূর্ব তিমুরের মতো বিষয়গুলো এ সময়ের নিরাপত্তা পরিষদের প্রাধান্য বিস্তারকারী ইস্যু হিসেবে বিবেচিত। এসময়ে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ দুটো কমিটি, সিয়েরা লিয়ন বিষয়ক কমিটি এবং অনুমোদনের ভূমিকা বিষয়ক কার্যকমিটির সভাপতি হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও বাংলাদেশ ২০০০ সালের মার্চ মাসে এবং ২০০১ সালের জুন মাসে নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক শক্তিশালী প্রবক্তা হিসেবে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ১৯৭৮ সালের শেষের দিকে জাতিসংঘ অধিবেশনে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক প্রস্তুতিমুলক কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ দায়িত্ব পালন করে এবং ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে পাশকৃত পারমানবিক অস্ত্র প্রসার রোধ বিষয়ক চুক্তি (এনপিটি) প্রণয়নে ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া ১৯৮২-৮৩ মেয়াদে ৭৭ জাতি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ১৯৮০ থেকে স্বল্পোন্নত দেশগুলির সমন্বয়ক হিসেবে বাংলাদেশ কাজ করেছে। বাংলাদেশ ১৯৮৫ সালে শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের (ইউএনএইচসিআর) এবং ১৯৯৮ সালে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সিটিডি কমিটির হাইকমিশনার নিযুক্ত হয়। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৮৫ সালে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ১৯৮৩-২০০০ মেয়াদে এবং ২০০৬-২০০৮ মেয়াদে কাজ করে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রধান সম্মেলনগুলোতে বরাবরই অংশগ্রহণ করে। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে জাতিসংঘের আহবানে যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হয়েছে বাংলাদেশ সবক'টিতেই অংশগ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন ঘোষণা, প্যান অব অ্যাকশন প্রণয়নে অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের উদ্যোগে গৃহীত অনেকগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তি ও মানবাধিকার সনদের স্বাক্ষরদাতা ও অনুসমর্থনকারী দেশ। এসবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন, চুক্তি এবং প্রটোকল যা বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন হয়েছে সেগুলো হলো: সকল প্রকার বর্ণগত বৈষম্য বিলোপে আন্তর্জাতিক কনভেনশন, নারীদের বিরুদ্ধে সবধরনের বৈষম্য বিলোপে কনভেনশন (সিডো), শিশু অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক কভেন্যান্ট, এন্টি পারসোন্যাল মাইন ব্যবহার প্রতিরোধ বিষয়ক চুক্তি, মরুভুমিকরণ প্রতিরোধে জাতিসংঘ কনভেনশন (ইউএনসিসিডি), রিও জীববৈচিত্র্য কনভেনশন, ভিয়েনা কনভেনশন, মন্ট্রিল প্রটোকল, লন্ডন এমেন্ডমেন্ট, কোপেনহেগেন এমেন্ডমেন্ট, মন্ট্রিল এমেন্ডমেন্ট, বেইজিং এমেন্ডমেন্ট।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৪ তম অধিবেশনে অ্যাকশন ফর এ কালচার অব পিস কর্মসূচী ঘোষণার সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া বাংলাদেশ পিস বিল্ডিং কমিশনেরও প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। বর্তমানে জাতিসংঘের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতময় এলাকায় চলমান শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, যার সঙ্গে বাংলাদেশ গভীরভাবে জড়িত। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শীর্ষস্থানে থাকা দেশসমূহের অন্যতম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের এ ভূমিকার সূত্রপাত ঘটে ১৯৮৮সালে ইরান-ইরাক মিলিটারি অবজারভেশন গ্রুপ (ইউএনআইআইএমওজি) এবং নামিবিয়াতে কার্যত ইউনাইটেড নেশনস ট্রান্জিশন অ্যাসিসট্যান্স গ্রুপে (ইউএনটিএজি) যোগদানের মাধ্যমে।

২০১০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১০,৫৭৪ জন (সামরিক বাহিনী এবং পুলিশ) শান্তিরক্ষী সদস্যকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করে এবং ১২ টি মিশনে ১১ টি রাষ্ট্রে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা কর্মরত রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা দেশের জন্য অন্যতম শীর্ষ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী শক্তি। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা তাঁদের দায়িত্ববোধ, কর্মনিষ্ঠা এবং দক্ষতা দ্বারা

উচু মর্যাদায় আসীন হয়েছে এবং তা বিশ্ববাসীর কাছে স্বীকৃত ও প্রসংশিত হয়েছে। সংকটকালীন সময়ে বিশ্বশান্তি রক্ষায় ঝুকিপূর্ণ দায়িত্ব পালনকালে ৮৮ জন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষা কর্মী এ পর্যন্ত তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছে।

বাংলাদেশে জাতিসংঘ বর্তমানে বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম ব্যাপক আকারে দেখা যায়। বাংলাদেশের জনগণের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ১০ টির বেশি জাতিসংঘ সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকার এবং জনগণের সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের কাজের ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে অর্থনীতি, বিদ্যুৎ শক্তি, পরিবেশ, জরুরী সহায়তা, শিক্ষা, দুর্যোগ, খাদ্য, জেন্ডার ইস্যু, সুশাসন, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, অভিগমন, পুষ্টি, অংশীদারিত্ব, জনসংখ্যা, দারিদ্র, শরণার্থী, শহরায়ন, কর্মসংস্থান এবং জীবনধারণ। জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ দেশের সুশাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন অ্যাক্ট ও অর্ডিন্যান্স তৈরিতে, এবং মানবাধিকার ইস্যু সমূহে ঝুকিপূর্ণ কর্মপরিকল্পনার উন্নয়নে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিতে এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নীতিগত সমর্থন দিয়ে থাকে।

জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতিসংঘ উন্নয়ন সহায়তাকারী কাঠামোর (আনডাফ) মাধ্যমে জাতিসংঘের সকল সংস্থা একত্রিত হয়ে যৌথভাবে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বে উন্নয়ন ধারণার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী বাংলাদেশে অবস্থিত জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান শাখা জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) জাতিসংঘ টিমের সাথে একত্রিত হয়ে আনডাফ-এর বাস্তবায়ন এবং উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। এই লক্ষ্যে ইউএনডিপি সরকারি সংস্থাসমূহকে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দেশের দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) তৈরিতে সহায়তা করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (ইউনেস্কো) উদ্যোগে সুন্দরবন এবং আরো কিছু ঐতিহাসিক স্থান বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পনেরো শতকে নির্মিত পাহাড়পুর বিহার এবং বাগেরহাটের বিভিন্ন মসজিদের সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইউনেস্কো ১৯৮৫ সালে এক আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে। ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও ইউনেস্কো প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং প্রতি বছর বিশ্বের সর্বত্র ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে এই দিন মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)-এর তত্ত্বাবধানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র গভীর নলকূপ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। বিশ শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকে রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, প্রজননকালীন স্বাস্থ্যসেবা, এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তার ক্ষেত্রে ইউনিসেফ বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থা দেশের বৃহত্তর কৃষি সেক্টরের সাথে জড়িত এবং বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের যে লক্ষ্য তা পূরণে পর্যাপ্ত ধান, গম এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণ দিয়ে সহায়তা করে থাকে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে কৌশলগত পরামর্শমূলক সেবা এবং কমোডিটি সাপোর্ট দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে ইউএনএফপিএ এ পর্যন্ত ছয়টি কান্ট্রি প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে সপ্তম কান্ট্রি প্রোগাম (২০০৬-২০১০) বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে স্থিতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রেও ইউএনএফপিএ যুক্ত আছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বাংলাদেশের জনশক্তির শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে এবং বাংলাদেশের শ্রম আইন আইএলও'র নীতিমালার সাথে ভারসাম্য রেখে প্রণীত হয়েছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডব্লিউএফপি) বাংলাদেশের কাজের বিনিময়ে খাদ্য এবং ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) কার্যক্রমে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (ইউএনএইচসিআর) বাংলাদেশ সরকারের সাথে মায়ানমার থেকে আগত ২৮,২০০ শরণার্থীর কল্যাণে এবং তাদের জীবনযাত্রার উন্নয়নে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল থেকে যৌথভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক দারিদ্র দূরীকরণের মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাংলাদেশের সহযোগী হয়ে কাজ করে থাকে।

বিশ্বব্যাংক অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা, সুশীল সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক লোকজন এবং স্থানীয় স্টক হোল্ডারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এছাড়াও বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রজেক্টে ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা (আইএমএফ)-এর সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। আইএমএফ'র ঋণ দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা আনয়নে সহায়তা করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের বাণিজ্য সুবিধা উন্মুক্ত করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিওএইচও) ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশের জনগনের স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং

স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে আসছে। ডব্লিউএইচও বাংলাদেশের স্বাস্থ্য এবং ঔষুধ নীতি পর্যবেক্ষন করছে।

বাংলাদেশে অবস্থিত জাতিসংঘের অনেক সংস্থা আর্থ-সামজিক প্রজেক্ট তৈরিতে সহায়তার লক্ষ্যে দেশের জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, ফেলোশীপ অথবা গবেষণার জন্য ফান্ড প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল জাতিসংঘের সংস্থা সমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং জাতিসংঘের এই সংস্থাসমূহের একটি করে অফিসও বাংলাদেশে রয়েছে। বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘের বিগত বছরের যে সম্পর্ক তা দ্বারা বাংলাদেশ সংবিধানের কার্যকারিতা সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি জাতিসংঘের মাধ্যমে বিশ্বে আরো সমুন্নত হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে দ্বিধা বিভক্ত এবং অর্থনৈতিক ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ দ্বিমেরু কেন্দ্রীক বিশ্বে জাতিসংঘ একমাত্র সংস্থা যা বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখতে পারে। বাংলাদেশ নীতিগতভাবে তাই জাতিসংঘের মূলনীতিসমূহ মেনে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-৬.৩ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সাম্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ২০১৭ সালের ২৪ অক্টোবর তার ৬ যুগ পূর্ণ হয়েছে। দেশে দেশে বিদ্যমান সংঘাত, সংঘর্ষ এবং যুদ্ধকে স্থায়ীভাবে

বন্ধ করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হলেও বাস্তবতার নিরিখে জাতিসংঘ তার সেই সব উদ্দেশ্য পূরণে পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। পরিমাপ করলে হয়তো ব্যর্থতার ভাগই বেশি হবে। জাতিসংঘ ব্যবহৃত হয়েছে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে। তাই যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করার জন্য ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হলেও বিশ্ব থেকে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হয়নি বরং বেড়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে জাতিসংঘের একেবারে নীর ভূমিকার কারণেই নানা দেশে বেড়েছে হিংসা, বৈষম্য, যুদ্ধ, সংঘাত, হানাহানি এবং প্রাণহানি। রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হলেও অনেক দেশ হারিয়েছে স্বাধীনতা, বরণ করেছে পরাধীনতা। ক্ষুদ্র এবং দুর্বল রাষ্ট্রসমূহ বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের পক্ষ থেকে আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তাই বিশ্ব এখনো অশান্তি এবং অস্থিরতায় ভরা। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, যুদ্ধ এবং সংঘাতে জর্জরিত বিশ্ব এখন অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপত্তাহীন। নিরপেক্ষ এবং যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারনে জাতিসংঘের প্রতি বিশ্ববাসীর সৃষ্টি হয়েছে আস্থাহীনতা। জাতিসংঘ মূলত আস্থা সংকটে ভূগছে। তাই এর সংস্কার ও সম্প্রসারণের দাবি উঠছে। জাতিসংঘের কাছ থেকে বিশ্ববাসী আরো বেশি দায়িত্বশীল এবং গঠনমূলক ভূমিকা আশা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বিশ্ববাসীকে যুদ্ধ এবং নৈরাজ্য থেকে মুক্তির দেয়ার জন্য ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল লীগ অব নেশন। কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের অবাধ্যতা এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় বিশ্বসংস্থা লীগ অব নেশন তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। ক্রমান্বয়ে তা অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে এই লীগ অব নেশন চূড়ান্তভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ভেঙ্গে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যুদ্ধ-হানাহানি বন্ধ না হয়ে বরং আরো বেড়ে যায়, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হবার পথ প্রশস্ত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পরে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ও অশান্তি দূর করার জন্য আবার ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, চীন এবং ফ্রান্স এই জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোক্তা। প্রতিষ্ঠাকালে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১ আর বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল স্বাধীন দেশই এর সদস্য এবং এর সংখ্যা ১৯৩। এসব দেশ জাতিসংঘের সদস্য হয়েছে, তাদের শান্তি, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে পৃথিবীর মানুষকে রেহাই দেবার প্রত্যাশায়। কিন্তু বিশ্ববাসীর দুর্ভাগ্য, জাতিসংঘ বিশ্বে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রসমূহ অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে জাতিসংঘের সদস্য হলেও শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা মোটেই নিরপেক্ষ নয়। তাদের হাত থেকে ক্ষুদ্র জাতিসমূহের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে জাতিসংঘ সনদেই তার ব্যর্থতার বীজ নিহিত রয়েছে। আর সেটা হচ্ছে ভেটো ক্ষমতা, যার মালিক হচ্ছে বৃহৎ পাঁচ রাষ্ট্র তথা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, চীন এবং ফ্রান্স। এরা সম্মিলিতভাবে কৌশলে এই ভেটো ক্ষমতা প্রবর্তন করেছে এবং এর মালিকানা নিজেরা নিয়ে নিয়েছে। মূলত এই ভেটো ক্ষমতা প্রবর্তনের ফলে সকল রাষ্ট্রের সমানাধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে।

জাতিসংঘ কখনোই তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি বরং তারাই জাতিসংঘকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই পাচঁটি রাষ্ট্রের মধ্যে যার ক্ষমতা এবং দাপট যত বেশি সে জাতিসংঘকে তত বেশি নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর এবং শক্তিশালী তাই যুক্তরাষ্ট্রই হয়ে গেছে এই জাতিসংঘের সার্বিক নিয়ন্ত্রক। যখনই জাতিসংঘে এই বৃহৎ পাচঁটি রাষ্ট্রের স্বাথের্র বিরুদ্ধে প্রস্তাব এসেছে তখনই এরা নিজেদের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেই প্রস্তাবকে বাতিল করে দিয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে আজ জাতিসংঘের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদে এর সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর কথা উঠেছে এবং ক্রমশ এই দাবি জোরালো হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হবার জন্য চেষ্টা করছে। ভারত, জাপান, জার্মানি, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশ নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হবার জন্য চেষ্টা করছে।

বিশ্ববাসীকে যুদ্ধ এবং অশান্তি থেকে রক্ষা করাই ছিল জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। এ জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। জাতিসংঘে সনদের মূল কথা সকল রাষ্ট্রের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি, সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। কেউ অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ

করবে না। কোন রাষ্ট্রের সাথে অপর কোন রাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দিলে তা জাতিসংঘের মাধ্যমে সমাধান হবে এবং জাতিসংঘের সেই সিদ্ধান্তের বাইরে কোন রাষ্ট্র কাজ করবে না।

কাগজে-কলমে সবাই জাতিসংঘের মূল সনদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করলে ও বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে বৃহৎ শক্তিসমূহ বরাবরই পালন করেছে উল্টো ভূমিকা। নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য এবং অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য এসব বৃহৎ শক্তি সবসময় গায়ের জোরে নিজেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করেছে এবং নিজেদের স্বার্থে সবসময় জাতিসংঘকে ব্যবহার করেছে। অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান দেখানো জাতিসংঘের মূল সনদের নির্দেশনা হলেও জাতিসংঘকেই পাশ কাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে শক্তির জোরে দখল করেছে ইরাক-আফগানিস্তান, যে দুটি রাষ্ট্রই জাতিসংঘের সদস্য। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ সম্পূর্ণ অসহায় এবং ব্যর্থ।

১৯৪৮ সালে কাশ্মীরের গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়েছিল জাতিসংঘে এবং গণভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এখন এই কাশ্মীর সংকট নিয়ে বছরের পর বছর ধরে লড়ে যাচ্ছে ভারত পাকিস্তান যার কোনো সমাধান করা সম্ভব হয়নি। এই ১৯৪৮ সালে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইসরাইল তাদের সামরিক শক্তিবলে ফিলিস্তিনিদের ওপর চালিয়ে যাচ্ছে নারকীয় নির্যাতন, বর্বরতা ও ভূমিদখলের তাণ্ডব। বিশ্বের নানা দেশের মধ্যস্থতা ও উদ্যোগে ফিলিস্তিনের উপর পরিচালিত ইসরাইলি হত্যা এবং নির্যাতন নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও জাতিসংঘ সরাসরি এ নিপীড়ন বন্ধ করতে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। জাতিসংঘে এ পর্যন্ত যতবারই ইসরাইলের বর্বরতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন প্রস্তাব এসেছে ততবারই যুক্তরাষ্ট্র ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সেই প্রস্তাবকে বাতিল করে দিয়েছে।

বসনিয়ার দুই লক্ষাধিক বেসামরিক মানুষের প্রাণহানির পেছনেও জাতিসংঘের ব্যর্থতা রয়েছে। এক্ষেত্রে ও জাতিসংঘ সার্বদের বর্বরতার হাত থেকে বসনিয়ার নিরপরাধ বেসামরিক মানুষগুলোকে রক্ষা করতে পারেনি। চেচনিয়া আর মিন্দানাওয়ের মানুষ দীর্ঘদিনের সংগ্রামে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি কেবল জাতিসংঘের নীরব ভূমিকার কারণে। তবে পূর্বতিমুরের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে এই জাতিসংঘই। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় সেখানে গণভোট অনুষ্ঠান করে তার রায় অনুযায়ী পূর্বতিমুরকে স্বাধীন করা হয়েছে। অন্যদিকে লিবিয়া, ইয়েমেন এবং সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ বন্ধে ও জাতিসংঘ চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে মিয়ানমারের উগ্র জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধরা স্থানীয় আদিবাসী রোহিঙ্গাদের উপর জাতিগত নিধন চালালেও জাতিসংঘ তা বন্ধ করতে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। এ ধরণের নানা কারণে সম্প্রতি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা ও সক্ষমতা বারংবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

সারাংশ

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সাম্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ২০১৭ সালের ২৪ অক্টোবর তার ৬ যুগ পূর্ণ হয়েছে। দেশে দেশে বিদ্যমান সংঘাত, সংঘর্ষ এবং যুদ্ধকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হলেও বাস্তবতার নিরিখে জাতিসংঘ তার সেই সব উদ্দেশ্য পূরণে পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। সফলতা ব্যর্থতা সবমিলিয়ে যাই হোক না কেনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপযুক্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারায় অনেক দেশের জন্য জাতিসংঘ এখনও আস্থার প্রতীক হয়ে টিকে আছে।

স্নায়ুযুদ্ধঃ পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দ্বন্দ্ব

ইউনিট ৭

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে এর শুরু হয়েছিল এবং এর শেষ হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের পর। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে সে সময়কার আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ এবং নেতৃস্থানীয় সামরিক ব্যক্তিরা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিলেন। তখন সরাসরি কোনো যুদ্ধ হয়নি তবে এক রকম যুদ্ধের মহড়া চলতে থাকে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে স্নায়ুযুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। রণাঙ্গনে কোন যুদ্ধ না হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ আরেকটি যুদ্ধ ঘটার আশঙ্কায় তটস্থ ছিল পুরো বিশ্বের মানুষ। এক অর্থে তখনকার তৎকালীন বিশ্ব দুটি পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রায় দুভাগ হয়ে গিয়েছিল । এ বিভাজনের মূলমন্ত্র হিসেবে মনে করা যেতে পারে পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব। পুঁজিবাদী শিবিরের নেতৃত্বে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গুলোর নেতৃত্ব দিত সোভিয়েত ইউনিয়ন। তাদের অনুসরণকারী দেশগুলোর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন বিশ্বের নানা দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ শুরু করে। এই একই পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পা বাড়ালে ভয়াবহ এক যুদ্ধ পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যায় বিশ্ব।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

- ✓ **পাঠ-৭.১** **স্নায়ুযুদ্ধের ধারণা**
- ✓ **পাঠ-৭.২** **স্নায়ুযুদ্ধের উৎস**
- ✓ **পাঠ-৭.৩** **স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব**
- ✓ **পাঠ-৭.৪** **স্নায়ুযুদ্ধকালিন বিশ্ব পরিস্থিতি**
- ✓ **পাঠ-৭.৫** **স্নায়ুযুদ্ধের অবসান**

পাঠ-৭.১ স্নায়ুযুদ্ধের ধারণা

আভিধানিকভাবে ধরতে গেলে স্নায়ুযুদ্ধ কথাটির উদ্ভব আজ থেকে অনেক দিন আগে ১৯৪৭ সালের ১৩ এপ্রিল। কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব বার্নাড বালুচ কলম্বিয়ার এক ভাষণে সর্বপ্রথমে প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি তার ভাষণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে কথা বলেন। তিনি সেখানে উল্লেখ করেন পুরো বিশ্বের মানুষ এখন আর প্রতারিত হতে চায় না তারা এক ভয়াবহ স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে আছে। তবে তিনি স্নায়ুযুদ্ধ বলতে কোন যুদ্ধাবস্থা বোঝাননি। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে, কিন্তু কোথাও কোন যুদ্ধ হচ্ছে না কিংবা রক্তপাত ঘটছে না।

স্নায়ুযুদ্ধ এমন একটি কৌশল যেখানে বিবাদমান পক্ষগুলো ভয়াবহ স্নায়বিক উত্তেজনার মধ্যে থাকবে একে অন্যের উপর চাপ বৃদ্ধি করতে থাকবে কিন্তু সরাসরি যুদ্ধের ঝুঁকি নেবে না। এক্ষেত্রে কোন দেশ সরাসরি যুদ্ধের ঝুঁকি না নিলেও এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করে রাখবে যা যুদ্ধ পরবর্তী কিংবা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্ম দেবে। সরাসরি যুদ্ধের ঝুঁকি না থাকলেও এক্ষেত্রে এমন একটি যুদ্ধের আবহ তৈরি হবে যা এক অর্থে যুদ্ধ নয়, শান্তিও নয়।

বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উত্থান পতন টানাপোড়েন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তিক্ততা কিংবা মতবিরোধ এ যুদ্ধকে প্রণোদিত করে। সম্পর্কের তিক্ততা, উত্তেজনা নিরসনে সরাসরি অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা চালানো হলে তাকে আমরা সরাসরি যুদ্ধ বলি। কিন্তু ছায়া যুদ্ধের ক্ষেত্রে বাস্তবতা হচ্ছে-বিবদমান প্রত্যেকটি পক্ষ যুদ্ধ শুরু করতে চায়, কিন্তু করে না। তারা প্রত্যেকেই যুদ্ধের মহড়া দিতে থাকে কিন্তু সরাসরি রণাঙ্গনে নাম আর ঝুঁকি নিতে চায় না। সশস্ত্র সংঘাতের ভয়ে প্রত্যেকে তটস্থ থাকলেও রণসমাবেশ এবং অস্ত্রের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে কেউ কার্পণ্য করেনি। ফলে যুদ্ধ না হলেও এক ধরনের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে যা বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বিবদমান শক্তিশালী দুটি রাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ মনোবৃত্তি এক অর্থে বিশ্ববাসীর শান্তি বিনষ্টের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়। পুরো পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ না হলেও অনভিপ্রেত অর্থ একে এক ধরনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বলা যেতেই পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় দুটি বিবাদমান পক্ষ ছিল তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর নেতৃত্বে থাকা যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নেতৃস্থানীয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি এক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। এ দ্বন্দ্বের নিরসনে কোন ধরনের সামরিক হস্তক্ষেপ তখন দেখা যায়নি তবে সর্বক্ষণ এক রকম রণাঙ্গনের পরিবেশ বিরাজ করেছে বিশ্বজুড়ে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সামরিক এবং অর্থনৈতিক জোট গঠনের মাধ্যমে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মহড়া দিতে থাকে তবে বিশ্বের বেশিরভাগ রণাঙ্গন তখন ছিল শান্ত। রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের মানসিকতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের নিরন্তর চেষ্টা তাদের সামরিক মহড়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেও একে অন্যের উপর আক্রমণের সাহস করেনি। ফলে রণাঙ্গনে যুদ্ধ না হলেও আদর্শগত এবং মতাদর্শিক ক্ষেত্রে সংঘাত চলতে থাকে যা ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বব্যাপী। এর ফলে সৃষ্ট উত্তেজনা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে স্নায়ুযুদ্ধ হিসেবে।

বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফ্রাংকেল মনে করেন, গণতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচেষ্টার যে দ্বন্দ্ব তার ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর সমন্বয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল স্নায়ুযুদ্ধ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফ্রিডম্যান মনে করেন স্নায়ুযুদ্ধ যুদ্ধের একটি নতুন কৌশল যেখানে যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করলেও রণাঙ্গনে কোন সংঘাত ঘটে না। এ দুটি ধারণা থেকে বলা যায় যে, সম্মুখ যুদ্ধকে এড়িয়ে বিরোধপূর্ণ পরিবেশে কূটনৈতিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় স্যার যুদ্ধের আরেক রূপ হল স্নায়ুযুদ্ধ। এই যুদ্ধকে আরেক অর্থে যুদ্ধহীন যুদ্ধ বলা যায়, যেখানে শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের উপর চাপ প্রয়োগ করলেও সরাসরি আক্রমণে অংশ নেয় না।

পাঠ-৭.২ স্নায়ুযুদ্ধের উৎস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শত্রুভাবাপন্নতার শুরু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকেই। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা রুশ জারের পতন ঘটায় এবং তৎপরবর্তী কমিউনিস্ট রাশিয়া বিশ্বযুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। ১৯১৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপান রাশিয়াতে সামরিক অভিযান চালায়। তারা যুদ্ধ হতে রাশিয়ার সরে যাওয়ার ফলে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মানির পূর্ব দিকে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা পূরণের লক্ষ্যে এটা করেছিল বলে কারণ দর্শায়। কিন্তু লেনিনের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট সরকার এই পদক্ষেপকে আক্রমণ হিসেবে গণ্য করে। আসলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় শক্তিরা পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রচার ও সাম্যবাদের আন্তর্জাতিকীকরণের তোড়জোড় শুরু করার জন্য নতুন এই রাশিয়ার প্রতি বিরূপ ছিল। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়া ও তার আশেপাশের অঞ্চল নিয়ে কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণের অধীনে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৩ সালের আগে সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেয়নি। ১৯২৯ সালে স্তালিন ক্ষমতায় আসার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার গভীর রাজনৈতিক অনৈক্য আরও অবনতির দিকে মোড় নিতে থাকে।

১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে স্তালিন জার্মানির একনায়ক হিটলারের সাথে একটি আগ্রাসন-বিরোধী সন্ধি চুক্তিতে সই করেছিলেন। এখানে দুই পক্ষ একে অপরকে আক্রমণ না করার শপথ নেয়। পাশাপাশি জার্মান ও সোভিয়েত প্রভাব বলয়ের অন্তর্বর্তী অঞ্চলগুলি একে অপরের মধ্যে ভাগ করে নিতে সম্মত হয়। কিন্তু হিটলার চুক্তি ভঙ্গ করে ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মান সেনাবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেছিলেন। এসময় যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েতদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। জার্মানদের বিরুদ্ধে তারা তিন পরাশক্তি মিলে মিত্রশক্তি তথা কোয়ালিশন গঠন করে। কিন্তু এই কোয়ালিশনের মিত্রদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অভাব ছিল না। সোভিয়েত পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে তিন শক্তির মধ্যে সোভিয়েতরাই সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছে। ১৯৪৪ সালে জার্মানদের পরাজয় যখন অবধারিত, তখন যুদ্ধ-পরবর্তীকালে এই কোয়ালিশনের সদস্যদের সম্পর্ক কেমন হবে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৯৪৫ সালের মে মাসে নাৎসি জার্মানির পরাজয়ের আগেই পোল্যান্ডের ভবিষ্যতের প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মতদ্বৈততা প্রকাশ করে। স্তালিনের সেনারা ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালে পোল্যান্ড থেকে জার্মানদের হটিয়ে দেয় এবং সেখানে একটি সাম্যবাদ-সমর্থক সরকার স্থাপন করে। স্তালিন বিশ্বাস করতেন যে তাঁর দেশের নিরাপত্তার জন্য পোল্যান্ডের সোভিয়েত বলয়াধীন থাকা জরুরি। কিন্তু মিত্রশক্তিরা এর বিরোধিতা করে, এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও এই একই দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাই বলা যায়, ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপের নিয়তি নিয়ে দ্বন্দ্বই স্নায়ুযুদ্ধের বীজ বপন করে। তবে এ সময় দুই পক্ষই আশা করছিল যে, এই মতানৈক্য কেটে যাবে এবং যে বন্ধুত্বপূর্ণ চেতনা নিয়ে তারা যুদ্ধের সময় একত্র হয়েছিল, তা রক্ষা করা যাবে।

পাঠ-৭.৩ স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে এবং তার কিছুদিন পরে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়ার নাম বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্ররোচনায় ইউরোপের সমস্ত দেশ আস্তে আস্তে সমাজতান্ত্রিক ধারার দিকে অগ্রসর হবে। ফলে দিনের পর দিন রাশিয়ার শক্তিমত্তা বৃদ্ধি পাবে। এ পরিস্থিতিতে তারা বিশ্বজুড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্য বিস্তারের সমস্যা দেখতে পায়। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য সম্মিলিতভাবে প্রত্যক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে যে শক্তির পরীক্ষায় তাদের থেকে অনেকটা এগিয়ে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। নানা দেশে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার ধারণা প্রচার করে তারা নানা ক্ষেত্রেই সফল হয়েছে।

বিশ্বের নানা স্থানে তাদের সফলতা যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মনে একরকম পরাজিত হওয়ার ত্রাস তৈরি করে। বিশেষ করে তারা চিন্তা করতে থাকে পরিস্থিতি এমন বিরাজ করলে একটা পর্যায়ে এসে সোভিয়েত ইউনিয়নও জার্মানির মতো যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সফলতা যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মনে যে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তার মূল কারণ ছিল ক্রমবর্ধমান এক আধিপত্যবাদ। তারা চিন্তা করেছিল, এভাবে চলতে থাকলে এক পর্যায়ে বিশ্বের সব দেশের উপর সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্য নিশ্চিত হবে। নানা দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্য বিস্তার ঘটলে বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের কর্তৃত্বহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা যুক্তরাজ্য সরাসরি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সাহস দেখায়নি। তবে তারা নানা দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর চাপ প্রয়োগ প্রয়োগ করতে থাকে। এ চাপের ফলে এক রকম সামরিক সাম্যবস্থার জন্ম নেয়, যা কোন বর্ধমান শক্তিমত্তার অধিকারী সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা পরাক্রান্ত যুদ্ধবাজ দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সূচনাপর্বে কোন শক্তি সে যুদ্ধকে প্রণোদিত করেছিল সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলা কঠিন। বিশ্লেষকগণ এ যুদ্ধের সূচনা পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তাদের হিসাবে ক্রমবর্ধমান শক্তির মহড়া বিশ্ববাসীকে এ যুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছিল। কারো কারো ধারণা সোভিয়েত ইউনিয়নের কম সম্প্রসারণ বাদি ধারণা এ যুদ্ধের দিকে বিশ্ববাসীকে ধাবিত করে থাকতে পারে। বিশ্বের নানা দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বিস্তারের যে প্রবণতা, সেখানে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা যুক্তরাজ্য বাধা হয়ে না দাঁড়ালে তারা যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রকে দুর্বল ভাবতে পারে। তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তির পরীক্ষায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ানোর পর সেই যুক্তরাষ্ট্র স্নায়ুযুদ্ধের সূচনাপর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে বিশ্লেষণ করতে গেলে ১৯৪৬ সালের ৫ মার্চ যুক্তরাজ্যের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের ফুলটন বক্তব্য অনেক গুরুত্বের সঙ্গে বিচার্য। ফুলটন বক্তৃতায় ১৯৮০ সালের দিকে চার্চিল উল্লেখ করেছিলেন, রাশিয়া একমাত্র শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত আর কোন ভাষা বোঝে না। তাই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়ার উপর শক্তি প্রয়োগের বিকল্প নেই। বিশ্বের অন্য সব শক্তিশালী রাষ্ট্রের রাশিয়ার উপর চাপ প্রয়োগের যে নীতি তা শেষ পর্যন্ত রূপ নিয়েছিল স্নায়ুযুদ্ধে।

পাঠ-৭.৪ স্নায়ুযুদ্ধকালিন বিশ্ব পরিস্থিতি

স্নায়ুযুদ্ধ শুরুর সময় নিয়ে মতভেদ থাকলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একটি বিষয় নিশ্চিত করেছেন তা হচ্ছে এটি হঠাৎ করে শুরু হয়নি কিংবা শেষ হয়ে যায়নি। মনে করা হয়, ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হয়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এর বাস্তব রূপ সবার কাছে ধরা পড়ে। তবে অনেকের ধারণা ১৯৪৬ সালে ফুলটন বক্তৃতায় চার্চিলের মন্তব্য থেকে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তবে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাতকে চিহ্নিত করা যায় না। তার হিসাবে ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনার সময় থেকেই মার্কিন-রাশিয়া বিরোধ ধীরে ধীরে সে যুদ্ধে রূপ নেয়। এই যুদ্ধ ঘটেছিল একটা মহড়ার মধ্য দিয়ে। সরাসরি যুদ্ধ শুরু না হলেও সর্বত্র তখন এক রকম যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে।

যুদ্ধকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি বোঝার জন্য এর দুটি পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা জরুরি। বিশেষ করে ১৯৪৫ সালের দিকে ছায়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে একে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি প্রায় দুই দশক বজায় ছিল। এক্ষেত্রে একটি দশকে অপেক্ষাকৃত বেশি উত্তেজনা কাজ করেছে। অন্য একটি পর্বে এসে উত্তেজনা অনেকাংশে কমে যায়। সেখানে সামরিক জোট গঠন, পাল্টা সামরিক জোট সৃষ্টি, দুই বৃহৎ শক্তির প্রভাব বলয় সৃষ্টির প্রবনতার পাশাপাশি নানা দিক থেকে উত্তেজনা প্রকাশ পায়। বইয়ের ভাষায় একে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' যুগ বলা হলেও প্রকৃত অর্থে কতটুকু শান্তি বিরাজ করছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা কঠিন। সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে হঠাৎ শক্তিশালী হয়ে ওঠায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এক অর্থে অশান্ত হয়ে পড়েছিল পুরো বিশ্ব।

প্রথম পর্যায়ে ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতাদর্শিক সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উদ্ভব, ট্রুম্যান নীতি, মার্শাল পরিকল্পনা, বার্লিন সংকট, ওয়ারশ চুক্তি, ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি, কিউবা সংকট প্রভৃতি বিষয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এ পর্বের প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা ট্রুম্যান তত্ত্বের পরিচয় পাই। পূর্ব ইউরোপের দেশ গুলোতে সাম্যবাদের প্রসার ঘটতে শুরু করলে গণতন্ত্রের পরিত্রাণকারী হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান নিশ্চিত করে। তাদের রাজনীতির প্রচারে এটাই প্রাধান্য পেতে শুরু করে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরো বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। তারা আরো প্রচার করে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব না হলে বিশ্ব মানবতার মুক্তি সম্ভব নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্প্রসারণবাদে ভয় পেয়ে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ১৯৪৭ সালে যে তথ্য প্রকাশ করেন, সেটা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়েছে 'ট্রুম্যান তত্ত্ব' নামে। এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ছিল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় ঐক্য রক্ষার নামে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অজুহাত প্রতিহত করা। পাশাপাশি ট্রুম্যান তত্ত্বের আলোকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে হস্তক্ষেপ করছিল তার প্রতিরোধেও একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা চালানো হয়।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটেন গ্রিস থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রিস-তুরস্ক সংকটে হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়। গ্রিসে তখন সম্মিলিত তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রিসের জাতীয় ঐক্য রক্ষার নামে সেখানে সামরিক হস্তক্ষেপ করে যে সাফল্য পেয়েছিল তা স্নায়ু যুদ্ধকে তীব্র করে তোলে। ১৯৪৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব জর্জ মার্শাল ঘোষণা করেন বাইরের সাহায্য না পেলে ইউরোপের ভেঙে পড়া অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। তখন ইউরোপীয়রা ধীরে ধীরে তাদের করণীয় ঠিক করতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া দেশগুলো নানাভাবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে। যুক্তরাষ্ট্র নানাভাবে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের যাত্রা কঠিন করে দেয়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর হয়। তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে যে কোনো ধরনের সহায়তা পেতে থাকে। তাদের যেকোনো রকম সংকটে এবং বিশেষ করে সোভিয়েত বিরোধী সংগ্রামে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সহায়তা করার যে প্রবণতা সেটাই মার্শাল পরিকল্পনা নামে ইতিহাস বিখ্যাত হয়েছে।

ইউরোপের নানা ব্যাপারে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার উষ্ণ প্রতিক্রিয়া জানায়। ইউরোপের রাজনীতিক ব্যাপারে আমেরিকার সরাসরি হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও তাদের অভিমত জানিয়ে দেয়া হয়। তারা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে যে, ইউরোপের অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করলে তার ফলাফল ভালো হবে না। এর পরেও রাশিয়ার হুমকি উপেক্ষা করে ইউরোপের ১৬ টি কমিউনিস্ট বিরোধী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। তারা নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার

কথা ঘোষণা করে। এই দেশগুলোর মধ্যে অনেক দেশ আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে তাদের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটায় বলে তাদের দেখে আরো অনেক দেশ অনুপ্রাণিত হয়। এ সময় রুশবিরোধী দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকে ত্বরান্বিত করলেও স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনাকে নানা দিক থেকে উস্কে দিয়েছিল বলে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন।

১৯৪৮ সালের দিকে এসে ইউরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি চেকোস্লোভাকিয়া কমিউনিস্টদের দখলে চলে যায়। রাশিয়ার এ সাফল্যের ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্র যার পর নাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। ঠিক এ বছরে সোভিয়েত রাশিয়া বার্লিন অবরোধ করে বসলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের অবরোধ থেকে বার্লিনবাসীকে বাঁচানোর জন্য আকাশ থেকে খাদ্য ফেলে সাহায্য করে আমেরিকা। এই অবরোধের মধ্য দিয়ে জার্মানির সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ সরাসরি যুদ্ধে রূপ নিতে থাকে। পক্ষান্তরে এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল 'ন্যাটো' নামক একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটায় আমেরিকা। তবে মূলত আমেরিকার সোভিয়েত ভীতি থেকেই এই ন্যাটোর সৃষ্টি বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

অন্যদিকে ন্যাটোর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে রাশিয়াও এ সময় ওয়ারশ চুক্তি করেছিল। তখন এ চুক্তির মধ্য দিয়ে রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার হস্তক্ষেপ থেকে তার অধীনে থাকা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোকে রক্ষা করা। বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শে অনুপ্রাণিত রাষ্ট্রগুলোর উপর আমেরিকার হস্তক্ষেপ যাতে না হয় সেজন্য ওয়ারশ চুক্তি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে বিশ্বাস করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই সংস্থা দুটি কার্যক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছিল সে ব্যাপারে বলা কঠিন। তবে এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বৈরথ একটা নতুন মাত্রা লাভ করে।

১৯৪৯ সালে চীনে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধ আরেক দিকে মোড় নেয়। তখন কমিউনিস্টদের প্রতি তীব্র ভয় এবং ক্ষোভ থেকে যুক্তরাষ্ট্র চীনের নতুন সরকারকে স্বাগত জানানোর মত সৌজন্য দেখাতে পারেনি। বরং তারা তাদের স্বাগত জানানো থেকে বিরত থাকে। ঠিক এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চীনের নতুন সরকারকে স্বাগত জানানো হলে তাদের মিত্রতা স্নায়ুযুদ্ধকালীন উত্তেজনা আরেক ধাপ বাড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোরিয়ার গুরুত্ব বাড়তে থাকলে এশিয়ায় এসে স্নায়ুযুদ্ধ নতুন রূপ নেয়। ১৯০২ সালের দিকে একটি সম্মেলনে স্থির করা হয়েছিল কোরিয়া বিদেশী নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পাবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের কাছ থেকে কোরিয়া কেড়ে নেয়। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করলে পরিস্থিতি নতুন দিকে ধাবিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই চার পরাশক্তি মিলে একটা পর্যায়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে কোরিয়ার উপর তারা চারজনই পৃথকভাবে কর্তৃত্ব করতে পারবে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ৩৮ ডিগ্রি অক্ষরেখা অনুযায়ী কোরিয়াকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। এক্ষেত্রে দক্ষিণ অংশের উপর আমেরিকার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এই অংশের নাম দেওয়া হয় দক্ষিণ কোরিয়া। পাশাপাশি উত্তর অংশের উপর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের যা ইতিহাসে পরিচিতি পায় উত্তর কোরিয়া নামে। দক্ষিণ কোরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি চীনের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার পক্ষে অনুকূল ছিল না। বিশেষ করে তাদের নতুন সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি না দেয়ায় তারা শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্রকে নিজেদের শত্রু ভাবতে শুরু করে। পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিত্রতা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শত্রুতার আগুনে ঘি ঢালে। পরবর্তীকালে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রু যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে চীনের শত্রুতে পরিণত হয়। তাই এক পর্যায়ে এসে চীন কোরিয়ার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করলে তিন বৃহৎ শক্তির ছায়াযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয় এশিয়ার মানুষের। এক পর্যায়ে সে স্নায়ুযুদ্ধ সরাসরি যুদ্ধে রূপ পেলে আমেরিকা কোরিয়ায় এসে পরাজিত হয়। ১৯৫৩ সালে কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধের অবসান হলেও সেখানকার ছায়া যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।

১৯৫৩ সালের দিকে রাশিয়ায় স্ট্যালিনের মৃত্যু হলে স্নায়ুযুদ্ধ কিছুটা স্তিমিত হতে শুরু করে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে তখন ক্ষমতায় আসেন আইজেনহাওয়ার। তখন থেকে দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। ১৯৫৪ সালে বার্লিন ও জেনেভা সম্মেলন নামের দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জেনেভা সম্মেলনে আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল মারণাস্ত্রের নির্বিচার উৎপাদন ও ব্যবহারের কোনো যৌক্তিকতা নেই। এর বাইরে উভয় দেশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। ১৯৫৪ সালের দিকে পরিস্থিতির বদল স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেখানে আমেরিকার নেতৃত্বে

গঠিত হয় আরেকটি সংগঠন। তখন মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষার সংগঠনগুলো এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এ সময়ে স্নায়ু যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাসের বদলে বৃদ্ধি পায় এবং প্রমাণ তত্ত্বের মত আইজেন হাওয়ার মধ্যপ্রাচ্যের গণতন্ত্র স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য সব রকম সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এ সময় এসে স্নায়ুযুদ্ধ তীব্র করতে শুধু আমেরিকা এককভাবে দায়ী নয়; ১৯৪৯ সালে জার্মানির দু'ভাগ হয়ে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে একভাগ জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র যা পশ্চিম জার্মানি নামে পরিচিতি পায়। অন্যদিকে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র পূর্ব জার্মানি নামে পরিচিতি পায়। স্নায়ু যুদ্ধের ফলে অতীতের ক্ষতবিক্ষত জার্মানি আবার বিভক্ত হয়ে যায়।

দুই বৃহৎ শক্তি শীর্ষ নেতার অনুপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি হঠাৎ পাল্টাতে থাকে ১৯৬৪ সালের দিকে এসে। তখন প্রত্যেকের মনে ধারণা জন্মায় যে, পারমানবিক বোমা কারো জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তখন উভয়পক্ষ ধীরে ধীরে বিবাদ অবসানের দিকে নজর দেয়। তাদের প্রত্যেকে অনুভব করতে থাকে যে ভাবে হোক বিবাদ মিটিয়ে ফেলা গেলে প্রত্যেকের মঙ্গল। এক্ষেত্রে যুদ্ধের মহড়া বাদ দিয়ে প্রত্যেকে চেষ্টা করে এক ধরনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি করার জন্য। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া স্ব স্ব অবস্থানে উপযুক্ত নীতি অনুসরণের দিকে অগ্রসর হলে বিশ্ব রাজনীতিতে ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে আসে। তবে ছায়া যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এর দ্বারা আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হয়েছে এমন নয়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্যবাদী প্রচেষ্টার বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পুরো সময় অতিষ্ঠ করে রাখে বিশ্বকে।

পাঠ-৭.৫ স্নায়ুযুদ্ধের অবসান

প্রথমদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল বিশ্বের অন্যান্য সব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের থেকে অনন্য। পরবর্তীকালে বলতে গেলে বিশ্বের নানা স্থানে গড়ে ওঠা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো এক অর্থে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অনুসরণ করতো। ধীরে ধীরে বিশ্বের অনেকগুলো দেশে ছড়িয়ে পড়ে এই আদর্শ। বিশ্বের নানা স্থানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্য যুক্তরাষ্ট্রের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। ফলে বিশ্বের নানা স্থানে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় সোচ্চার হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা প্রকাশের যে দ্বৈরথ তা ধীরে ধীরে এক পর্যায়ে এসে স্নায়ুযুদ্ধকে স্তিমিত করে তোলে। বিশেষ করে বিশ্বের নানা স্থানে কমিউনিজম প্রতিরোধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা সফল হয়। তারা রাশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত অনেকগুলো দেশে তাদের পছন্দের মানুষকে ক্ষমতায় বসাতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে এসব রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ থেকে সরে আসে। পরে যুক্তরাষ্ট্রের বিজয় এবং রাশিয়ার পরাজয় নিশ্চিত করতে সোচ্চার হয় বিশ্বের অনকেগুলো দেশ। বলতে গেলে তাদের পরস্পর দ্বৈরথ এক পর্যায়ে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।

স্নায়ুযুদ্ধ বন্ধের কারণগুলো পর্যালোচনা করতে গেলে সবার আগে আমলে নিতে হবে অস্ত্রের মহড়া বন্ধের মানসিকতাকে। এক্ষেত্রে রাশিয়া কিংবা আমেরিকার প্রত্যেকে বুঝতে সক্ষম হয় যে বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার কিংবা নিরাপত্তার ঝুঁকি নিরসনের দুশ্চিন্তা তাদের সমস্যা সমাধানে যথেষ্ঠ নয়। দীর্ঘ যুদ্ধের ডামাডোলে দুই একবারের জয় তাদের জন্য শান্তি আনতে পারবে না এটা দেরিতে হলেও তারা বুঝতে পেরেছিল। ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক সন্দেহ অবিশ্বাস দূর করে সরাসরি চুক্তির চেষ্টা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। স্নায়ুযুদ্ধ সৃষ্টিতে যেমন কতগুলো জোটের ভূমিকা ছিল তেমনি এর অবসানের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জোটের ভূমিকাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বা ন্যাটো এর ভূমিকাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তবে এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশের যুদ্ধের মহড়া বন্ধের চেষ্টা। তারা এই যুদ্ধের মহড়া থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে পেরেছিল বলে স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষত, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রয়োজন সামনে রেখে আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলো আমেরিকা থেকে সাহায্য নেয়ার মাধ্যমে সরাসরি তাদের বিরোধিতা করে বসে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের অপরাধে তাদের দমন করতে পারেনি। ফলে এক পর্যায়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে স্নায়ুযুদ্ধের মহড়া।

সারাংশ

রাশিয়া এবং আমেরিকায় দুই শক্তির দ্বৈরথ শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে স্নায়ুযুদ্ধ হিসেবে। এক অর্থে ধরতে গেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের রাজনীতি এবং এ স্নায়ুযুদ্ধ অনেকটাই সমর্থক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার পাশাপাশি তাদের সমর্থনপুষ্ট রাষ্ট্রগুলোর রাজনীতি একার্থে আবর্তিত হয়েছিল এই স্নায়ুযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই। বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্র ক্ষমতার উত্থান-পতন রাজনীতির রূপান্তর ও পরিবর্তন থেকে জন্ম নেয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে সন্দেহ, উত্তেজনা এবং সম্পর্কের টানাপোড়েন। এই সম্পর্কের শীতলতা এক অর্থে নির্ধারিত হয়েছে রাশিয়া এবং আমেরিকার প্রত্যক্ষ সমর্থন কিংবা অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের দিকে স্নায়ু যুদ্ধের উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলেও তা এক অর্থে বিলুপ্ত হয়নি। সম্প্রতি সিরিয়া সংকট নিয়ে নতুন করে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে তাকে স্নায়ুযুদ্ধের নতুন রূপ বলে মনে করছেন অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক। তবে আভিধানিক অর্থে স্নায়ুযুদ্ধ বলতে যা বোঝায় তার নিরসন ঘটেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে।

স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব

ইউনিট ৮

ভূমিকা

ইতিহাসের পাতায় ১৯৯১ সালের ৩১ ডিসেম্বর দিনটি স্মরণীয় হয়ে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্তির দিন হিসেবে। এদিন পুরো বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক নিমিষে বদলে গিয়েছিল মনে করা হয়। বিশেষত, বিশ্বের রাজনৈতিক ভারসাম্যে একটি বদল লক্ষ্য করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন নিছক কোনো রাষ্ট্রজোটের পতন নয়। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সাত দশকের প্রতাপশালী একটি এক পরাশক্তির পতন ঘটেছিল। ১৯৮৯-৯১ সালের এই তিন বছরে পর পর তিনটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে যায়। বস্তুত এই ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ফলাফল বলা যেতে পারে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বে প্রায় ১৫ টি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থান ঘটতে দেখা যায়। এরপর বিশ্বের উদীয়মান রাষ্ট্রগুলোকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত হয় আমেরিকা। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ লক্ষ করা যায়।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

- ✓ **পাঠ-৮.১** **সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পটভূমি**
- ✓ **পাঠ-৮.২** **সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি**
- ✓ **পাঠ-৮.৩** **বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির প্রভাব**
- ✓ **পাঠ-৮.৪** **সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতনের প্রভাব**
- ✓ **পাঠ-৮.৫** **বার্লিন প্রাচীরের অবসান ও একত্রিত জার্মানি**

পাঠ-৮.১ সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পটভূমি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বিশ্বের পরাশক্তি বলতে বোঝাত ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া এসব রাষ্ট্রকে। রাশিয়া তখনও ততটা শক্তিশালী ছিল না। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে আন্তর্জাতিক সংঘাত থেকে সযত্নে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত বিধ্বস্ত সামরিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ব ইউরোপীয় ১৫ টি রাষ্ট্র নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের পর থেকেই বিশ্বের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ লক্ষ করা যায়। এই রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং সংশ্লিষ্ট সংঘাত তথা শক্তি প্রদর্শনের মহড়ার একটা পর্যায়ে এসে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হলে উক্ত বিপ্লবের নেতা লেনিন বিশ্বযুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। এজন্য তিনি ত্রি-শক্তি জোটের প্রধান শরিক জার্মানির সাথে সন্ধির মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্র পোল্যান্ডসহ বিভিন্ন বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহ, ফিনল্যান্ড এবং ইউক্রেনের অধিকার জার্মানিকে হস্তান্তর করেছিলেন। ককেশাস অঞ্চলের একটা অংশও তিনি তুরস্কের নিকট ছেড়ে দিয়েছিলেন। কমিউনিজমের লাল ফৌজের বিরুদ্ধে জার সমর্থকগণ দক্ষিণ এশিয়ায় এবং সাইবেরিয়ান অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ সেনাবাহিনী গৃহযুদ্ধ শুরু করলে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী রাশিয়ায় অবতরণ করে 'হোয়াইট আর্মি' কে সহায়তা দান করে। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটলে মিত্রবাহিনী তাদের সমস্ত শক্তি রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে তথা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে।

১৯১৯ সালের মধ্যে রাশিয়া ১৬ শতকের দিকে মস্কো নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। পাশাপাশি তাদের বিশাল অঞ্চল বিদ্রোহী হোয়াইটআর্মির' নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তবে রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিরোধী 'হোয়াইট আর্মি' ভৌগোলিকভাবে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে চলমান সংঘাতে একের পর এক রাশিয়ার অঞ্চলসমূহ নিজেদের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছেই পরাজিত হতে থাকে। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হলে মিত্রপক্ষ রুশ-জার্মান সন্ধিটি বাতিল করেছিল। ফলে রাশিয়া এ অঞ্চলে তার ছেড়ে দেওয়া দেশগুলো যেন মিত্রপক্ষের পতাকাতলে সমবেত না হয় সেজন্য চেষ্টা চালায়। ফলাফল হিসেবে দেখা যায় এ দেশটি বেলারুশ, ইউক্রেন, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া প্রভৃতি দেশ জোরপূর্বক দখল করে নিয়ে সোভিয়েত রিপাবলিক গঠন করে।

অন্যদিকে বাল্টিক অঞ্চলের লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়ায় সোভিয়েত রিপাবলিক গঠন অত সহজ ছিল না। কেননা এ অঞ্চল গুলোতে রুশ বিপ্লব এর পর স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। তাছাড়া বিপ্লবের সময় ফিনল্যান্ডে গৃহযুদ্ধ চলায় স্বাধীন ফিনল্যান্ডকে রাশিয়া স্বীকৃতি দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে পোল্যান্ডের পুনর্জন্ম হয়। তখন এ দেশটি সফলভাবে রাশিয়ার আগ্রাসন মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। ১৯১৯ সালের মার্চে লেনিন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিটি গঠন করে ঘোষণা করেন বিশ্বের যেকোনো স্থানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এর মাধ্যমে সহায়তা দেয়া হবে। তিনি ভেবেছিলেন যে এর মাধ্যমে শিল্পসমৃদ্ধ দেশ গুলোর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গুলোকে বিপ্লবের দিকে ধাবিত করা সহজ হবে। তখন বেশ দ্রুত সে বিপ্লব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মিত্রপক্ষের সরকারগুলোর প্রবল বাধার কারণে লেনিনের স্বপ্নপূরণ বিলম্বিত হয়েছিল। এরপর ১৯২০ সালের দিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা মিত্রপক্ষীয় দেশগুলোর জনসাধারণকে যুদ্ধ বিমুখ করে তুললে রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে তাদের সহায়তা কমে যায়। ১৯২২ সালের মধ্যে সাইবেরিয়া থেকে শেষ মিত্রপক্ষীয় সৈন্যটি অপসারিত হলে পূর্ব ইউরোপের রাশিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়। পাশাপাশি শক্তির মহড়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া বিশ্বের ক্ষমতাধর পরাশক্তির একটিতে পরিণত হয়।

পাঠ- ৮.২ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি

১৯৪৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে শক্তিশালী পিপলস রিপাবলিক গঠিত হয় যারা বিভিন্ন চুক্তির ভিত্তিতে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ রিপাবলিকে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ হলো যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া ও বুলগেরিয়া। ১৯৪৮ সালের মধ্যে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং চেকোস্লোভাকিয়াতে ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। তখন রানী মেলানিন ও জোসেফ স্ট্যালিনের শক্তিশালী শাসনের পর সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজনেভ তার নতুন ডকট্রিন নিয়ে হাজির হন। ব্রেজনেভের এ নীতি ছিল যদি কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে কমিউনিস্ট পার্টি হুমকির মুখে পতিত হয় তবে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি উক্তদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে। ব্রেজনেভ ডকট্রিন এর সফল প্রয়োগ ঘটানো হয় ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায়। সেখানে কম্যুনিস্ট পার্টি হুমকির মুখোমুখি হলে সোভিয়েত পুলিশ বুলগেরিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়ায় অবতরণ করে। তারা সেখানে গিয়ে সংস্কারবাদী আলেকজান্ডার দুপের বিদ্রোহ দমন করেছিল তারা।

ব্রেজনেভ ডকট্রিন চেকোস্লোভাকিয়ায় সফল হওয়ার পর ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানেও প্রয়োগ করা হয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা বেজনেভের অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ নীতিই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের জন্য দায়ী। ১৯৭৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর সামরিক মহড়ার আড়ালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাহিনী কাবুলে প্রবেশ করেছিল। তারা সেখানে একটি কমুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যের উপস্থিতি এক লক্ষ বিশ হাজারে উন্নীত হয়। সোভিয়েত আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগান মুজাহিদিনদের বিপুল অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করে। তারা আফগান বিপ্লবীদের গোপনে সামরিক প্রশিক্ষণও প্রদান করে। এর ফলে সোভিয়েত সৈন্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও কাবুলের কমিউনিস্ট সরকার প্রায় ৮০ শতাংশ প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার স্থানীয় প্রশাসন কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৮৪ সাল নাগাদ আফগান মুক্তিযোদ্ধারা এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে সেখানে ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনীর মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়। তারা এক অর্থে নানা স্থানে রুশদের নাকানি-চুবানি খাইয়ে বসে।

১৯৮৫ সালে মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতায় আসীন হয়ে তার পূর্বসূরি ব্রেজনেভের নীতি পরিত্যাগ করেন। তিনি স্নায়ু যুদ্ধের ভয়াবহতায় ভীত হয়ে এর অবসান কামনা করেন। গর্বাচেভ কর্তৃক ব্রেজনেভ নীতি পরিত্যাগ স্নায়ু যুদ্ধ অবসানের প্রথম ধাপ অতিক্রম করে। তিনি এর অংশ হিসেবে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালের ১৪ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ অনিশ্চয়তায় পাকিস্তান আফগানিস্তানে মধ্যে জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এখানে উল্লেখ করা হয় যে ১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাবর্তন করবে। গর্বাচেভ এই চুক্তি সাক্ষরের সম্মতি দেন এই বলে যে সৈন্য প্রত্যাহার হতে হবে সম্মানজনক পন্থায়। ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের লজ্জাজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য গর্বাচেভ তার পার্টির এক সভায় এ কথাগুলো উল্লেখ করেন।

আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ছবি ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। ১৯৮৯ সালে পোল্যান্ডের নির্বাচনের পর সংঘাত শুরু হলে গর্বাচেভ ঘোষণা করেন সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নয়। ওই একই বছর অক্টোবরের মধ্যে হাঙ্গেরি এবং চেকোস্লোভাকিয়া রাজনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হলে গর্বাচেপ পোল্যান্ডে গৃহীত নীতি অনুসরণ করেন। এর ফলে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে ক্রমশ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালের ৯ ই নভেম্বর পূর্ব জার্মানি বার্লিন প্রাচীর খুলে দেয়। তবে তখন পূর্ব জার্মানি ছিল স্নায়ুযুদ্ধের কেন্দ্র। সেই পূর্ব জার্মানি পশ্চিম জার্মানির সাথে একত্রিত হয়ে ন্যাটো জোটে যোগদান করলে স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম পর্বের দ্বিতীয় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়ে যায়। পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রুশ-মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। এরপর সেখানে সোভিয়েত আধিপত্যের অবসান বাকি থাকলেও সোভিয়েত রিপাবলিকভুক্ত অপরাপর রাষ্ট্রগুলো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের দিকে ইঙ্গিত করে জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন 'সমাজতন্ত্র পোল্যান্ড ১০ বছর, হাঙ্গেরিতে ১০ মাস, পূর্ব জার্মানিতে ১০ সপ্তাহ এবং স্লোভাকিয়ায় ১০ দিনে অদৃশ্য হয়ে যায়'। ১৯৯০ সালে ওয়ারশ প্যাক্ট এর পতন ঘটে। বস্তুত এর ফলেই পাশ্চাত্য শক্তি ইউরোপে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরপর পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের পাশাপাশি পারস্য উপসাগরে আধিপত্য বিস্তারের জন্য সেনা মোতায়েন করতে সমর্থ হয়। তখনকার এ সৈন্যবল দিয়েই ইরাক আক্রমণ সম্ভব হয়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটেছিল বলে মনে করা হয়।

মিখাইল গর্বাচেভ তার পূর্বসূরি ব্রেজনেভের আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগ করে খোলামেলা নীতি ঘোষণা করেন। তার এ নীতি গ্লাসনস্ত নামে পরিচিত। তিনি রাশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন সংস্কার পরিচালনার জন্য পেরেস্ত্রইকা নামে অপর এক কর্মসূচি শুরু করেন। গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রইকা নীতির ফলে রাশিয়ায় অভ্যন্তরীণ সমস্যা দেখা দেয়। খোলামেলা নীতি গ্রহণের ফলে রুশ জনগণ কমিউনিজমের ত্রুটিগুলো এবং এর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা ও মত প্রকাশের সুযোগ পায়। এর ফলে কম্যুনিস্ট পার্টির কঠোর শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে রুশো-এর অন্যান্য রিপাবলিকের জনগণ জেগে উঠে। জনতা অধিক তো স্বাধীনতা প্রত্যাশা করে। এদিকে গর্বাচেভ অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তার পেরেস্ত্রইকা কর্মসূচি গতিশীলভাবে এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হন। ফলে যে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তা সামাল দেয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ইউনিয়নভুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হতে চেষ্টা করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ে। এভাবে ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই ১৫ টি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে। এরপর গর্বাচেভ এবং তার অনুসারীর একটি শিথিল ফেডারেশন এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে এনে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়াস নেন। কিন্তু ১৯৯১ সালে আগস্টের সামরিক ক্যু এর ফলে সে সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। ১৯৯১ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর রাত ৭ টা ৩৫ মিনিটে ক্রেমলিনের ছাদে উড়তে থাকা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতাকা নামিয়ে ফেলে উড়ানো হয় রাশিয়ান ব্যানার। অতঃপর ৩১ শে ডিসেম্বর এক সরকারি ঘোষণার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির কথা জানান হয়েছিল। সেই সাথে দীর্ঘ চার দশকে রুশ-মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধেরও অবসান ঘটে।

পাঠ- ৮.৩ বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির প্রভাব

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে বিশ্ব ব্যবস্থার পুরো চিত্র পাল্টে যায় এবং এ প্রক্রিয়া এখনো ক্রিয়াশীল। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মনে করেন 'সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ছিল বিশ শতকে বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক দুর্যোগ। এর

ফলে রাশিয়ার প্রায় ১ কোটি জনগন বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এর কুফল রাশিয়াকে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত করেছিল। রাশিয়ার জনগণের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ধ্বংস হয়ে যায় এবং পুরনো আদর্শগুলো পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। পতনের ধাক্কায় আবেগের বশে অসংখ্য প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয় কিংবা অসতর্কভাবে পুনর্গঠন করা হয়। এর ফলে সমাজের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। গণদারিদ্র স্বাভাবিক চিত্র হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপক দারিদ্র্যের ফলে নানা স্থানে পতিতাবৃত্তির জন্য অসামাজিক পেশা বৃদ্ধি পায়। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ এ পরিণতির বাইরে বিশ্বব্যাপী তাদের আজ্ঞাবহ দেশগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন আরো ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত প্রদান করেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের প্রভাব শুরু থেকেই দৃশ্যমান হয় নানা দেশে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকাল থেকেই এর প্রভাব বিশ্বকে আন্দোলিত করে যাচ্ছে। পাশাপাশি এর পতনের বহু দশক ধরে তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল অনুভূত হয় বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। বিশ্বের সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনজনিত প্রভাবগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেখানে ক. তাৎক্ষণিক প্রভাব খ. সুদুরপ্রসারী প্রভাব কে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা যায়। তাৎক্ষণিক প্রভাব হিসেব করতে গেলে প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে সাথে বিশ্ব দ্বিমেরু বিশিষ্ট রাজনৈতিক পরাশক্তি বলের বিভক্তি থেকে একক পরাশক্তি বলে রাজনৈতিক বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রবেশ করে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবেলা করার জন্য কোন আদর্শ কোন দেশ বা সংস্থার অস্তিত্ব আর রইল না।

দ্বিতীয়ত, পূর্ব ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। ন্যাটোর প্রভাব অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয় এবং সোভিয়েত প্রভাব বিলুপ্ত হওয়ায় পূর্ব ইউরোপ বাল্টিক অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে মোতায়েনকৃত বিপুল মার্কিন সৈন্য ও সরঞ্জাম সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্যে পুনঃ মোতায়েনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে লাভবান হলেও অর্থনৈতিকভাবে এখনো পর্যন্ত পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি। এ সুবিধাটুকু চীন গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। ফলে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিচ্ছে। সম্প্রতি চীন বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

চতুর্থত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন শক্তিশালী হয়। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সংযুক্ত হওয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোন তৈরি করেছে। বেশ কিছুদিন ধরে তারা অভিন্ন মুদ্রা ইউরো প্রচলন করেছে যা অত্যন্ত শক্তিশালী মুদ্রা হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি আদায় করতে সমর্থ হয়েছিল। অন্যদিকে রাশিয়ার কাঁচামাল, সস্তা শ্রম আর স্যাটেলাইট সহযোগিতার ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অর্থনীতির নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছিল তার উন্মেষপর্বে। তবে সময়ের আবর্তে তারাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে আসা তথা ব্রেক্সিটের মধ্যে দিয়ে একে নানামুখী দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছিল।

পঞ্চমত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে সবচেয়ে সুবিধা হয়েছে চীনের। চীন একদিকে সোভিয়েত মডেলের সমাজতন্ত্রের বদলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। অপরদিকে তার সমাজতান্ত্রিক পার্টি শৃংখলায় সামান্যতম শিথিলতা প্রদর্শন করেনি। তারা চীনে কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে আর্থিক দিক থেকেও লাভবান হয়।

ষষ্ঠত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে মধ্য এশিয়ায় কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। মস্কো অতীতে তার মধ্য এশীয় মুসলিম দেশগুলোর দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে চলত। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে সে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। এর ফলে বিশ্বের নানা স্থানে মুক্তিকামী রাষ্ট্রগুলোতে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে বসে। সিংহভাগ মুসলিম দেশ এই বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়লে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এদের চিহ্নিত করে ইসলামিক টেররিস্ট গ্রুপ হিসেবে।

অন্যদিকে সোভিয়েতক ইউনিয়ন পতনের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের মধ্যে ছিল বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এর মধ্যে প্রথমেই বলা যেতে পারে ইস্টার্ন সোভিয়েত ব্লকে জাতীয়তাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের কথা। এর ফলে জাতিগত সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মুক্তিকামী বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, চেসনিয়া ও জর্জিয়ায় বিপ্লব শুরু হয়। সেখানে জাতিগত সংঘাত এখনো ক্রিয়াশীল।

এর বাইরে প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন আর সমাজতন্ত্রের পতন সমার্থক নয় বলেই অনেকে মনে করেন। কেন না চীনে এখনো সমাজতন্ত্র বিদ্যমান। অদূর ভবিষ্যতে একক পরাশক্তি মার্কিন তাবেদারিতে বিরক্ত হয়ে বিশ্বের দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন ঘটবে বলে অনেকে মনে করছেন।

দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব ঘটায়। এরফলে বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে বৈদেশিক নীতি পরিবর্তিত হয়। এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি, রাজনীতি ও মার্কিন মূল্যবোধ প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে।

তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির স্থলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি দ্রুত অনুসৃত হতে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে সহনীয় করার জন্য ক্রান্তিকাল পার করার প্রয়োজন ছিল। অতি দ্রুত পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিকে ধাবিত হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। এর ফলে বহু বিত্তশালী ব্যবসায়ী রাতারাতি দরিদ্র হয়ে যায়। পাশাপাশি বহু শিল্প-কারখানা বিকল হয়ে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থত, গর্বাচেভ তার পেরেস্ত্রইকা দ্বারা সোভিয়েত সিস্টেমে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে সিস্টেম কে নির্মাণ করা হয়েছিল পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে টিকে থাকার জন্য সে সিস্টেমকে কিভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব পেরেস্ত্রইকা নীতি তা করতে পারেনি। তার আলোকে সোভিয়েত সমাজে পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয় গর্বাচেপের নীতি। পাশাপাশি প্রচলিত ব্যবস্থাটির সঙ্গে সংঘাত দেশটিকে পঙ্গু করে ফেলে। এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি তার মদদপুষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনীতিও বিপর্যস্ত হয়।

পাঠ-৮.৪ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতনের প্রভাব

ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতনের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে প্রায় চার দশক ধরে চলমান স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং একক পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পতনের পর এসব দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিত্যক্ত হয়ে গৃহীত হয় বাজার অর্থনীতি। কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা একটি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে রাতারাতি অন্য একটি ব্যবস্থাপনায় ঢেলে সাজানো মোটেই সহজ ছিল না। এর প্রমাণস্বরূপ ১৯৯০ সালের পর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ব্যাপক অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা। এসব দেশে জীবন যাত্রার মান হঠাৎ করেই সোভিয়েত আমল থেকে নিম্নগামী হয়ে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে দেশগুলোর মুদ্রামান কমে যাওয়ার ফলে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। এসব দেশে সামাজিক স্তরবিন্যাস এ ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বিধ্বস্ত অর্থনীতির চাপে ক্ষেত্রবিশেষে তাদের নৈতিক মূল্যবোধও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বেশিরভাগ সাবেক সোভিয়েত রাষ্ট্র ১৯৯০-৯১ সময়কালে বাজার অর্থনীতিতে স্থানান্তরের ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে। এর ফলে ১৯৯০-৯৫ সময়কালে তাদের জাতীয় উৎপাদন গড়ে ৪০ ভাগ কমে যায়। জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে এই নিম্নগামীতা ১৯৩০ সালের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামন্দার সময় ছিল মাত্র ২৭ ভাগ। সরকারি অর্থের ব্যয় ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক কার্যক্রমে ব্যাপক প্রভাব পড়ে আরেকদফা দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। তবে বাজার সংস্কার কর্মসূচি অব্যাহত থাকায় ধীরে ধীরে দেশগুলোর জাতীয় উৎপাদন দুই দশকের মধ্যে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসে। ধীরে ধীরে এ দেশগুলোর জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেতে থাকলে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দান করে। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমন্বিত বাজার বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ বাজারে পরিণত হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের অভিন্ন অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অভিন্ন মুদ্রা ইউরো চালু করেছিল। সম্প্রতি এই ইউরোর দরপতনের ফলে ইউরোপের অনেক দেশ সংকটের মুখে পড়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতনের ফলে প্রাথমিকভাবে বিশ্বের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন এসেছিল তা থেকে এখনও উত্তরণ ঘটানো যায়নি। স্নায়ু যুদ্ধকালীন সময়ে স্নায়ুযুদ্ধের কেন্দ্র ছিল পূর্ব ইউরোপ। পরবর্তীকালে সেই কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় গিয়ে স্থির হয়েছে। শুধু তাই নয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পতনের পর সাম্রাজ্যবাদের নতুন সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে।

পাঠ-৮.৫ বার্লিন প্রাচীরের অবসান ও একত্রিত জার্মানি

পশ্চিমাবিশ্ব বার্লিন প্রাচীরকে একটি সময় নাম দিয়েছিল ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রতিরক্ষা দুর্গ। পশ্চিম জার্মানি এবং পূর্ব জার্মানিকে বিভক্তকারী এ প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ১৫৫ কিলোমিটার। ১৯৬১ সালে পূর্ব জার্মানির জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক সরকার এ প্রাচীর নির্মাণ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্র শক্তি জার্মানিকে চারটি অংশে বিভক্ত করেছিল। ফ্রান্স, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই চারটি অংশ অধিকার করে নিয়েছিল। এ সময় জার্মানির রাজধানীকেও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়। পূর্ব বার্লিন কে কেন্দ্র করে জার্মানির পূর্বাংশে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। অপরদিকে পশ্চিম জার্মানিতে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ইংল্যান্ড কমিউনিস্ট শাসনের প্রসার রোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা চালায়। বিশেষত, ১৯৪৮ সালে লন্ডন সম্মেলনে একত্রিত হয়ে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে যে সমগ্র জার্মানির জন্য ঐক্যবদ্ধ একটি সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত মিত্রশক্তি অধিকৃত পশ্চিম জার্মানিতে জার্মান গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা হবে। তখন এই জার্মানির রাজধানী করা হয় 'বন' শহরকে।

অন্যদিকে জার্মান গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হওয়ায় পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে রুশ অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে গঠন করা হয় হয়েছিল আরেকটি ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক। শুধু তাই নয় ১৯৪৮ সালে সোভিয়েত সরকার হঠাৎ পশ্চিম বার্লিনের সাথে সংযোগকারী সড়কপথ রেলপথ এবং খালের উপর দিয়ে পশ্চিম জার্মানির অধিবাসীদের যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল। এর ফলে পশ্চিম বার্লিনের ২ মিলিয়ন মানুষের জীবন সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। মিত্রপক্ষ এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য বিমানের মাধ্যমে খাদ্য অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ অব্যাহত রাখে। পাশাপাশি সংকট নিরসনের জন্য নানাভাবে কূটনৈতিক তৎপরতা চলতে থাকে। এ অবস্থায় প্রায় ১১ মাস অবরোধ জারি রাখার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

হঠাৎ করে পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে। বিশেষ করে মিত্র পক্ষের উদ্যোগে পশ্চিম জার্মানিতে বিকাশ লাভ করে মুক্ত গণতন্ত্র। সেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিপরীতে পূর্ব জার্মানিতে ছিল সমাজতন্ত্রের নামে রাশিয়ার স্বার্থ সিদ্ধির উপযোগী কঠোর শৃঙ্খলা। এই পরিস্থিতি আঁচ করে পূর্ব জার্মানি থেকে মানুষ পশ্চিম জার্মানিতে পালিয়ে যেতে শুরু করে। অন্যদিকে পশ্চিম জার্মানি থেকে পূর্ব জার্মানিতে সমাজতন্ত্র বিরোধী প্রচারণা-প্রপাগান্ডা অব্যাহত থাকে। তখন সমাজতন্ত্রের নামে রাশিয়ার সার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার সরকার বার্লিন শহরের মাঝ দিয়ে একটি ইটের দেয়াল নির্মাণ করে। এ দেয়াল নির্মাণের পূর্ব সময়কালে পূর্ব জার্মানি থেকে প্রায় ৩ দশমিক পাঁচ মিলিয়ন মানুষ পশ্চিম জার্মানিতে অভিবাসী হয়েছিল। ১৯৬১ সালে দেয়াল নির্মাণের পর এ ধরনের অভিবাসন কঠোরভাবে বন্ধ করা হয়। ১৯৬১-১৯৮৯ সময়কালে প্রায় ৫০০০ পূর্ব বার্লিনের মানুষ পশ্চিম জার্মানিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে ৬০০ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের এ হত্যাযজ্ঞ থেকে নারী-পুরুষ-শিশু কেউই রেহাই পায়নি।

এই সব দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বার্লিন প্রাচীর হয়ে উঠেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন রক্ষার জন্য নামধারী সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিভেদ চিহ্ন। ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে পোল্যান্ডে রাশিয়ার আধিপত্যবাদের পতন ঘটে। সোভিয়েত গর্বাচেভ সরকার এসব দেশে অস্ত্র প্রয়োগ করার নীতি পরিত্যাগ করলে তার প্রভাব পড়েছিল জার্মানিতেও। ফলে পূর্ব জার্মানির সরকারও রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পশ্চিম জার্মানির সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এর অংশ হিসেবে পূর্ব জার্মান সরকার ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর ঘোষণা করেছিল যে পূর্ব জার্মানির সব নাগরিক নিজের ইচ্ছামত পশ্চিম জার্মানি ও পশ্চিম বার্লিনে প্রবেশ করতে পারবে। এর ফলে দলে দলে লোক বার্লিন প্রাচীর টপকে পশ্চিম জার্মানিতে গমন করে। পশ্চিম জার্মানির জনগণ তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। উৎফুল্ল জনতা পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বার্লিন প্রাচীরের অনেকাংশ নিজেদের উদ্যেগে ভেঙ্গে ফেলেছিল। তারপর নভেম্বর ঘোষণার পর পূর্ব জার্মান সরকার বার্লিন প্রাচীরের মধ্যে আরও দশটি পথ প্রাচীর ভেঙে উন্মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত অনেকগুলো নতুন পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় বার্লিন প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে। এরপর ১৩ ই জুন ১৯৯০ থেকে পূর্ব জার্মান সেনাবাহিনী বার্লিন প্রাচীর ভেঙে ফেলতে শুরু করে। ১৯৯১ সালের নভেম্বরের শেষ নাগাদ এ প্রাচীর ভাঙার কাজ সমাপ্ত হয়। পাশাপাশি উৎসুক জনতা এই প্রাচীরের অনেকাংশ নিজের উদ্যোগে গায়েব করে দিয়েছিল। ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর বার্লিন প্রাচীর উন্মুক্ত করার মধ্য দিয়েই শুরু হয় দুই জার্মানি একত্রীকরণ প্রক্রিয়া। তবে ৩ অক্টোবর জার্মানি একত্রীকরণ দিবস হিসেবে পালিত হয়।

সারাংশ

স্নায়ু যুদ্ধের পরবর্তী ধাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা যেতে পারে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনকে। এরপর বিশ্বের নানা দেশে বিদ্যমান রাজনীতির মেরুকরণে একটি বদল লক্ষ করা যায়। বিশেষত, যে দেশগুলোতে রাশিয়ার প্রভাব ছিল বেশি তারা স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে কেউকেউ পতনের পরেও রাশিয়ার উপর আস্থা রাখতে গিয়ে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। রাশিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেও অনেক দেশ শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বিশেষ করে এসব দেশ সন্ত্রাসবাদের মদদ দিচ্ছে এমন অযুহাতে সেখানে যুদ্ধ শুরু করে আমেরিকা। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলে এক পর্যায়ে এসে ভেঙ্গে দেয়া হয় বার্লিন প্রাচীর। তারপর নতুনভাবে একত্রিত হয় জার্মানি। তাদের পতাকা এবং সংবিধান নতুনভাবে নির্ধারিত হয়।

বর্ণবাদ

ইউনিট ৯

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের নাম বর্ণবাদ। বিশেষ করে বিশ্বের নানা দেশে মানুষের অধিকার হরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এই বর্ণবাদ। তবে হিসেব করে দেখা গেছে আফ্রিকায় ইউরোপের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আফ্রিকার কালো বর্ণের মানুষরা সবচেয়ে বেশি নিগ্রহের শিকার হয়েছিল। এদিক থেকে চিন্তা করে বর্ণবাদের একটি সহজ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে মনে করা হয়, কালো চামড়ার মানুষদের উপর সাদা চামড়ার মানুষগুলো যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে সেটাই বর্ণবাদ। এক্ষেত্রে তারা খেয়াল করে না যে মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের একটি হচ্ছে ত্বক যা যে কারো যে কোনো বর্ণের হতেই পারে। চামড়ায় মেলানিন নামক পদার্থের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি কিংবা পরিমাণগত ভিন্নতায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেখানে মানুষ হিসেবে কারও কোনো হাত থাকে না। ফলে গাত্রবর্ণের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণিকরণ একটি বিভ্রান্তিকর ধারণা। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলোর উপর ইউরোপ থেকে যাওয়া সাদা চামড়ার মানুষের বৈষম্যের প্রতিবাদে প্রথম সোচ্চার হতে দেখা যায় সেখানকার মানুষকে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের মানুষও বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। এক্ষেত্রে মার্টিন লুথার কিং, ফ্রেডারিখ উইলিয়াম দ্য ক্লার্ক, মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা কিংবা ডেসমন্ড টুটুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে অনেকে অন্যায় আচরণ শুরু করেছিলেন যাদের মধ্যে জিম্বাবুয়ের রবার্ট মুগাবে কিংবা উগান্ডার ইদি আমিনের নাম বলা যেতে পারে।

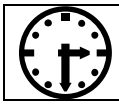	**এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন**

পাঠ-৯.১ বর্ণবাদের ধারণা

পাঠ-৯.২ বর্ণবাদের পটভূমি

পাঠ-৯.৩ বর্ণবাদের ঐতিহাসিক আবর্তন

পাঠ-৯.৪ বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব

পাঠ-৯.১ বর্ণবাদের ধারণা

কোনো নরগোষ্ঠীর প্রতি ভিন্ন গাত্রবর্ণের অন্য নরগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর গাত্রবর্ণের বিভিন্নতাজনিত যে বৈষম্যমূলক আচরণ তাকে সাধারণ অর্থে বর্ণবাদ বলা হয়ে থাকে। বর্ধিত পরিসরে বলতে গেলে গাত্রবর্ণের ভিন্নতার কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে কোনো জাতিকে বিপন্ন করা হলে তা বর্ণবাদের আওতায় পড়ে। ইংরেজি রেস থেকে রেসিজম তথা বর্ণবাদ কথাটির উদ্ভব। এক্ষেত্রে মানুষের গাত্রবর্ণ, সামাজিক শ্রেণি, বংশ পরিচয় ও জন্মস্থানের উপর ভিত্তি করে মানুষকে বিভক্ত করে কোনো জাতি বা গোষ্ঠী তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করলে তাকে বর্ণবাদ বলে। এক্ষেত্রে মানুষকে শ্রেণিকরণের মাধ্যমে আলাদা করে সুযোগ সুবিধা বণ্টনের তারতম্য করার চেষ্টা চলে। ফলে নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠী তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে। অন্যদিকে অনেক জাতিগোষ্ঠী তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

অ্যাপারথেইড (Apantheid) তথা আলাদাকরণের যে নীতি, তার উপর ভিত্তি করে নিগ্রহের এক নতুন ধারা জন্ম নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে সংখ্যলঘু শেতাঙ্গরা দেশ শাসন করতে গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ কালো চামড়ার মানুষকে নিগ্রহের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার যে নীতি গ্রহণ করে তা ছিল বিপত্তিকর। এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্ণবাদে বিশ্বাসী নৃ-বিজ্ঞানীদের পরামর্শ ও ধারণা থেকে। তারা বিশ্বের মানুষকে বিভিন্ন নরগোষ্ঠী যেমন ককেশয়েড, অস্ট্রালয়েড, মঙ্গোলয়েড, নিগ্রয়েড প্রভৃতি বর্ণ তথা রেসে ইড (race) বিভক্ত করেছিলেন। তাদের ধারণায় একটি বিশেষ জৈব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষ অপেক্ষাকৃত কম বা বেশি কর্মক্ষম কিংবা অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছিল। তারা প্রচারের চেষ্টা করেন যে এই জৈবিক বৈশিষ্ট্যের বলেই মানুষ তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানচর্চা কিংবা সংশ্লিষ্ট নানা ক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে আরোহন করেছিল। অন্যদিকে পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষ তাদের গাত্রবর্ণ তথা জৈবিক কারণজাত বর্ণভেদের কারণেই অকর্মা, অপদার্থ, অলস, অসভ্য, অমার্জিত এবং দাসবৃত্তির যোগ্য বলে মনে করতেন তারা।

নরগোষ্ঠীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে এমন ধারণার উপর ভিত্তি করে নরগোষ্ঠীর বিশুদ্ধতা রক্ষার একটা প্রচেষ্টা চলে। তখন মনে করা হত নিম্নবর্ণের মানুষের দূষিত রক্তের সঙ্গে উন্নত বর্গের মানুষের রক্তের মিশ্রণ সম্ভব নয়। তাদের এই অন্ধ বিশ্বাসের বলি হতে হয়েছিল অনেক দেশের মানুষকে। তারা শুধুমাত্র গাত্রবর্ণের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন মানুষকে তার দেশছাড়া করেছিল। যেমন সাদাদের দেশ থেকে কালোদের বের করে দেয়া হয়েছিল শুধুমাত্র তাদের রক্ত বিশুদ্ধ রাখার নষ্ট অভিপ্রায়েই। একইভাবে অনেক দেশে বসবাসরত মানুষকে গণহারে হত্যা করা হয়েছে। সম্প্রতি মায়ানমারে আদিবাসী রোহিঙ্গাদের উপর চলমান গণহত্যা এই ধরণের বর্ণবাদ প্রতিষ্ঠার একটি ধিকৃত অপপ্রয়াস। শুধুমাত্র গাত্রবর্ণের ভিন্নতার পাশাপাশি ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে আদিবাসী রোহিঙ্গাদের হত্যা করছে মায়ানমারের সামরিক জান্তা। তারা রোহিঙ্গাদের জন্মভূমি থেকে তাদের তাড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিচারে সবাইকে হত্যা করেছে। অন্যদিকে নিজ থেকে বিতাড়িত এসব মানুষ প্রাণরক্ষার দায় নিয়ে এসে অবস্থান করছে বাংলাদেশে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্ণবাদের যে বিস্তার তার পেছনে মূল প্রণোদনা সৃষ্টি করেছিলেন বর্ণবাদী নৃ-বিজ্ঞানীরা। তাদের পাশাপাশি ঐ দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক এবং ইতিহাসবিদরা ইন্ধন যুগিয়েছেন। সেখানে বর্ণবাদী নৃ-বিজ্ঞানীরা একবার বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে একটি বর্ণনা প্রচারের চেষ্টা চালিয়েছেন। পরে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক ও ইতিহাসবিদরা তাদের অতীত সম্পর্কে পক্ষে বিপক্ষে নানা ধরণের মন্তব্য দাঁড় করানোর চেষ্টা চালিয়েছেন। বিশেষ করে একটি দেশের প্রভাবশালী নৃ-বিজ্ঞানীরা যখন কোনো জাতিগোষ্ঠীকে ছোট প্রমাণের চেষ্টা করেছেন সেখানে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে দেখা গেছে ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের। তারা এই জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস নিয়ে নানা নেতিবাচক মন্তব্য তৈরি করেছেন। পাশাপাশি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার নামে ঐ নির্দিষ্ট জাতির অতীত সম্পর্কিত নানা নেতিবাচক বস্তুগত প্রমাণ দাঁড় করানোর চেষ্টাও চলেছে।

এক পর্যায়ে এসে দেখা গেছে নৃ-বিজ্ঞানী, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদ মিলে অতীতের উপর ভিত্তি করে একটি জাতির ভবিষ্যত নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টা যখন উৎকৃষ্ট কিংবা নিকৃষ্ট প্রমাণের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন উক্ত জাতির বিশ্বাস, আদর্শ ও অধিকারের বিষয়টি হয়ে গেছে প্রশ্নবিদ্ধ। কবির কবিতার বিখ্যাত চরণ 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভেতরে সবার সমান রাঙা'। যে ধারণা মানুষের ভেদাভেদ দূর করে সব মানুষকে সমান বানিয়েছে তা আদতে কতটা বিদ্যমান সেটা প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে বার বার।

বর্ণবাদ শব্দটি দ্বারা মূলত শরীরের রং দ্বারা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে এমন নয়। চামড়ার বর্ণবৈচিত্র্য থেকে বর্ণবাদ সবার অস্তিমজ্জায় গেঁথে আছে। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের মানুষ বর্ণবাদের বিষয়টি পুরোপুরি দূর করতে চায় না। সাদা চামড়া কালো চামড়া নিয়ে সারা পৃথিবীতে এক অদ্ভুত বৈষম্য চালু ছিল একসময়। কালো চামড়ার লোকদের দাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রভু আর ভৃত্যের সম্পর্ক ছিল কেবল গায়ের রংয়ের ওপর ভিত্তি করে। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে উপন্যাস, সিনেমা। যেই মাদিবা তথা নেলসন ম্যান্ডেলা নামটি আজ সবার কাছে পরিচিত। তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন এই বর্ণবাদো বিরুদ্ধে। তার জন্য তাকে কম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। অদ্ভুত সব বৈষম্যে ভরা এই সমাজটা। এখানে চামড়ার রঙে বৈষম্য, জাতিতে জাতিতে বৈষম্য, গোত্রে গোত্রে বৈষম্য, আকারে বৈষম্য, আর্থিক ক্ষমতায় বৈষম্য এরকম আরও বহু বৈষম্য প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠতে দেখা গেছে।

তবে উইকিপিডিয়া বর্ণবাদের যে সংজ্ঞা দিয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, 'বর্ণবাদ সেই দৃষ্টিভঙ্গি, চর্চা এবং ক্রিয়াকলাপ যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে মানুষ বৈজ্ঞানিকভাবেই অনেকগুলো গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং একইসাথে বিশ্বাস করা হয় কোন কোন গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর চেয়ে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য উঁচু অথবা নিচু; কিংবা তার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারী অথবা বেশি যোগ্য কিংবা অযোগ্য'। তবে বর্ণবাদের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করাটা কঠিন। কারণ গবেষকদের মধ্যে গোষ্ঠী ধারনাটি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। বর্ণবাদ কখনো গায়ের রং, কখোনো আঞ্চলিকতা আবার কখোনো গোত্র নিয়ে বোঝানো হতে দেখা গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে কাগজে কলমে কিংবা বক্তৃতার কথামালায় দেখা যায় মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। সবাই মুখে মুখে বর্ণ বৈষম্য নেই বলে নিজেদের আধুনিক দাবি করে। তারপরেও প্রায় প্রতিটি দেশের সমাজে এত ভেদাভেদ আর গোত্রে গোত্রে যে হানাহানি তার মূলে রয়েছে বর্ণবাদ। সংবিধান কিংবা সমাজের মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণবাদ নেই, গায়ের রং দিয়ে কাউকে ছোট বা বড় করার সুযোগ নেই। তবুও বর্ণবাদের দীর্ঘ কালো ছায়া আরও দীর্ঘতর হয়ে আছে বিভিন্ন পরিবারের চিন্তায়, সমাজের সিদ্ধান্ত কিংবা টিভির বিজ্ঞাপনে।

ভদ্রলোকের খেলা বলে পরিচিত ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার হাশিম আমলা বারংবার হিংস্র কথার মুখে পড়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারদের অনেকেই কটুক্তি করছে কালোবর্ণের কারণে। ইংল্যান্ডে খেলতে গিয়ে বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হয়েছেন আমাদের দেশের ক্রিকেটাররাও। ভারতের বিখ্যাত স্পিনার হরভজন সিং একবার শাস্তির মুখে পড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এক খেলোয়াড় অ্যান্ড্রু সাইমন্ডসকে বানর বলার কারণে। পাশাপাশি টিভিতে সারাদিন রং ফর্সা করার ক্রিমের বিজ্ঞাপন প্রচার হতে দেখলে বোঝা যায় বর্ণবাদ কিভাবে টিকে আছে বিশ্বের নানা দেশে। প্রতিটি দেশে সাদা কালো কোন বিভেদ নই থাকলে ত্বকের রং ফর্সা হওয়ার ক্রিমের এত মূল্য থাকত না। মুখে যে যাই বলুক মেয়েকে ফর্সা বানানোর প্রাণান্ত চেষ্টায় থাকেন প্রত্যেক মা বাবা। অনেক ক্ষেত্রে চিন্তাগত দুর্বলতায় মেয়েকে শিক্ষিত করে বড় করে তোলার চেয়ে ফর্সা করাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের কাছে।

পাঠ-৯.২ বর্ণবাদের পটভূমি

ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আফ্রিকায় বর্ণবাদ বিকাশ লাভ করেছিল। অন্যদিকে ১৭ শতকের দিকে দাস প্রথা বিস্তারের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিস্তার লাভ করেছিল এই বর্ণবাদ। সেখানেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে আফ্রিকা থেকে ধরে নিয়ে আসা মানুষগুলোকে দাস হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছিল। তারা ইউরোপের দাস ব্যবসায়ীদের কাছে ধরা পড়েছিল। তারপর সেই মানুষগুলোকে পশুর মত জাহাজে বোঝাই করে নিয়ে আসা হতে থাকে ইউরোপের উপনিবেশ রয়েছে এমন নানা দেশে। সেখানে তাদের বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দিতে বাধ্য করা হত। একটু খেয়াল করতে দেখা যায় এই আফ্রিকায় বিশ্বের বেশিরভাগ কালো মানুষের বসবাস। আফ্রিকা আবিষ্কারের পরবর্তী এক দশকে তারা সেখানে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। তারা নানাভাবে আফ্রিকার মাত্র ১০ শতাংশ এলাকার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিল। তবে তারা সুযোগ বুঝে আফ্রিকার নানা স্থানে তাদের উপনিবেশ বিস্তার করতে থাকে। তারা সেখান থেকে সম্পদ পাচারের পাশাপাশি কালো বর্ণের মানুষদের ধরে নিয়ে বিশ্বের নানা দেশে বিক্রি করে দিতে থাকে। ১৭ শতকের দিকে সেখানে তাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর সম্পদ পাচারের পাশাপাশি অগণিত স্থানীয় অধিবাসীকে অপহরণের পর দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে দেখা যায়।

উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে শ্বেতাঙ্গদের আনাগোণা লক্ষ করা যায় দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে। তারা স্থানীয় বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় আস্তে আস্তে আফ্রিকার উপর দখল নিরঙ্কুশ করতে থাকে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল থাকায় ১৯ শতকের একটা পর্যায়ে এসে আফ্রিকার প্রায় ৯০ শতাংশ ভূমি উপনিবেশের গ্রাসে চলে যায়। প্রথম দিকে পর্তুগিজরা আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তারপর একে একে ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজরা সেখানে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করে। এরা সেখানে প্রথম দিকে নিজেদের খামার গড়ে তোলে। তারপর দাস ব্যবসা শুরু করেছিল। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে কালো বর্ণের মানুষদের ধরে নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রি করত তারা। তবে এতে করে এই অঞ্চলে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা লুটেরা এবং শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষে আফ্রিকায় তাদের বসতি টিকিয়ে রাখাই শ্বেতাঙ্গদের জন্য কঠিন হয়ে যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের টিকে থাকার জন্য সেখানে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিকল্প ছিল না। তারা এই উদ্দেশ্যে দুটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে। প্রথম দিকে তারা ইউরোপের নানা অঞ্চলের কারাগারে বন্দী দাগী আসামীদের আফ্রিকা গমনের শর্তে মুক্তি দিতে শুরু করে। এই সব আসামীরা কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর আফ্রিকায় গিয়ে সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েদের বিয়ে করে স্থানীভাবে বসবাস করতে থাকে। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ইউরোপ থেকে আফ্রিকায় নিয়ে আসা হয়। তারা সেখানে গিয়ে স্থানীয় ধনী কৃষ্ণাঙ্গদের বিয়ে করে শ্বেতাঙ্গদের বংশ বিস্তার করে। এভাবে এক পর্যায়ে দক্ষিণ আফ্রিকার অনেকগুলো এলাকায় কৃষ্ণাঙ্গদের পাশাপাশি শ্বেতাঙ্গদের জনসংখ্যাও বেড়ে যায় বহুলাংশে।

আফ্রিকার মত এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় আমেরিকাতেও। সেখানে ইউরোপের নানা স্থান থেকে গিয়ে বসতি স্থাপন করে শ্বেতাঙ্গরা। তারা সেখানকার জনসংখ্যা হিসেবে সংখ্যালঘু হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তাদের এই কাজ সহজ করে দেয় বর্ণবাদী নৃ-বিজ্ঞানীরা। তারা নরগোষ্ঠীর ধারণাকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর আরোপের মধ্য দিয়ে শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে। পাশাপাশি আরও নানাদিক থেকে তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের পাশাপাশি কৃষ্ণাঙ্গদের হেয় করতে থাকে। বিশেষ করে আফ্রিকা থেকে ধরে আনা কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের উপর শ্বেতাঙ্গরা তাদের আধিপত্য নিশ্চিত করে। তারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিটি দিক থেকে নিগ্রহের শিকার হয়।

১৯১০ সালের ৩১ মে আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শক্তি নতুনভাবে আধিপত্য বিস্তার করে। তারা সেখানে তাদের সুবিধামত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে এদিন প্রথমবারের মত সফলতার মুখ দেখে। তারা এদিন কেপ কলোলি, নাটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এই চারটি ব্রিটিশ উপনিবেশ মিলিয়ে প্রতিষ্ঠা করে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন। এখানে প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে মনোনীত করা হয় ভাইকাউন্ট গ্লাডস্টেন। এই অঞ্চলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করা হয় জেনারেল বোথাকে। এরপর ১৯৬০ সালে তারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তবে ১৯১০-৬০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীর ইউনিয়নে থাকাকালে সেখানে বর্ণবাদ চরম রূপ লাভ করেছিল। এই জঘন্য বর্ণবাদ সেখানে গত শতকের নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন শুরু থেকেই কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের জন্য দুটি আলাদা নীতি অনুসরণ করে আসছিল। তারা এক্ষেত্রে পৃথকীকরণ ও সমন্বয়করণ নীতির প্রচলন ঘটিয়েছিল। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সেখানে বর্ণবাদের প্রভাব অতটা প্রকট আকার ধারণ করতে পারেনি। তারা সেখানে নানা রকম সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার

চেষ্টা করেছিল। সেখানকার একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী দল তথা আফ্রিকান ন্যাশনালিস্ট পার্টি ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করেছিল। বিশেষ করে এই দলটি ক্ষমতায় এসে বর্ণবাদকে সরকারি নীতিতে রূপ দেয়। তারা বর্ণবাদের সমর্থনে সাতটি আইন প্রণয়ন করেছিল। এই আইন সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার হরণের হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়।

আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী সরকার ক্ষমতায় থাকাকালিন যে আইন পাস করেছিল সেখানে জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এই নিবন্ধনের ক্ষেত্রে গাত্রবর্ণ ও গোত্র অনুযায়ী নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। বিশেষত নবজাতকের বর্ণ এবং গোত্র অনুযায়ী নিবন্ধের এই ধারণায় তারা জন্মের পর থেকে নিগ্রহের শিকার হতে থাকে। এরপর ১৯৫০ সালের দিকে পাস করা হয়েছিল আবাসভূমি পৃথকীকরণ আইন। এই বিশেষ আইনের মাধ্যমে সেখানে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের আবাসভূমি পৃথক করা হয়েছিল। মোট জনসংখ্যার ৫ ভাগের বিপরীতে শ্বেতাঙ্গ ছিল ৪ ভাগ। তার পরেও সেখানকার ভূমি বণ্টনের বৈষম্যে তারা মাত্র ১৩ শতাংশ অনুর্বর ভূমির মালিকানা লাভ করেছিল। একইসঙ্গে প্রণয়ন করা হয়েছিল বিশেষ ধরণের পাশ আইন। এ আইনের আওতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বেশিরভাগ কৃষ্ণাঙ্গ নর-নারীকে পুলিশের সামনে বিশেষ পাশ দেখিয়ে তবেই চলাচলের অধিকার দেয়া হত। অন্যদিকে বিশেষ নাগরিক আইনের মধ্যে দিয়ে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তার বাইরে পৃথক সুবিধা আইনের মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বৈষম্যমূলক নানা সুবিধার প্রবর্তন করা হয় যা বঞ্চিত করতে থাকে কৃষ্ণাঙ্গদের। অন্যদিকে অনৈতিক আইনের মাধ্যমে সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিয়ে কিংবা সব ধরণের যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়।

তবে একসময় বর্ণবৈষম্যে ভরা দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের যে আধিপত্য ছিল এখন কালোদের দাপটে তারাই হয়ে পড়েছে কোণঠাসা। এক সময় কালোদের উপর ধারাবাহিক নির্যাতন করে আসা আফ্রিকা সমাজে সাদাদের কিছু মানুষ টের পাচ্ছে বঞ্চনা কী, সহিংসতা কতটা ভয়াবহ। তাদের অনেকের ভবিষ্যৎও এখন হুমকির মুখে। বিবিসিতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে কালোদের দ্বারা সাদাদের নির্যাতিত হওয়ার চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। সেখানে দেখানো হয়েছিল কালোদের কাছে কিভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে এক সময়ে ক্ষমতায় থাকা প্রতাপশালী সাদারা। রাজনীতি ও গণমাধ্যমে তুলনামূলকভাবে তাদের প্রভাব বেশি থাকলেও ঠিক অপর পিঠেই রয়েছে শ্বেতাঙ্গদের দারিদ্র্যের চিত্র। নানা দিক থেকে স্পষ্ট হয়েছে কিভাবে তারা অবস্থানের দিক দিয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যিই শ্বেতাঙ্গদের কোনো ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সুযোগ আছে কি না।

তবে সাদাদের মধ্যে যারা ভালো অবস্থানে আছে কিংবা যারা দেশটির পরিস্থিতির সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু আফ্রিকান ভাষাভাষী সাদাবর্ণের শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা মোটেও ভালো নয়। তাদের এ দুর্দশার চিত্র কোনো পত্রপত্রিকায় সেভাবে দেখা যায় না কিংবা টেলিভিশনেও প্রচার হয় না। সবাই দক্ষিণ আফ্রিকার অতীত ইতিহাস থেকেই সাদাদের এ নিগ্রহের সূচনা বলে মনে করছে। এক্ষেত্রে সবাই দায়ী করছে সাদাদের অতিরিক্ত আধিপত্যবাদী মনোভাবকে। তাই ২০ বছর আগে দেশটিতে শ্বেতাঙ্গ কৃষকের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। এখন তা অর্ধেকে নেমে এসেছে। বস্তুত অতীতে বর্ণবাদ ব্যবস্থায় শ্বেতাঙ্গরা যেভাবে ফায়দা লুটেছে আজ ক্ষমতাসীন কালোদের দাপটে তাদের ঠিক সেই অবস্থায় পড়তে হয়েছে।

তবে শুধু এই বর্ণবাদ নয় অন্য নানা ক্ষেত্রেও আফ্রিকার সংকটটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আফ্রিকা এখন প্রধান যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি, তার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রগুলোর ব্যর্থ হয়ে যাওয়া, গণতন্ত্র হাতবদলের জটিল প্রক্রিয়া কিংবা জনসংখ্যার সমস্যার পাশাপাশি বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগের প্রকোপ। এসব দেশের নারীরা একেকজন এখনো সাত-আটটি করে সন্তান ধারণ করেন। তাই এসব দেশের জন্য কোটি কোটি ইউরো খরচ করেও স্থিতিশীলতা আনা সম্ভব নয় বলে দাবি করেছেন অনেক পশ্চিমা গবেষক। তবে এ দেশগুলো ধীরে ধীরে এ অবস্থার দিকে পতিত হয়েছে বর্ণবাদের কারণেই। আফ্রিকার দেশগুলো নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন এমন একজন যাকে ইউরোপের নব্য উদারতাবাদের ধারক মনে করা হয়। তিনি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাখোঁ। জার্মানির হামবুর্গে অনুষ্ঠিত জি-২০ সামিটে আফ্রিকার দেশগুলোতে ফ্রান্সের সহায়তা তহবিল না থাকার সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেছিলেন। স্পষ্টতই বর্ণবাদের ঔপনিবেশিক যে মানসিকতা, তারই এক প্রতিফলন ম্যাখোঁর এই বক্তব্য। এক সময়ের উপনিবেশ থেকে শোষণকারী ফ্রান্সের আধুনিক যুগে উত্তোরণের পর উদারবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত ম্যাখোঁর এই বক্তব্যে এক অর্থে অতীতেরই প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে। তার এই বক্তব্য থেকে অনেকে মনে করেন এখনকার বিশ্বেও বর্ণবাদ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

পাঠ-৯.৩ বর্ণবাদের ঐতিহাসিক আবর্তন

দাস ব্যবসা থেকে শুরু করে শ্রমের দিক থেকে নিগ্রহ কিংবা আরও নানা কারণে ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধ বিগ্রহের জন্ম দিয়েছে বর্ণবাদ। ঔপনিবেশিক যুগের বর্ণবাদ ছিল ইউরোপ থেকে বিশ্বের নানা দেশ দখলকারীদের হাতিয়ার। তারা তাদের দখলদারিত্ব বৈধ প্রমাণের পাশাপাশি সেই হাতিয়ারের ব্যবহারকে সাধারণের চোখে সিদ্ধ করেছে নানাভাবে। বিশেষ করে এর জন্য নানাবিধ যুগোপযোগী ব্যাখ্যাও তারা প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিল তারা। এক্ষেত্রে বর্ণবাদের ব্যাখ্যা হিসেবে কখনও দ্বারা ব্যবহার করেছে ধর্মকে। পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে কাজে লাগিয়েছে বিজ্ঞানকেও। আব্রাহাম লিংকনকে সবাই গণতন্ত্রের জনক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা অবলুপ্তির নায়ক হিসেবেই জানেন। তবে তিনিও যখন বর্ণবাদের পক্ষে কাজ করেছেন বলে জানা গেছে তখন অনেকে বিস্মিত হন। তাই আমেরিকার দাসপ্রথা বাতিলের পেছনে লিংকনের যে সিদ্ধান্ত তাকে সবাই মানবিক থেকে রাজনৈতিক দিকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে তুলে ধরেছেন। তবে কেউ কেউ দাবি করেছেন লিংকন বর্ণবাদী ছিলেন না। তিনি যে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতেন তার আলোকেই তাকে বিচার করতে হবে, বর্তমানের প্রেক্ষিতে বিচার করলে তার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবতা বোঝা সম্ভব হবে না। তখনকার উগ্র বর্ণবাদী সমাজের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে গেলে লিংকনের সিদ্ধান্তকেই যথার্থ বলে মনে হতে পারে। ফলে তিনি যে বর্ণবাদ জৈব ভিত্তি থেকে মুক্তি দিয়ে একটি মুক্ত চিন্তার পথ করে দিয়েছেন সেটা বোঝা সম্ভব হবে।

এদিক থেকে ধরতে গেলে ভারতবর্ষের বর্ণবাদের ইতিহাসও অনেকদিনের প্রাচীন। ভারতবর্ষে যেভাবে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়- বৈশ্য-শুদ্র বিভাজনের মাধ্যমে বৈদিক যুগ থেকে বর্ণবাদ চলে এসেছে তার থেকে মুক্তি মেলেনি এই একুশ শতকে এসেও। তবে ভারতবর্ষে বর্ণবাদের মুখ্য কারণ ছিল সামাজিক মর্যাদা চামড়ার বর্ণ এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। সেদিক থেকে চিন্তা করলে গাত্রবর্ণ দিয়ে বর্ণবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায়। উনিশ শতকের শেষার্ধে এই বর্ণবাদকে দেয়া হয় বৈজ্ঞানিক রূপ। বিবর্তনবাদের জনক খ্যাত চার্লস ডারউইনের চাচাত ভাই বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত ফ্রান্সিস গল্টন এ ধারণাকে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি মনে করেছিলেন মানুষের ক্রমাবনতি ঘটবে। তিনি ইউজেনিক্স নামে একটি নতুন মত প্রচার করতে শুরু করেছিলেন যার মূলকথা হচ্ছে- 'শুধু জৈব বৈশিষ্ট্য নয়, মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক গুণাবলিও বংশগতীয়, সুতরাং তা গোত্রে গোত্রে বা বর্ণে বর্ণে আলাদা। সকল বর্ণের মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সমান নয়। এজন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত যৌন নির্বাচন। অর্থাৎ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত বাবা-মা নির্বাচন করা হলে তাদের সন্তান অপেক্ষাকৃত বেশি বুদ্ধিমান হবে এবং এভাবেই মানুষের ক্রমাবনতি ঠেকানো যাবে'। তার হিসেবে যথারীতি উন্নত বর্ণের মানুষের সাথে কোনভাবেই অনুন্নত বর্ণের মানুষের প্রজনন ঘটতে দেয়া যাবে না। আর এক্ষেত্রে তার হিসেবে সাদারা ছিল উন্নত আর কালোদের ধরা হত অনুন্নত।

গ্যাল্টনের বিভিন্ন ধরনের লেখালেখি নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ১৮৬৯ সালে তার কুখ্যাত 'হেরেডিটারি জিনিয়াস' বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তিনি বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী মানুষের সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী বিভিন্ন গোত্রকে বিভক্ত করার একটা চেষ্টাও চালিয়েছেন তিনি। অদ্ভুতভাবে তার গোত্রীয় যোগ্যতার স্কেলটি গিয়ে শেষ হয়েছিল একটি পশুতে। তার হিসেবে এই ক্রমটি ছিল প্রাচীন গ্রিক-ইংরেজ- এশীয়-আফ্রিকান-অস্ট্রেলীয় আদিবাসী-কুকুর পর্যন্ত। এক্ষেত্রে তার হিসেবে বর্ণপ্রথার শেষ স্তর কুকুর। অনেকে ধারণা করেন গল্টন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই এমনটি ভেবেছিলেন। তিনি মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পেছনে প্রাকৃতিক নিয়মের বিশাল প্রভাব রয়েছে এটা জেনে দাবি করেছিলেন নিজেদের ইচ্ছামত ভবিষ্যৎ সাজানোর। এই ভবিষ্যত সাজানোর কাজে বংশগতির ধারার প্রত্যক্ষ প্রভাব আমলে নিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক ধারণার জন্ম দিয়ে তার অপব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি। তার এই বিজ্ঞানবেশী বর্ণবাদ সে সময় অনেক ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মানিতে এই ভয়ংকর ব্যাপারই তার চূড়ান্ত ধাপে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

জার্মান সেনানায়ক হিটলার গ্যাল্টনের সেই ইউজেনিক্স মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন বংশগতীয়ভাবে যারা বিশুদ্ধ জার্মানদের সমকক্ষ হতে পারবে না তাদের জার্মান ভূখণ্ড থেকে নির্মূল করে দিতে হবে। তবে এক পর্যায়ে এসে বর্ণবাদের এই ধারা থেকে পৃথিবীর মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। সবাই বর্ণ বা গোত্রের বিভাজনকে জীববিজ্ঞানে গুরুত্ব দেয়া বন্ধ করে। এক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল মানুষকে একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। মনুষ্য প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম হোমো স্যাপিয়েন্স দিয়েছিলেন শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার জনক কারোলাস লিনিয়াস। পরে হোমো স্যাপিয়েন্সের আক্ষরিক অর্থ করা হয় বিজ্ঞ মানুষ। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক ইউভাল নোয়াহ হারারি মানুষকে নিয়ে লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত বই 'স্যাপিয়েন্স-এ ব্রিফ হিস্টরি অব হিউম্যানকইন্ড'। তিনি অন্য প্রাণি থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে বিশেষ বুদ্ধিমত্তা নিয়ে মানুষের বেড়ে ওঠার নানা দিক বর্ণনা করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে।

পাঠ-৯.৪ বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব

বিশ শতকের দিকে এক্স বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপকতা পায়। তখন বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে জোরদার হয়ে ওঠে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন নেতা। তাঁরা জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে। এক্ষেত্রে ভারতের মহাত্মা গান্ধী, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, ডেসমন্ড টুটু, আমেরিকার মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র প্রমুখের নাম বলা যেতে পারে। এর মধ্যে কিংবদন্তী রাষ্ট্রনায়ক নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, যিনি বর্ণবাদের অবসান ঘটিয়ে বহু বর্ণভিত্তিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যাক্তিত্ত্ব, প্রখর রসবোধ এবং প্রতিপক্ষের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়ার মত বিশাল মন বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনকে পথ দেখায়। তিনি তাঁর এসব গুনের জোরেই বিশ্বের জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় নেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন । বর্ণবাদের অবসানের পর ১৯৯৪ সালের ১০ই মে নতুন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। এর মাত্র এক দশক আগেও সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকায় এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ছিল এক অকল্পনীয় ঘটনা। এই পরিবর্তনের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। শুধু দক্ষিণ আফ্রিকায় নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও তিনি ভূমিকা রাখেন। বিশ্বের নানা দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন সফল করার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৩ সালে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ।

১৯১৮ সালে নেলসন ম্যান্ডেলার জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন ইস্টার্ন কেপ প্রদেশের থেম্বো রাজকীয় পরিবারের কাউন্সিলর। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যান্ডেলা তার গোত্রের দেয়া 'মাদিবা' নামে বিশ্বব্যাপী বেশি পরিচিত। এই সফল আন্দোলনের নেতা ও কিংবদন্তীর রাষ্ট্রনায়কের শৈশব কেটেছিল তার নানাবাড়িতে। তিনিই তাঁর পরিবাবের প্রথম সদস্য যিনি কোনা স্কুলে গিয়ে পড়ালেখার সুযোগ পেয়েছেন। স্কুলে পড়ার সময় একজন শিক্ষিকা ইংরেজিতে তাঁর নাম রাখেন 'নেলসন'। স্কুল পাস করার পর ম্যান্ডেলা ফোর্ট হেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাচেলর অফ আর্টস কোর্সে ভর্তি হন। এখানে অধ্যয়নরত অবস্থায় অলিভার টাম্বোর সাথে তার পরিচয় হয়। এই টাম্বো আর ম্যান্ডেলা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ম্যান্ডেলার আরেক বন্ধু ছিলেন ট্রান্সকেইয়ের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কাইজার মাটানজিমা। এই বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদেই পরবর্তীকালে ম্যান্ডেলা বান্টুস্থানের রাজনীতি ও নীতিনির্ধারণে জড়িত হয়েছিলেন। তবে একটা পর্যায়ে এসব নীতিমালার কারণেই ম্যান্ডেলা ও মাটানজিমার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল।

ম্যান্ডেলা তাঁর শিক্ষাজীবনের এক পর্যায়ে এসে ফোর্ট হেয়ার ছাড়েন। এরপর অল্পদিন পরে জানতে পারেন, জোঙ্গিন্তাবা তাঁর সন্তান জাস্টিস এবং ম্যান্ডেলার বিয়ে ঠিক করার ঘোষণা দিয়েছেন। ম্যান্ডেলা ও জাস্টিস এভাবে বিয়ে করতে রাজি ছিলেননা। তাই তাঁরা দুজনে জোহানেসবার্গে চলে যান। সেখানে যাওয়ার পর ম্যান্ডেলা শুরুতে একটি খনিতে প্রহরী হিসেবে কাজ নেন। তবে অল্পদিন পরেই খনির মালিক জেনে যান যে, ম্যান্ডেলা বিয়ে এড়াতে জোঙ্গিন্তাবার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছেন। এটা জানার পর খনি কর্তৃপক্ষ ম্যান্ডেলাকে ছাঁটাই করেন। পরবর্তীকালে ম্যান্ডেলা জোহানেসবার্গের আইনি প্রতিষ্ঠান উইটকিন, সিডেলস্কি অ্যান্ড এডেলম্যানে কেরানি হিসেবে যোগ দেন। ম্যান্ডেলার বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী ওয়াল্টার সিসুলু এই চাকরি পেতে ম্যান্ডেলাকে সাহায্য করেছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময়েই ম্যান্ডেলা ইউনিভার্সিটি অব সাউথ আফ্রিকার দূরশিক্ষণ কার্যক্রমের অধীনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এর পরে ম্যান্ডেলা ইউনিভার্সিটি অব উইটওয়াটার্সব্রান্ডে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ শুরু করেন। এ পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে জো স্লোভো, হ্যারি শোয়ার্জ এবং রুথ ফার্স্টের পরিচয় হয়। পরবর্তীতে তাঁরা বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী হিসেবে অংশ নেয়ার কথা জানা গেছে। তবে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকার কথা দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯৪৮ সালের নির্বাচন। এ নির্বাচনে আফ্রিকানদের দল ন্যাশনাল পার্টি জয়লাভ করলেও দলটি বর্ণবাদে বিশ্বাসী ছিল এবং বিভিন্ন জাতিকে আলাদা করে রাখার চেষ্টা চালায়। তবে এই ন্যাশনাল পার্টির ক্ষমতায় আসার প্রেক্ষাপটে ম্যান্ডেলা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার পাশাপাশি ১৯৫৫ সালের জন সম্মেলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

রাজনৈতিক জীবনের প্রথমভাগে ম্যান্ডেলা মহাত্মা গান্ধির দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশেষ সফলতার মুখ দেখেননি। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী কর্মীদের নিয়ে প্রথম দিকে গান্ধির অহিংস আন্দোলনের নীতিকে গ্রহণ করে বর্ণবাদের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি প্রথম থেকেই অহিংস আন্দোলনের পক্ষপাতী থাকলেও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ

সরকার ১৯৫৬ সালের ৫ ডিসেম্বর ম্যান্ডেলাসহ ১৫০ জন বর্ণবাদবিরোধী কর্মীকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেফতার করেছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ ৫ বছর ধরে (১৯৫৬-১৯৬১) এই মামলা চললেও সব আসামি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন। এরপর ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ম্যান্ডেলা এএনসি-র সশস্ত্র অঙ্গসংগঠন উমখোন্তো উই সিযওয়েতে প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন এই সংগঠনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। বর্ণবাদী সরকার ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতী ও চোরাগোপ্তা হামলা পরিকল্পনা ও সমন্বয় করেছিলেন তিনি। এসময় সেখানকার বর্ণবাদী সরকার পিছু না-হটলে প্রয়োজনবোধে গেরিলা যুদ্ধে যাওয়ার জন্যও ম্যান্ডেলা পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি বিদেশে এমকে-র জন্য অর্থ সংগ্রহ ও সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের কাজ শুরু করেন। প্রায় ১৭ মাস ধরে ফেরারি থাকার পর ১৯৬২ সালের ৫ আগস্ট ম্যান্ডেলাকে গ্রেপ্তার করে জোহানেসবার্গের দুর্গে আটক রাখা হয়।

অনেকে মনে করেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ম্যান্ডেলার গতিবিধি ও ছদ্মবেশ সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার নিরাপত্তা পুলিশকে জানিয়ে দেয়াতেই তিনি তখন ধরা পড়েছিলেন। গ্রেফতারের পর শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়া এবং বেআইনিভাবে দেশের বাইরে যাওয়ার অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। ১৯৬২ সালের ২৫ অক্টোবর ম্যান্ডেলাকে এই দুই অভিযোগে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। এর দু-বছর পর ১৯৬৪ সালের ১১ জুন ম্যান্ডেলার বিরুদ্ধে এএনসি-র সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্বদানের অভিযোগ এনে শাস্তি দেওয়া হয়। তারপর থেকে ম্যান্ডেলার কারাবাস শুরু হয় রেবন দ্বীপের কারাগারে। তিনি তাঁর ২৭ বছরের কারাবাসের প্রথম ১৮ বছর কাটিয়েছিলেন এখানেই। তবে জেলে থাকার সময়ে বিশ্বজুড়ে সুনাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁর। দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃষ্ণাঙ্গ নেতা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন তিনি। সশ্রম কারাদণ্ডের অংশ হিসেবে রেবন দ্বীপের কারাগারে ম্যান্ডেলা ও তাঁর সহবন্দিরা একটি চুনাপাথরের খনিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হন। তাকে আটক রাখা সেই কারাগারের অবস্থা ছিল বেশ শোচনীয়। সেই কারাগারেও বর্ণভেদ প্রথা চালু ছিলো। কৃষ্ণাঙ্গ বন্দিদের সবচেয়ে কম খাবার দেয়া হত। সাধারণ অপরাধীদের থেকে রাজনৈতিক বন্দিদের আলাদা রাখা হত। তবে রাজনৈতিক বন্দিরা সাধারণ অপরাধীদের চেয়েও অনেক কম সুযোগসুবিধা পেত। তার পরেও কারাগারে থাকার সময়ে ম্যান্ডেলা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় পড়ালেখা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি এই কারাগারে থেকেই আইনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালে তাঁকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। তবে তিনি প্রিন্সেস অ্যানের কাছে সেই নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন।

দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের এক পর্যায়ে এসে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকার তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসেরসহ অন্যান্য বর্ণবাদবিরোধী সংগঠনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি ঘোষণা করেন, ম্যান্ডেলার মুক্তিদানের কথা। ভিক্টর ভার্সটার কারাগার থেকে ম্যান্ডেলাকে ১৯৯০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেওয়া হয়। কারামুক্তির পর তিনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত তিনিই এই দলের নেতা ছিলেন। এই সময়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ অবসানের লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তাঁর উদ্যোগে সংঘটিত এ শান্তি আলোচনা ফলপ্রসূ হওয়ার পর ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সব বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় অবদান রাখার জন্য ম্যান্ডেলা এবং রাষ্ট্রপতি এফ ডব্লু ডি ক্লার্ককে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হয়। ২০১৩ সালের ৮ জুন তিনি ফুসফুসে সংক্রমণের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরবর্তী ছয় সপ্তাহ তিনি হাসপাতালেই কাটান। ২০১৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর ম্যান্ডেলাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। ২০১৩ সালের ৫ ডিসেম্বর নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বর্ণবাদ বিরোধী এই নেতা।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রথমেই বলতে হয় মহাত্মা গান্ধির নাম। তাঁর নেতৃত্ব আর দর্শন পাল্টে দিয়েছিল গোটা দুনিয়াকে। তাঁর চেষ্টাতেই ভারতবর্ষের বিভ্রান্ত মানুষ খুঁজে পেয়েছিল স্বাধীনতার স্বাদ। তার জীবনাচরণ, আদর্শ ও নীতিগত দিক পথ দেখিয়েছে অনেক মানুষকে। তিনি গহীন অন্ধকারে এসেছিলেন আলোর মশাল নিয়ে। তিনি মানুষকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে নতুন করে ভাবতে হয় এবং নিজেদের অধিকার আদায় করতে হয় এই মন্ত্র। গান্ধীর বাবা ছিলেন পোরবন্দরের দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী করমচাঁদ। করমচাঁদের চতুর্থ স্ত্রী পুতলিবার গর্ভে জন্ম নেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। মা প্রণামী বৈষ্ণব গোষ্ঠীর ছিলেন। মা প্রণামীর প্রভাবে গান্ধী তাঁর শৈশব থেকে জীবের প্রতি অহিংসা, নিরামিষভোজন, আত্মশুদ্ধির জন্য উপবাসে থাকা, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বিষয় আয়ত্ব করেছিলেন। ১৮৮৩ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে মহাত্মা গান্ধী বাবা মায়ের পছন্দে কস্তুরবা মাখাঞ্জীকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির চার ছেলে হরিলাল গান্ধী, মনিলাল গান্ধী, রামদাস গান্ধী এবং দেবদাস গান্ধীর জন্ম হয়।

করমচাঁদ গান্ধীর ছাত্রজীবনের অনেকটা সময় কাটে পোরবন্দর ও রাজকোটে। শিক্ষার্থী হিসেবে অতটা মেধার না হওয়ায় গুজরাটের ভবনগরের সামালদাস কলেজ থেকে নামমাত্র ফল নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮ বছর বয়সে ১৮৮৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে চলে যান। রাজকীয় রাজধানী লন্ডনে তাঁর জীবন-যাপন ছিল ভারতে থাকতে তাঁর মায়ের কাছে করা শপথ প্রভাবিত। বলে রাখা ভাল যে জৈন সন্ন্যাসী বেচার্জির সামনে তিনি তাঁর মায়ের কাছে শপথ করেছিলেন যে, তিনি মাংস, মদ এবং উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করার হিন্দু নৈতিক উপদেশ পালন করবেন। তবে তিনি নিজেকে কোনো গুণের চর্চা থেকে বিরত রাখেননি। ব্যারিস্টারি পড়ার পাশাপাশি নাচের শিক্ষায় নিজেকে পারদর্শী করেন। তখনকার সময়ে লন্ডনের গুটিকয়েক নিরামিষভোজি খাবারের দোকানের একটিতে নিয়মিত যেতেন। আমিষভোজি প্রতিবেশীদের দেওয়া খাবার পর্যন্ত এড়িয়ে যেতেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ও কৃষ্ণাঙ্গ বৈষম্যের শিকার হলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন মহাত্মা গান্ধি। শুধুমাত্র বর্ণবাদী আচরণের কারণে একদিন তাঁকে পিটার মরিসবার্গের একটি ট্রেনের প্রথম শ্রেণির কামরা থেকে তৃতীয় শ্রেণির কামরায় যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। একইভাবে স্টেজকোচে ভ্রমণের সময় একজন চালক তাকে ধরে পিটিয়েছিল। কারণ একটাই তিনি এক ইউরোপীয় যাত্রীকে জায়গা দিতে ফুট বোর্ডে চড়তে রাজি হননি। যাত্রাপথে তাকে আরও কষ্ট করতে হয়েছিল। একবার একটা হোটেল থেকেও বহিষ্কার করা হয় তাকে। এই ঘটনাগুলো ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবাদ, কুসংস্কার এবং অবিচার দূরীকরণের আন্দোলনে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ভোটাধিকার ছিল না। এই অধিকার আদায়ের বিল উত্থাপনের জন্য তিনি আরও কিছুদিন দেশটিতে থেকে যান। বিলের উদ্দেশ্য সাধন না হলেও এই আন্দোলন সেদেশের ভারতীয়দের অধিকার সচেতন করে তুলেছিল। ১৮৯৪ সালে গান্ধী 'নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে সেখানকার ভারতীয়দের রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হন। তারপর ১৮৯৭ সালের জানুয়ারিতে ভারতে এক সংক্ষিপ্ত সফর শেষে ফিরে আসার পর এক শ্বেতাঙ্গ মব তাকে হত্যার চেষ্টা করে। তার পরও গান্ধী তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন কারও ব্যক্তিগত ভুলের জন্য পুরো দলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়াটা ঠিক নয়। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই অহিংসাবাদী নেতাকে ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গুলি করে হত্যা করা হয়। তখন তিনি নয়াদিল্লিতে পথসভা করছিলেন। তাঁর হত্যাকারী নাথুরাম গডসে ছিলেন একজন হিন্দু মৌলবাদী। নাথুরামের সঙ্গে চরমপন্থি হিন্দু মহাসভার যোগাযোগ ছিল। গডসে এবং সহায়তাকারী নারায়ণ আপতেকে পরবর্তীতে আইনের আওতায় এনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ১৯৪৯ সালের ১৪ নভেম্বর শাস্তি কার্যকরের উদ্দেশ্যে তাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

সারাংশ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বর্ণবাদ সেই নিকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, চর্চা এবং ক্রিয়াকলাপ যেখানে বিশ্বাস করা হয় মানুষ বৈজ্ঞানিকভাবে অনেকগুলো গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং একই সাথে বিশ্বাস করা হয় কোন কোন গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর চেয়ে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য উঁচু অথবা নিচু। এখানে তার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারও নির্দিষ্ট করা হয় গাত্রবর্ণ দিয়ে। পাশাপাশি বেশি যোগ্য কিংবা অযোগ্য হওয়ার মানদণ্ডও এখানে গ্রোথিত। তবে বর্ণবাদের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন। গবেষকদের মধ্যে এই গোষ্ঠী ধারণা নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। এই বর্ণবাদের ধারণা কখোনো গায়ের চামড়ার রং দিয়ে হতে পারে, অন্যদিকে কখোনো আঞ্চলিকতার উপর ভিত্তি করেও হতে পারে। বিশ্বের বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে পথিকৃত নেতৃত্ব হিসেবে বলা যেতে পারে মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা, ডেসমন্ড টুটু এবং মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের নাম।

নমুনা প্রশ্ন

ইতিহাস-দ্বিতীয় পত্র (বহুনির্বাচনি প্রশ্ন)

সময়–৪০ মিনিট পূর্ণমান–৪০

[৪০টি প্রশ্ন থাকবে, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান–১]

১. কোন দেশে প্রথক শিল্প বিপ্লব ঘটে?
ক. ফ্রান্স খ. ইংল্যান্ড
গ. রাশিয়া ঘ. জার্মানি

২. শিল্প বিপ্লবকে উৎসাহিত করে–
ক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খ. যোগাযোগ ব্যবস্থা
গ. সস্তা শ্রম ঘ. আন্তর্জাতিক রাজনীতি

৩. বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন কে?
ক. জর্জ স্টিফেনসন খ. হামফ্রি ড্যাভি
গ. স্যামুয়েল মোর্সে ঘ. জেমস ওয়াট

*** অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :**

পূর্বের লাঙলের সাহায্যে চাষাবাদ করার ফলে অনেক কষ্ট করতে হত। পরবর্তীতে ট্রাকটর এর সাহায্যে চাষাবাদ করার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে শিল্প কারখানা গড়ে উঠাব সহায়ক হয়েছে।

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত বর্ণনা কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক. গৌরবময় বিপ্লব খ. ফরাসি বিপ্লব
গ. শিল্প বিপ্লব ঘ. বলশেভিক বিপ্লব

৫. ঘটনাটি ইউরোপে মূলত কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছিল?
ক. সাংস্কৃতিক খ. রাজনৈতিক
গ. অর্থনৈতিক ঘ. সামরিক

৬. ফ্রান্সে যাজকদের পরেই যে সম্প্রদায়ের স্থান ছিল–
ক. শ্রমজীবী খ. মধ্যবিত্ত
গ. কৃষক ঘ. অভিজাত শ্রেণি

*** অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :**

প্রাচীন ভারতে বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল। প্রথম শ্রেণিভুক্ত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো।

৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত বর্ণনার সাথে ফরাসী বিপ্লব-পূর্ব কোন শ্রেণির সাদৃশ্য দেখা যায়?
ক. শ্রমিক খ. যাজক
গ. বুর্জোয়া ঘ. কৃষক

৮. উক্ত সুবিধাভোগী শ্রেণির উপার্জনের প্রধান মাধ্যম কোনটি?
ক. চর্মকার খ. মৃত্যুকর
গ. নামকরণ কর ঘ. খাজনামুক্ত ভুমি

৯. মন্টেস্কুর The Spirit of Law গ্রন্থটিতে শাসন ব্যবস্থার যে বিষয়টির কথা বলা হয়েছে–
i. আইন প্রণয়ন
ii. কার্য নির্বাহক
iii. বিচার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০. লবণ করের সমার্থক কোনটি?
ক. গ্যাবেলা খ. কর্ভি
গ. অ্যাদ ঘ. বানালি

১১. কত খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়?
ক. ১৯১৭ খ. ১৯১৮
গ. ১৯১৯ ঘ. ১৯২১

১২. প্যারিস সম্মেলনে কয়টি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
ক. ৩ খ. ৫
গ. ৭ ঘ. ৮

১৩. চৌদ্দ-দফা উত্থাপন করেন কে?
ক. পোপ বেনেডিকট খ. উড্রো উইলসন
গ. দ্বিতীয় উইলিয়াম ঘ. লয়েড জর্জ

* অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
মি. এডলফ তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অন্য একটি দেশে বেড়াতে গেলে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হন। বিচার চেয়েও প্রতিকার পায়নি তার দেশের লোক। ফলে পরিস্থিতি একসময় ভয়াবহ যুদ্ধের রূপ নেয়।

১৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভয়াবহ যুদ্ধ কোনটি?
ক. ফরাসি বিপ্লব খ. বলশেভিক বিপ্লব
গ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধের ফলেই-
i. বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয়েছিল
ii. সংবাদপত্র শিল্প বিকাশ লাভ করেছিল
iii. পরাশক্তি হিসেবে রুশ মার্কিনের উত্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৬. কোন আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য বলশেভিক বিপ্লব শুরু হয়?
ক. সমাজতন্ত্র খ. গণতন্ত্র
গ. পুঁজিবাদ ঘ. স্বৈরতন্ত্র

* অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭ ও ১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
ফরাসি বিপ্লবে যেমন ফরাসি কবি, লেখক, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখেন তেমনি রাশিয়ায় একজন কালজয়ী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। যার লেখনী রাশিয়ায় আমূল পরিবর্তন ঘটায়।

১৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত কালজয়ী দার্শনিকের নাম কি?
ক. আলেকজান্ডার পুশকিন খ. আন্তভ চেখভ
গ. মাক্সিম গোর্কি ঘ. কার্ল মার্কস

১৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা রাশিয়ায় কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছিল?
ক. শাসনতান্ত্রিক খ. সামাজিক
গ. অর্থনেতিক ঘ. সাংস্কৃতিক

১৯. বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়া প্রত্যেক নাগরিকের বাসস্থানের সাথে অন্য কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে?
i. চিকিৎসা
ii. কর্মসংস্থান
iii. শিক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. Mein Kampf-এর রচয়িতা কে?
ক. এডলফ হিটলার খ. মুসোলিনি
গ. স্টালিন ঘ. লেনিন

২১. Fascio বা Fasces শব্দের অর্থ কি?
ক. শক্তি খ. অস্ত্র
গ. বন্ধু ঘ. শিক্ষা

২২. মুসোলিনি ক্ষমতা দখল করেন কিভাবে?
ক. নির্বাচনের মাধ্যমে খ. উত্তরাধিকারসূত্রে
গ. বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ঘ. ফ্যাসিস্ট সমর্থকদের সহায়তায়

২৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম আক্রমণকারী ছিলেন কে?
ক. হিটলার খ. চার্চিল
গ. রুজভেল্ট ঘ. মুসোলিনি

* অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪ ও ২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

৬২৮ খ্রি. হুদাইবিয়া নামক স্থানে হযরত মুহম্মদ (স) ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি ইসলামের ইতিহাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত।

২৪. উদ্দীপকের চুক্তির ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
ক. সিয়াটো খ. পোটসড্যাম
গ. ন্যাটো ঘ. ওয়ারশ

২৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত চুক্তির ফলে জার্মানিকে কয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৬

২৬. জাতিসংঘ দিবস কোনটি?
ক. ২৪ সেপ্টেম্বর খ. ২৪ অক্টোবর
গ. ২৪ নভেম্বর ঘ. ২৪ ডিসেম্বর

২৭. বান্দুং সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী NAM-এর নামকরণ করা হয়। জাতিসংঘের নামকরণ হয় অনরুফ কোন সম্মেলনে?
ক. মস্কো খ. ওকস
গ. তেহরান ঘ. কায়রো

২৮. জাতিসংঘ সনদে কয়টি মৌলিক উদ্দেশ্যের উল্লেখ রয়েছে?
ক. ২ খ. ৪
গ. ৬ ঘ. ৮

২৯. সোভিয়েত ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়–
ক. মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে খ. স্টালিনের পৃষ্টপোষকতায়
গ. ট্রুম্যানের নেতৃত্বে ঘ. পুঁজিবাদী অর্থনীতির দ্বারা

৩০. কত খ্রিষ্টাব্দে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হয়?
ক. ১৯৮৯ খ. ১৯৯০
গ. ১৯৯১ ঘ. ১৯৯২

৩১. ট্রুম্যান কোন দেশের প্রেসিডেন্ট?
ক. সোভিয়েত ইউনিয়ন খ. রাশিয়া
গ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘ. জার্মানি

৩২. সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে প্রতিষ্ঠা হয়েছে–
ক. এককেন্দ্রিক বিশ্ব খ. দ্বিকেন্দ্রিক বিশ্ব
গ. সমাজতান্ত্রিক ঘ. বহুমাত্রিক

৩৩.বার্লিন প্রাচীর নির্মাণ করা হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?

ক. ১৯৬০ খ. ১৯৬১
গ. ১৯৬২ ঘ. ১৯৬৩

* অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৪ ও ৩৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মনোহরপুর গ্রামে একটি সমিতি গঠন করা হয়। যার মূলমন্ত্র ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়া। কিন্তু সমিতির কর্মকাণ্ডের সাথে এই নীতির কোনো মিল ছিলনা। নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে আদর্শ বিসর্জন দিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ জীবন-যাপন করত। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই সমিতিতে ভাঙ্গন শুরু হয়।

৩৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত আদর্শের সাথ কোন আদর্শের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

ক. গণতন্ত্র খ. রাজতন্ত্র
গ. সমাজতন্ত্র ঘ. ধনতন্ত্র

৩৫.স্নায়ুযুদ্ধের অন্যতম কারণ–

i. পুঁজিবাদ সম্পর্কে সোভিয়েত ধারণা
ii. নেতাদের একরোখা মনোভাব
iii. সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মার্কিন আতঙ্ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৬.কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের আচরণ ছিল–

ক. বিশ্বেষপূর্ণ খ. সৌহার্দপূর্ণ
গ. বন্ধুত্বপূর্ণ ঘ. সহযোগিতাপূর্ণ

* নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কঙ্গোর স্থানীয় অধিবাসীরা ইতালিয়ানদের মাধ্যমে বৈষম্যের শিকার হয়। ইতালিয়ানদের চোখে কঙ্গোর অধিবাসীরা নিকৃষ্ট।

৩৭. উদ্দীপকের কঙ্গোর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে নিচের কোন দেশের?

ক. উত্তর আমেরিকা খ. দক্ষিণ আফ্রিকা
গ. উত্তর আফ্রিকা ঘ. অস্ট্রেলিয়া

৩৮.'আই হ্যাভ ও ড্রিম' কথাটি কে বলেছেন?

ক. ডেসমন্ড টুটু খ. মহাত্মা গান্ধী
গ. মার্টিন লুথার কিং ঘ. নেলসন ম্যান্ডেলা

৩৯.মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল–

i. বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ
ii. ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা
iii. দারিদ্র্য দূরীকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪০. নেলসন ম্যান্ডেলা কত বছর কারাভোগ করেন?

ক. ২৪ খ. ২৭
গ. ২৯ ঘ. ৩০

ইতিহাস-২য় পত্র (সৃজনশীল প্রশ্ন)

সময়–২ ঘণ্টা ১০ মিনিট পূর্ণমান–৬০

[৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান]

১। শাকপুরা একটি কৃষি-নির্ভর গ্রাম। সম্প্রতি সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ায় পাম্পের সাহায্যে জলসেচ ও যন্ত্রের মাধ্যমে সকল মাড়াই করা হচ্ছে। ফলে অল্প সময়ে বেশি কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। গ্রামবাসীর পেশাতেও এসছে আমূল পরিবর্তন। ফসল উৎপাদন ছাড়াও তারা বিপণনের কাজ করে যা জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন সাহায্য করছে।

ক. কে উড়ন্ত মাকু আবিষ্কার করেন? ১

খ. শাকপুরা গ্রামের পরিবর্তনের সাথে ইউরোপের কোন বিপ্লবের সাদৃশ্য রয়েছে? ২

গ. শাকপুরা গ্রামের পরিবর্তনের সাথে ইউরোপের কোন বিপ্লবের সাদৃশ্য রয়েছে? ৩

ঘ. ইউরোপের উক্ত বিপ্লব কিভাবে বিভিন্ন পেশার সৃষ্টি করে উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

২। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করতে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তুলে ধরে। ভাষা আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক পটভুমি সৃষ্টিতে তাদের অবদান অনস্বীকার্য, তবে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক শোষণ ও ভাষা আন্দোলনে পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছিল।

ক. ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজা কে ছিলেন? ১

খ. কোড নেপোলিয়ন' বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে তমদ্দুন মজলিসের ন্যায় ফরাসী বিপ্লবে জনমত সংগঠনে কাদের ভূমিকার সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, ভাষা আন্দোলনের মতো ফরাসী বিপ্লবও অন্য কারণ দ্বারা প্রভাবিত ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩। ষোড়শ শতাব্দীতে সংঘটিত ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ জড়িয়ে পড়ে। রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধে ব্যাপক প্রাণহানী ও সম্পদহানী ঘটে। বহুলোক পঙ্গুত্ব বরণ করে, অনেক শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমও অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কোনো কোনো দেশ পুনর্বাসনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে।

ক. ভার্সাই চুক্তি কখন স্বাক্ষরিত হয়? ১

খ. ত্রিশক্তি আতাত কেন কুড়ে উঠে? ২

গ. উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির কি সাদৃশ্য রয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভুমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৪। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলাদেশের ভুমি ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য জমি ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর উদ্দেশ্য সৎ হলেও ইজারাদাররা বেশি রাজস্ব আদায়ের জন্য কৃষকদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদের সাথে চুক্তি করেন। এতে জমিদারগণ ভুমির মালিক ও কৃষকরা রায়তে পরিণত হয়।

ক. Utopia গ্রন্থের লেখক কে? ১

খ. জারতন্ত্র বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জমি-ইজারা দেওয়ার সাথে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার গৃহীত কোন পদক্ষেপের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাথে স্ট্রোলিপিনের সংস্কারের তুলনা কর। ৪

৫। গোলাপবাগ ইউনিয়নের দুটি গ্রামের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এতে দুটি গ্রামেরই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সালিশে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান একটি গ্রামকে দোষী করে ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। কিন্তু শুধুমাত্র একট গ্রামকে এই সংঘর্ষের জন্য দোষী করায় গ্রামের নেতা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠে।

ক. মুসোলিনী কে ছিলেন? ১

খ. ফ্যাসিবাদ বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে চেয়্যারম্যানের সালিশের সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর উপর গৃহীত ব্যবস্থার কী সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, একটি গ্রামকে এককভাবে শাস্তি দেওয়ার ফলাফল ও জার্মানীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক অস্থিরতা একই প্রকৃতির ছিল? আলোচনা কর। ৪

৬। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতামূলক সংস্থা সার্ক গঠিত হয়। দক্ষিণ এশিয়া সাতটি দেশের মধ্যে আঞ্চলিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তৈরি করা ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। একই সাথে প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছ হতে বাণিজ্যিক শক্তিশালী করার সুযোগ পায়। তবে বড় দুটি রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের বৈরী সম্পর্কের কারণে অনেক সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। দু'দেশ অনেক ক্ষেত্রেই একমত হতে পারেনা।

ক. জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা কত? ১

খ. ভেটো ক্ষমতা কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সার্ক গঠনের সাথে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের কী কোনো সাদৃশ্য রয়েছে? যুক্তি দাও। ৩

ঘ. জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের বৃহৎশক্তির ভূমিকার এবং সার্কে ভারত-পাকিস্তানের ভুমিকার তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৭। বিশ্বব্যাংক, জাইকা প্রভৃতি বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক সংস্থা। এদের প্রধান কাজ হলো বিশ্বের অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা দেওয়া। এসব দেশগুলোতে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ার পাশাপাশি কাজের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলোও বিশ্বব্যাপী পণ্য রপ্তানীর সুযোগ পায়।

ক. NATO কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চুক্তি সংস্থা (SEATO) গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের সংস্থাসমূহের ন্যায় স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময় গড়ে উঠা কোন অর্থনৈতিক সংস্থার সাদৃশ্য রয়েছে? বর্ণনা দাও।৩

ঘ. উক্ত সংস্থা পাশ্চাত্য অর্থনীতির বিকাশে কিভাবে ভুমিকা রেখেছে? আলোচনা কর। ৪

৮। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একাধিক দল ও মতের অংশগ্রহণ থাকে। বিরোধী দলের যৌক্তিক সমালোচনা, পরামর্শ নিয়ে সরকারি দল সুষ্ঠুভাবে দেশকে শাসন করতে পারে। শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাবে স্বৈরশাসনের উদ্ভব হতে পারে। স্বেচ্ছাচারীভাবে তারা যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। ফলে যে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হতে পারে।

ক. নিকোলাই চসেস্কু কে ছিলেন? ১

খ. পেরেস্ত্রাইকা বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ন্যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর বিশ্ব রাজনীতির কী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পরিবর্তনটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন শঙ্কা তৈরি করেছে।– মতামত দাও। ৪

৯। ভারতে পরবর্তী বৈদিকযুগে সমাজে শ্রেণিভেদ প্রথা প্রকট আকার ধারণ করে। ব্রাহ্মণ উঁচুশ্রেণিভুক্ত হওয়ায় অপর তিন শ্রেণিকে ঘৃণার চোখে দেখত। বিশেষত বৈশ্য ও শুদ্র শ্রেণির সঙ্গে তারা পারস্পরিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করত না। যদিও সমাজ বিনির্মাণে সকল শ্রেণির অবদান রয়েছে।

ক. ডেসমন্ড টুটো কে ছিলেন? ১

খ. মহাত্মা গান্ধী কি উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন? ২

গ. উদ্দীপকের শ্রেণিভেদ প্রথা বিশ শতকের আমেরিকান সমাজের কোন সমস্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, আমেরিকায় মার্টিন লুথার কিং-এর আন্দোলন সমাজের দুই শ্রেণির মধ্যকার বিদ্বেষের কারণে ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪